ভবিষ্যৎ ভাগ্য গণনা করিতেছি, তাহাতে এই প্রকার মীমাংসাতেই উপস্থিত হইতে হয়। ইংরাজের প্রতাপ যে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এমন কোন কথা নাই; সুতরাং তাহার স্থানে কালক্রমে অন্য জাতির হস্তে রাজদণ্ড যাইবে। যদি তৎকালে ভারতবাসী মানসিক ও শারীরিক বলে স্বাধীন হইবার উপযুক্ত না হয়, তবে যাহার হস্তে রাজদণ্ড যাইবে, তাহার শক্তি হ্রাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কালের অনন্ত ইতিহাসে কত রাজ্যের উত্থান ও পতন লিপিবদ্ধ আছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? সময়-তরঙ্গে কত নূতন অভ্যুত্থান হইয়াছে ও কত পুরাতন জাতি লুপ্ত হইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই; সুতরাং কে বলিতে পারে যে, ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য আর উঠিবে না? কালের গতিতে অসম্ভব কিছুই নাই এবং একভাবে কাল কাহাকেও রাখে না। তাহা রাখিলে যে ভারত ইংরাজের উৎপত্তির বহু পূর্ব্ব হইতে গৌরব-রবির মধ্যাহ্ন কিরণে সমুজ্জ্বল ছিল, আজি তাহার এ দুর্গতি হইত না।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

রোগের বৈজিক তন্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

Hydrophobia বা ক্ষিপ্ত পশু দংশনে রোগ উৎপত্তি।

যদিও এই রোগের বীজ
পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়
Pasteur রের দৃঢ় বিশ্বাস যে
কোন জীবাণু বা উদ্ভিদাণু হইবে। Pasteur এর নিকটে একটী সুস্থ পশু ও একটী ক্ষিপ্ত পশুর মস্তিষ্ক আনিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি, অনায়াসে কোন্‌টী রোগগ্রস্ত, বলিয়া দিতে পারেন। তিনি ও তাহার সহকারী Chamberland, Roux এবং Thuillier অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে, আশা ও নিরাশার মধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, মনুষ্য ও অপর প্রাণীদিগকে এই রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইতে পারে। তিনি প্রথমে সুস্থ কুকুরদিগের শরীরে এই রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া পরে মনুষ্যদিগকে এই রোগ হইতে রক্ষা করিলেন। Pasteur পরীক্ষা দ্বারায় জ্ঞাত হইলেন যে, ক্ষিপ্ত পশুদের লালা সর্ব্বদা এ রোগ উৎপন্ন করে না, রোগের মারাত্মক বিষ মস্তিষ্ক এবং কশেরুকা মজ্জায় থাকে। Pasteur রের পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য রোগের গুপ্ত অবস্থার কাল (Period of incubation) নির্দ্ধারণ করা। শিয়াল ও কুকুর দংশনের কত দিন পরে যে Hydrophobia রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কতকের পক্ষে ২।৪ দিবস, কতকের ২।৪ সপ্তাহ এবং অবশিষ্টদিগের ২।১ বৎসর পরে হইয়াছে। Pasteur দেখিলেন, লালা পশু শরীরে প্রবেশ করাইলে উহার রোগ উৎপত্তির দিনের স্থিরতা থাকেনা, কিন্তু মস্তিষ্ক বা

কশেরুকা মজ্জা হইতে বীজ লইয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইলে রোগ উৎপত্তির দিনের স্থির থাকে। তিনি দেখিলেন, ক্ষিপ্ত কুকুরের কশেরুকামজ্জা হইতে বীজ লইয়া খরগোশের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইলে খরগোশ ১৫ দিনের দিন মরিয়া যায়। যদি শেষোক্ত খরগোশ হইতে বীজ দ্বিতীয়, এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় খরগোশ শরীরে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে বীজের গুপ্ত অবস্থায় থাকিবার কাল বিষের প্রখরতানুযায়ী কমিয়া যায়। এইরূপে যদি একাদিক্রমে ২৫টী খরগোশকে ঐ রোগাক্রান্ত করা যায়, তাহা হইলে রোগের গুপ্ত অবস্থায় থাকিবার কাল ৮দিন মাত্র হয়।

১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে একদিন তিন জন কৃষক Alsace নগর হইতে তাঁহার নিকট Hydrophobia র বীজ গ্রহণ করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এক জনের নাম Theodore Vone থিওডর ভন, তাহার বাহুতে তাহার ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিয়াছিল। দ্বিতীয়টী Joseph Meister ৯ বৎসরের বালক, উহাকে উক্ত কুকুরে বাহু, পদ ও উরং প্রভৃতিতে ২৪ স্থানে দংশন করিয়াছিল। তৃতীয়টী বালকের মাতা, উহাকে দংশন করে নাই। Pasteur তাঁহার চিকিৎসক বন্ধুদিগকে ডাকাইলেন। তাঁহারা একমত হইয়া বলিলেন, মানুষটীকে কিছু করিতে হইবে না, উহার আঘাত সাংঘাতিক নহে, সে বাড়ী যাইতে পারে; কিন্তু বালকটীর নিশ্চয়ই Hydrophobia হইবে। তাহার মাতার অনুনয় বিনয়দ্বারা পাষ্টারের মন দ্রবীভূত হইল, তিনি, ডাক্তার Grancher ও Vulpian বালকের শরীরে Hydrophobia বীজ প্রবেশ করাইতে আদেশ করিলেন। একটী ক্ষিপ্ত খরগোশ ১৫ দিনে মরিয়া যায়, তাহারই শরীর হইতে বিষ সংগ্রহ করিয়া ১৫ দিন অম্লজান বায়ুতে শুষ্ক করিয়া মৃদু করা হইয়াছিল, কখন উন্মুক্ত বায়ুতে উহা রাখা হয় নাই। এই বিষ ৬ জুলাই রাত্র ৮ ঘটিকার সময় বালকটীর দক্ষিণ দিকের যকৃতের উপরিভাগে চর্ম্মের নিম্নে প্রবিষ্ট করা হয়। তিন বৎসর হইল এই ঘটনা হইয়াছিল, বালকটী এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহার প্রমুখাৎ সকলই অবগত হওয়া যায়। এই ঘটনার এক বৎসর কাল পরে Hydrophobia র বীজ গ্রহণার্থ দলে দলে চারিদিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। ১৮৮৬ সালে এপ্রেল মাসে ৬৭৮ জন লোককে ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করে এবং ৩৪ জনকে ক্ষিপ্ত নেকড়ে ব্যাঘ্রে দংশন করে। সকলের শরীরেই Hydrophobia বীজ প্রবেশ করান কর দংষ্ট্রে একজন ব্যতীত সক লাভ করে এবং ব্যাঘ্রদংষ্ট্র ...র মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে Seine ... Hydrophobia রোগে ৬ জনের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইত। ১৮৮৬ সালে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ২৪৯০ জন লোকের শরীরে বীজ প্রবেশ করান হয়; ইহাদের মধ্যে ১৭২৬ জন ফরাসী জাতীয়; ইহাদের ১০ জনের মৃত্যু হয়; গড়ে ১৭০ জনের মধ্যে এক জন মরে।

Meister রের শরীরে Hydrophobia বিষ প্রবেশ করিবার পর যে সকল স্থানে উক্ত প্রণালীতে মনুষ্য শরীরে বিষ প্রবেশ করান হয়, তাহাও তাহার ফলের তালিকা।

*NAMES OF DOCTORS.	CITY	TOTAL No. treated	DEATHS	PERCENTAGE
M Pasteur	Paris	3020	34	1.15
DR. Budjivid	Warsaw	84	—	—
Prince Oldenburg	St. Petersburg	140	3	2.14
DR. Patelmann	Mascow	112	4	3.57
DR. Ganewbia, DR. Burdach	Odessa	325	12	3.69
DR. Cautani, DR. Vestea	Naples	28	—	—
DR. Ulwan	Vienna	96	—	—
DR. Parschensky	Samara	47	1	2.14
		3852	54	4.40

পারিসনগরে গত তিন বৎসর যত শরীরে বিষ প্রবেশ করান হইয়াছে, তাহার মৃত্যু সংখ্যা এইরূপ ;—

১৮৮৬খ্রীঃঅঃ ১.৩৪ শত প্রতি, ১৮৮৭ খ্রীঃঅঃ ১.১২ শত প্রতি, ১৮৮৮ খ্রীঃঅঃ .৭৭ শতপ্রতি।

এখন প্রশ্ন এই, যখন শোণিতে Hydrophobiaর বিষ প্রবেশ করে, তখন তাহার কি পরিবর্ত্তন হয়? ইহার সদুত্তর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অণুবীক্ষণ সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, উহারা উহাদের পোষণীয় শর্করা শস্য হইতে গ্রহণ করে, আর উহাদের পোষণ কালে শস্যতে একরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহা সুরাপক্ষে উপকারী কিন্তু উক্ত উদ্ভিদাণুদের অপকারী। এই অপকার দুই কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, দ্বিতীয়ত সুরাবীর্য্যের উৎপত্তি। অণুবীক্ষণ বৃদ্ধি কালে সুরা উৎপন্ন করিয়া নিজের মৃত্যু আনয়ন করিল।

বসন্ত বা গো বীজ যে মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট করা যায়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, উহারা শোণিত হইতে মারাত্মক বসন্তের পুষ্টিকর খাদ্য সকল নিঃশেষিত করিবে, আর এক উদ্দেশ্য এই যে, গোবীজের অস্তিত্বে শোণিত সকল এরূপ অভ্যস্ত হইবে যে, পরে বসন্তের বীজকে গ্রহণ করিতে পারিবে। De Quincey প্রত্যহ ৮০০০ আট সহস্র বিন্দু লডেনাম গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি একটী মালেকে, তিনটী সৈনিক পুরুষ ও তাহাদের ঘোটকের মৃত্যু হইতে পারে এমন পরিমাণে আফিম দিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি অবাধে সকলই ভক্ষণ করিয়া জীবিত ছিল। ডাক্তার Dallinger পরীক্ষা দ্বারায় প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক প্রকার উদ্ভিদাণুর স্বাভাবিক উত্তাপ ৬০ ডিগ্রী ফরেণহিট, উহাকে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত করিয়া ১৫৮ ডিগ্রীতে লইয়া যাওয়া যায় এবং এই প্রখর উত্তাপে তাহারা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

এই রূপ কোন না কোন উপায় দ্বারায় Hydrophobiaর বীজ শরীরে কার্য্য করে।

এক্ষণে মহাত্মা পাষ্টরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা কি পাইলাম, দেখা যাউক (১) Spontaneous generation "স্বতঃউদ্ভূত জীব" মতের বিপর্য্যয় (২) সুরা ব্যবসায়ীদিগের সুরা অম্ল উৎসেচন হইতে রক্ষা (৩) গুটীপোকার রোগমুক্ত

* Nineteenth Century for June 1888.

করিয়া ফরাসীদেশের রেশম ব্যবসা পুনঃ স্থাপন (৪) পশুদের anthrax বা spleenic রোগের উপশম (৫) মনুষ্যদের মারাত্মক ব্রণ ও পশম সংগ্রহকারী "Woolsorters disease" রোগের উপশম (৬) গৃহপালিত পক্ষীদিগের বিসূচিকা উপশম (৭) Hydrophobia ক্ষিপ্ত পশুদষ্ট রোগ উপশম (৮) ভবিষ্যতে অনেক রোগ উপশমের আশায় বীজ বপন এবং রোগের কারণ সম্বন্ধে ভিন্ন পথে বৈজ্ঞানিকদিগকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করা। উপসংহারকালে বৈজিক তত্ত্বের সপক্ষ ও বিপক্ষ মত কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া অদ্যকার প্রস্তাব শেষ করিব। টিণ্ডেল বলেন, সম্ভবতঃ অতি ক্ষুদ্র জীবের ক্রিয়া দ্বারায় সংক্রামক রোগ উৎপত্তি হয়। কোন রাসায়নিক বিষ দ্বারা নহে, কেননা রাসায়নিক বিষ শরীরে শোষিত হইবার অনতিবিলম্বে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু সংক্রামক রোগে আমরা কি দেখি? সংক্রামক রোগে বিষ শরীরে প্রবেশ করিবার কত দিন (ভিন্ন ভিন্ন সংক্রামক রোগে, রোগ প্রকাশ কাল ভিন্ন) বিলম্বে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমরা জানিয়াছি, দণ্ডাকার উদ্ভিদ জীবের বৃদ্ধি ও পরিণতি ও বংশ উৎপত্তির ভিন্ন ভিন্ন সময় আবশ্যক। সুতরাং সংক্রামক রোগের বীজ যদি উদ্ভিদাণু হয়, তাহা হইলে আমরা সংক্রামক রোগের গুপ্ত কাল (Period of incubation) তারতম্য বুঝিতে পারি। দ্বিতীয়ত রাসায়নিক, যথা কুচিলার দ্বারা বিষাক্ত প্রাণীর এক বিন্দু শোণিত দ্বারা অন্য প্রাণীকে টিকা দিলে, যদি কখন বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহা অতি সামান্য, কিন্তু এনথ্রাকস জীব দ্বারা বিষাক্ত প্রাণীর এক বিন্দু শোণিতে শত শত মেষকে অতি তীব্রভাবে বিষাক্ত করা যায়। এনাথ্রাকস বিষ বীজ স্বতই বংশ বৃদ্ধি করে। কিন্তু অম্ল, লবণ ও উপক্ষার প্রভৃতিতে এরূপ পুনরুৎপাদনের শক্তি নাই। তৃতীয়ত রাসায়নিক সকল বিষ সর্ব্বত্র সমানভাবে সাংঘাতিক। কিন্তু আমরা বহুদর্শনে জ্ঞাত হইযাছি যে, যান্ত্রিক জীব বিশেষত উদ্ভিদ জীব স্থান বিশেষে ও কটিবন্ধন বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে। ইহারা ভূমি ও স্থানীয় জল বায়ুর অধীন। কোন কোন স্থানে কোন কোন বিশেষ রোগ আদৌ জন্মে না। দক্ষিণ ভূগোলার্দ্ধে অথবা অয়সান্তর্গত প্রদেশে কি কখন মড়ক দেখা গিয়াছে? দক্ষিণ সাগরস্থ কতকগুলি দ্বীপে বসন্ত রোগ কখন দেখা যায় নাই। বঙ্গদেশে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যখন স্থানীয় Endemic রোগ অন্যত্রে দৃষ্ট হয়, তখন তাহার রোগ উৎপত্তির স্থান প্রায় নির্দ্দেশ করা যায়। চতুর্থতঃ উদ্ভিদের ন্যায় সংক্রামক রোগ ঋতু ও সময় বিশেষে বৃদ্ধি পায়, রাসায়নিক বিষ সকল সময়ে ও সকল ঋতুতেই সম ফলদায়ক। মিনমিরের ডাঃ হাচিনসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নিম্ন বাঙ্গালায় উদ্ভিদের বর্দ্ধন ক্রিয়া বৎসরে দুইবার হয়; এক বার শীত ঋতুর অবসান হইতে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত এবং আর একবার বর্ষার শেষ হইতে শীত পর্য্যন্ত এবং তিনি আরও বলেন যে, এই দুই কালে এ প্রদেশে বিসূচিকা বীজের জীবন ক্রিয়ার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পঞ্চমত, বৃক্ষাদি যেমন স্থানীয় জল বায়ু সহ্য করাইয়া লইলে অনুকূল অবস্থা প্রভাবে বৎসরের সকল

সময়েই বর্দ্ধনশীল হয়, সেইরূপ বসন্ত ও হাম এককালে কেবল শীতের শেষে দেখা দিত, কিন্তু এখন দেখা যায় যে ইহারা বৎসরের সকল সময়ে হইয়া থাকে। ষষ্ঠতঃ, বসন্তের রস ও এনথাকস রোগাক্রান্ত প্রাণীর শোণিত ছাঁকিয়া লইলে উহার রাসায়নিক পদার্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, সুতরাং কঠিন পদার্থের দ্বারা টিকা দিলে রোগ উৎপন্ন হয় এবং তরল পদার্থের দ্বারা টিকা দিলে রোগ উৎপন্ন হয় না।

বৈজিক তত্ত্বের বিরুদ্ধমতের জিজ্ঞাসা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন রোগে যে সকল অপ্রকৃত পদার্থ জন্মায়, তাহাতে কি ব্যাকটিরিয়া বিশেষের উৎপত্তি হইতে পারে না? অর্থাৎ বাকটিরিয়া বিশেষ হইতে রোগ উৎপত্তি না হইয়া বরং রোগ বিশেষ হইতে ইহার উৎপত্তি হওয়া কি সম্ভবপর নহে? এ সংশয় সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে যতদিন না কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, ততদিন ইহার উপর অযথা আস্থা প্রয়োগ করা বিধেয় নহে।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মিত্র।

শ্মশানে সম্ভাষণ।

(নিশীথ সময়—চিলাইর পারে।)

১

সারদা! এসেছি আমি দেখ গো চাহিয়া,
এই যে এসেছি আমি, তোমার সে "প্রিয়স্বামী"
এই যে নিকটে দেবি! ডাকি দাঁড়াইয়া,
আদরে হৃদয়ে লহ, হাসিমুখে কথা কহ,
অলস অবশ অঙ্গে লহ জড়াইয়া।
তুমি বিনে নাহি কেহ, কে আর করিবে স্নেহ
বড় শ্রান্ত—বড় ক্লান্ত এসেছি চলিয়া,
চখে জল মুখে হাসি, স্নেহময়ী রূপরাশি
পরাণে ভরিয়া লহ শত চুম্ব দিয়া।
কেন আছ ছাই ভস্মে শ্মশানে শুইয়া?

২

সারদা! এসেছি আমি দেখ গো চাহিয়া,
আজি কতদিন পরে, ফিরিয়া এসেছি ঘরে
এই যে নিকটে দেবি ডাকি দাঁড়াইয়া,
ওঠ ওঠ আর কেন, শ্মশান শয্যায় হেন
অযতনে ছাই ভস্মে আছ ঘুমাইয়া?
সরলা! আমারি লাগি, নিশিদিন জাগি জাগি
আছ ঘুমে অচেতন জ্ঞান হারাইয়া
অযতনে ছাই ভস্মে শ্মশানে শুইয়া?

৩

ওঠ। ওঠ।
এই যে এসেছি আমি দেখ গো চাহিয়া,
এই যে এসেছি দেশে, উদাসী বিদেশীবেশে
তোমারে হৃদয়রাণি! দেখিব বলিয়া,
চাহগো বদন তু'লে, কমল নয়ন খু'লে,
এত হাহাকার কিগো শোননা শুনিয়া?
না শু'নে তোমার কথা, না বু'ঝে তোমার ব্যথা
বিদেশে গেছি যে দেবি তোমারে ছাড়িয়া,
সেই রাগে অভিমানে, পাষাণ বাঁধিয়া প্রাণে
ছাই ভস্মে চন্দ্রমুখ আছ লুকাইয়া?
আরো অভিমান কত, করেছ ত অবিরত
আবার ভুলিয়া গেছ কাঁদিয়া হাসিয়া!
কি দোষ করেছি পায়, এ মান যে নাহি যায়
কাতরে করুণ-কণ্ঠে সহস্র সাধিয়া?
এই যে এসেছি দেবি দেখগো চাহিয়া!

৪

ওঠ, ওঠ, আর কেন, চল যাই ঘরে,
কে কোথা রমণী হেন অভিমান করে?

কে কোথা কুলের নারী, ছেড়ে এসে ঘরবাড়ী
একা এসে শু'যে থাকে চিতার উপরে ?
কত লোকে দেখে যায়, ভ্রুক্ষেপ নাহিক তায
ছি ছি ছি, নাহিক লজ্জা নারীর অন্তরে ?
কে কোথা রমণী হেন অভিমান করে ?

৫

বিদেশে যাবনা আর ছাড়িয়া তোমায়,
ওঠ মান পরিহরি, বলিনু প্রতিজ্ঞা করি
ওঠ গো করুণাময়ি স্নেহ মমতায় !
আর না বিদেশে যা'ব, না হয় মাগিযা খা'ব
ধিক্ সে দাসত্বে ধিক্ শত ধিক্ তায়,
ধিক্ সে সম্মান অর্থে, যে তোমার পরিবর্ত্তে
স্বর্গের সাম্রাজ্য আমি ঠেলে ফেলি পায় !
যার যাহা মনে লয়, বলুক করিনা ভয়,
ভ্রুক্ষেপে করিনা তুচ্ছ পরের কথায় !
অনাহারে উপবাসে, থাকিব তোমার পাশে
ভুলে যা'ব ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখিযা তোমায়।
চাঁদেরে দেখিয়া বে'তে, আনন্দ উল্লাসে মে'তে
চঞ্চল চকোর যথা সব ভুলে যায়,
ভুলে যাব ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখিয়া তোমায় !

৬

উঠ দেবি দয়াময়ি ! চল যাই ঘরে,
কত দুঃখ কষ্ট স'য়ে, কত জ্বালাতন হ'য়ে
এই যে এসেছি ফিরে এত দিন পরে,
দেখিয়া তোমার মুখ, জুড়াইব দগ্ধ বুক
জুড়াইব দগ্ধ প্রাণ সুধার সাগরে !
ওঠ ভগ্নি ! ওঠ ভাই ! ওঠ জায়া ঘরে যাই,
লও জননীর যত্নে পিতার আদরে !
সকলের স্নেহসিন্ধু, উজলিয়া উঠ ইন্দু,
তোমার অমৃতময় প্রেমময় করে !
তুমি বিনে কেবা আছে, যাইব কাহার কাছে,
ভ্রমিয়া দেখেছি সব দেশ দেশান্তরে,
সংসারে মমতা নাই, আছে ভস্ম আছে ছাই,
আছে রাক্ষসের রাজ্যে ঘৃণা পরস্পরে,
নাহি অশ্রু দীন দুঃখী শোকার্ত্তের তরে !

৭

ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আম'র,
প্রীতির প্রসন্নমুখে, লও সে উদার বুকে
ভুলে যাই সংসারের ঘৃণা অত্যাচার,
ভুলে যাই অবহেলা, পদাঘাতে ঠেলে ফেলা,
আদরে মুছায়ে প্রিয়ে লও অশ্রুধার !
সংসারের শতপাপে, জ্বলে প্রাণ পরিতাপে
পবিত্র করিয়ে লও পরশে তোমার !
দুঃখীরে করিতে স্নেহ, জগতে নাহি যে কেহ
কেবল তুমিই আছ প্রেম পারাবার ,—
ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আমার !

৮

এই ঘোর অন্ধকার নিশীথ সময়,
কেমনে থাকিবে তুমি, একেলা শ্মশান ভূমি
মানুষ দূরের কথা, যমে করে ভয় !
শিয়াল শকুন-পড়া, আধা খাওয়া পচা মরা
চড়িয়া আসিবে ভূত পিশাচ নিচয় !
বসিয়া মরার কান্ধে, খ'বে মরা নানা ছান্দে
দৌড়িয়া ছুটিবে মরা চারিদিকময় !
আসিবে কবন্ধ দানা, ডাকিনী যোগিনী নানা
উভে উভে গিলে মরা খাবে সমুদয় !
পচা যত নাড়ী ভুড়ি, খাইবে পেত্নিনী বুড়ী,
ফুঁকনে গলিত বিষ্ঠা ধারা বেগে বয় !
পরিয়া মরার হাড়, সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার
নাচিবে উলঙ্গ প্রেত পিশাচ নিচয়,
সে বিশাল লম্ফে ঝম্পে, আতঙ্কে ধরণী কম্পে,
প্রকৃতি প্রলয়ে যেন ভয়ে মরে রয় !
দানবের সে তাণ্ডবে, সরলা কেমনে র'বে
একেলা থাকিতে তব ভয় নাহি হয় ?
কে আছে মানুষ হেথা এমন সময় ?

৮

ওঠ দেবি প্রাণময়ি চল যাই ঘরে,
ছি ছি ছি! নারী কি এত অভিমান করে?
আহা ও সোণার দেহ, কে করে যতন স্নেহ
অযতনে পড়ে আছে চিতার উপরে।
এই যে পড়িছে হিম, অনন্ত অপরিসীম,
শীতে যেন তরুলতা কাঁপে থরথরে।
কেন ঘর বাড়ী থু'য়ে, শ্মশানে রহিলে শু'য়ে,
যামিনী দেখিয়া তার আঁখি জল ঝরে।
সরলা! তোমারি দুখে, অই যে বিষণ্ণ মুখে
কাতরে শিয়ালগুলি "আহা উহু" করে।
এমন সোণার দেহ, শ্মশানে দেখিয়া কেহ
ধৈরয ধরিতে নাকি পারে গো অন্তরে?
ওঠ দেবি দয়াময়ি, চল যাই ঘরে!

৯

ওঠ দেবি দয়াময়ি, সারদা আমার!
ঠেলে ফেলে ভস্ম ছাই, ওঠ, চল ঘরে যাই,
থাকিবে শ্মশানে শু'য়ে কত কাল আর?
দিন দিন প্রতিদিন, ক্রমশঃ হতেছে লীন,
মাটীতে মিশিল প্রায় চিতার অঙ্গার!
তবু কি যায়নি মান, হয়নি প্রসন্ন প্রাণ,
শু'নিয়া শোন না কি গো এত হাহাকার?
অঙ্গারের চেয়ে মান এতই অঙ্গার?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

অদ্ভুত মত।*

(শেষ আবেদন।)

অশেষ-মানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের সহিত পুনঃ পুনঃ বাদানুবাদ করা আমার অনভিপ্রেত তবে তিনি নাকি কয়েকটি ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, সেই কারণে আমাকেও আমার শেষ বক্তব্য সর্ব্বসমক্ষে নিবেদন করিতে হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপক, প্রাতঃস্মরণীয় মহামনা রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারকগণের সহিত (Precepts of Jesus) "খ্রীষ্টের উপদেশ" পুস্তক প্রচারোপলক্ষে যে পদ্ধতিতে বিপ্লব ও তর্কবিতর্ক করিয়া গিয়াছেন, ভাবিয়াছিলাম—বসু মহোদয়ও তদনুরূপ রীতি অবলম্বন করিবেন। রাজা, যেরূপ ধীরতা-গম্ভীরতা-সহকারে বক্তব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এখানে সেরূপ দেখিতে পাইলাম না—আমার মনের আশা ফলবতী হইল না। আমি এক জন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ধৈর্য্যক্ষয়ের কারণ হইয়াছি বলিয়া, এখন আমার মনে বড়ই খেদ হইতেছে। যাহা হউক, সম্প্রতি আমার বক্তব্য বিষয়গুলি প্রদর্শন করিতেছি। বসুজ মহাশয় যে সম্বন্ধে তর্ক করিতেছেন, তাহার সমগ্র ভাগ উদ্ধৃত না করিয়া বা তদ্বিবরণ নিজের কথায় না বলিয়াই, কেবল একটি কথা মধ্য হইতে কহিয়া থাকেন। ইহাতে সাধারণ পাঠকের বুঝিবার পক্ষে

* শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবুর শেষ প্রতিবাদ প্রবন্ধ উপলক্ষে আমরা বলিয়াছিলাম, এ সম্বন্ধে আর প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে কোন পক্ষ আমাদিগকে অনুরোধ করিবেন না। ইহা সত্ত্বেও মহেন্দ্র বাবু এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে একান্ত অনুরোধ করিতেছিলেন। এই তাঁহার শেষ বক্তব্য জানিয়াই ইহা প্রকাশ করিলাম। ন

অত্যন্ত অসুবিধা হয়, এ কারণ আমি অগ্রে প্রতিবাদের বিষয়টি মূল প্রবন্ধ হইতে প্রদর্শন করি, পশ্চাৎ নিজের কথা বিবৃত করি। আমার সকল প্রস্তাবেই এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, সুতরাং এস্থলেও তদ্রূপ হইল।

১। "বিদ্যানিধি মহাশয়, অজ্ঞেয়তাবাদ কাহাকে বলে, তাহা এখনও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই। অক্ষয় বাবু বলেন, **ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়।"**

অক্ষয় বাবু কোন স্থানেই "ঈশ্বর **সম্পূর্ণরূপে** অজ্ঞেয়" বলেন নাই। নব্যভারতের "মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্মবিষয়ক মতামত" নামক দুই প্রস্তাবে ঈশ্বরসংক্রান্ত বিষয় সমস্তই উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার কোন স্থলেই ঈশ্বর "সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়" এই শব্দ নাই।

২। "ঈশ্বর যদি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় হইলেন, তাহা হইলে, তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, করুণা আছে, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? জ্ঞানবিহীন, শক্তিবিহীন, করুণাবিহীন ঈশ্বর থাকাও যাহা, না থাকাও তাহা। এই জন্যই আমি অজ্ঞেয়তাবাদকে নাস্তিকতার কাছাকাছি বলিয়াছিলাম। মনুষ্য স্বভাবতঃ ভক্তি-প্রবণ। অজ্ঞেয়তাবাদ অথবা সংশয়বাদ, মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ নহে। মনুষ্যের মন বিকৃত না হইলে, অজ্ঞেয়তাবাদ অথবা সংশয়বাদে উপনীত হয় না। মনের এরূপ বিকৃতাবস্থাকে এক প্রকার উন্মাদাবস্থা বলিলে বলা যাইতে পারে। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের সহস্র সদ্গুণ ছিল। সে সকল শ্রদ্ধার উপযুক্ত। তাহা বলিয়া তাঁহার অজ্ঞেয়তাবাদকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিদ্যানিধি কখন অক্ষয় বাবুর ভক্তি, কখনও বা তাঁহার নিজের অজ্ঞেয়তাবাদকে প্রশংসা করিতেছেন। * * নাস্তিকতার সঙ্গে তুলনায় অজ্ঞেয়তাবাদকে আমি ৪৮ ডিগ্রী বলিয়াছিলাম, তাহাতে বিদ্যানিধি ক্রোধান্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ ও তাঁহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর ৺অক্ষয়কুমার দত্ত যদি জীবিত থাকিতেন, আর আমি কথায় কথায় তাঁহাকে ঐরূপ উপহাস করিতাম, তাহা হইলে তিনি উহা লইয়া বিলক্ষণ আমোদ করিতেন, সন্দেহ নাই।"

অক্ষয়কুমার বাবু অজ্ঞেয়তাবাদী, যখন ইহা সপ্রমাণ হয় নাই, তখন তৎসম্বন্ধে কোন অভিপ্রায়ই গ্রহণীয় হইতে পারে না। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বসুজ মহোদয়, অক্ষয় বাবুকে উন্মাদগ্রস্ত বলিতে সাহসী হইবেন না। এখন দেখিলাম, আমাদের অনুমান অলীক। অক্ষয় বাবুর অজ্ঞেয়তাবাদ, রাজনারায়ণ বাবু সম্মান করুন, একথা কোথাও বলি নাই। অজ্ঞেয়তাবাদই যখন স্বীকৃত হইল না, তখন তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে বলাই অসম্ভব। দত্তজ মহাশয়কে আমার "আদর্শ" ও "পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর" বলা কি ভাল হইয়াছে? অক্ষয় বাবু আমার "বন্ধুবর" না হইয়া, বসুজ মহাশয়ের "বন্ধুবর" হইলেই, ভাল হইত না? বসু মহাশয়ের আত্মীয় অক্ষয় বাবুর জীবদ্দশায় উপাসক-সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে মতামত প্রকাশিত হয়। তখন বসুজ "কথায় কথায় ঐরূপ উপহাস" করেন নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। তাহা হইলে, আমার সঙ্গে তাঁহার এ অংশে বাদ প্রতিবাদ চলিত না।

দত্ত মহাশয়ের ধর্ম্মবিষয়ক অভিপ্রায়

বিষয়ে সম্প্রতি যেরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"অশেষসম্মানভাজনেষু—

"পরলোকগত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের ধর্ম্মবিষয়ক মতামত লইয়া অশেষ-মানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত আমার বিচার চলিতেছে। লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, আপনি না কি এ বিষয়ে অক্ষয় বাবুর মুখে কিছু শুনিয়াছিলেন। অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক এই বিষয়ে আমায় জ্ঞাত করিলে, বড়ই উপকৃত ও চির-বাধিত হইব। ইতি ১২৯৫ সাল, ১লা আশ্বিন।

২৫ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ভবদীয় স্নেহপাত্র শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

ইহার উত্তরে বাবু কানাইলাল পাইন মহাশয় লেখেন,—

"My dear Sir,

"In reply to your letter of the 16th instant, I beg to quote the following lines from the manuscript of my History of the Brahma Samaj—'Whilst passing two days with him (Akshay Babu) at Bali in September 1876, one morning I and my youngest son chanted hymns in his beautiful garden taking our seat under the shade of some lofty trees. Babu Akshaykumar Datta sat at a little distance from us. After the service was over, we met and I marked that his face glowed with the love of God and I heard him say "আজ আমার গৃহ প্রতিষ্ঠা হ'ল"।*

* 'I omitted to mention, in my short account of the life of Babu Akshaykumar Datta published in the Indian Messenger of the 13th June, 1886, the answer he (Akshay Babu) gave to my question regarding his religious belief on that occasion. He said that he was 'a deist.'"

16th Septr, 1888. Yours sincerely Canailal Pine

To Pandit Mahendranath Vidyanidhi

ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংস্থাপয়িতা মহামহোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রায়ও যে "ডীষ্ট" ছিলেন, তৎপ্রণীত পারস্য ও আরব্য ভাষায় লিখিত "তোহফতুল্মোহদীন্" নামক গ্রন্থের ইংরেজীতে অনুবাদিত পুস্তকে তাহা সপ্রমাণ হয়। যথা,—

"The following is a literal English translation of *Tuhfatul Muwahaddin* or the gift to the Deists—a small pamphlet in Persian by the late Raja Rammohun Roy, on the doctrine of Deism." Tanslator's Preface.

৩। "বিদ্যানিধি মহাশয় এক আশ্চর্য্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি উপনিষদ্কার ঋষিদিগকে অজ্ঞেয়তাবাদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।"

আমি উপনিষৎকর্ত্তা ঋষিগণকে কখনই অজ্ঞেয়তাবাদী বলি নাই এবং বলিবার ইচ্ছাও করি না। যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এই—"অজ্ঞেয়তাবাদ যদি নাস্তিকতা হইতে এক ডিগ্রী কম হয়, তবে উপনিষৎকর্ত্তারাও ঐরূপ ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। উপনিষৎকারদের রচনাবলি সংগ্রহ করিয়াই আদি সমাজের মত পুষ্ট হইয়াছে। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় **উপনিষৎকারগণের সহিত সমস্বরে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াও** বসু মহাশয়ের নিকট নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?"—[নব্যভারত, ১২৯৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ, ১২২ পৃ]

উপনিষৎকর্ত্তারা ঈশ্বরের স্বরূপ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, দত্ত মহাশয়, তাহাই "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজের মত প্রকাশ করেন।

এই কারণেই আমি লিখিয়াছিলাম, "তাহা হইলে উপনিষৎ-কর্ত্তারাও অজ্ঞেয়তাবাদী।" (ঐ, ১২১ পৃ)

৪। "দোষ ছাড়া মানুষ নাই। অপক্ষপাতী জীবনবৃত্ত লেখকের কর্ত্তব্য যে, নায়কের দোষ গুণ উভয়ই লিখেন; কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার প্রণীত অক্ষয় বাবুর জীবনচরিতে দোষের বিষয় কিছুই লেখেন নাই, এ জন্য লোকে তাহাকে চেলা ও অক্ষয়োপাসক বলিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহাতে চটিলে চলিবে কেন? কই, উক্ত জীবনবৃত্তে এমন একটি স্থান দেখান দেখি, যাহাতে অক্ষয় বাবুর কোন দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন?"

বসু মহাশয় স্বীয় শ্রদ্ধেয় বান্ধব-প্রবরের দোষ শুনিতে চাহেন, এত দিন আমার তাহা জানা ছিলনা। এখন আমার বিষম বিপাক উপস্থিত। এক দল কহিতেছেন, বসুজ মহাশয়, অক্ষয় বাবুর যে সহস্র গুণ আছে বলিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া, তাহা কেন বর্ণন করি নাই? বসুজ মহাশয় সহস্র গুণ দেখাইয়া, একমাত্র দোষ দর্শাইয়াছেন। আমি যবং বসুজের লেখা হইতেই, অক্ষয় বাবুর দুইটি দোষ প্রদর্শন করিয়াছি। "অক্ষয় বাবুর ধর্ম্ম বিষয়ক মতামত প্রবন্ধে"ও দুইটি ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমটি এই,—দত্তজ "খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষ" বলায় আমি তাহা দূষণীয় সাম্প্রদায়িক মত নির্দ্দেশ করিয়াছি। অনুসন্ধানে যত দূর পাওয়া গিয়াছে, আমি তত্তাবৎ লিখিয়াছি। আশা করি, বসুজ এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন। তদ্ব্যতীত আরও একটি বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। যথা,—

"একবার অক্ষয় বাবুকে আমি পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া এই উত্তর পাইয়াছিলাম, "কেবল সৃষ্টিপ্রণালীর উপর নির্ভর করিলে, স্পষ্ট বোঝা যায় না। জগতে যেমন অনন্ত দয়ার কার্য্য বিদ্যমান আছে, তেমনই অনেক নিষ্ঠুরতারও দৃষ্টান্ত দেখা যায়।"—[নব্যভারত, ১২৯৪, মাঘ।]

যদি অক্ষয় বাবুকে যারপরনাই ঈশ্বরপরায়ণ প্রমাণ করা, আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে ঐ অংশ কখনই সর্ব্বসাধারণের গোচর হইতে পারিত না। কেননা, কোন স্থানেই উহা মুদ্রিত নাই এবং কেহই উহা জানিতেনও না। এতদ্ভিন্ন "অক্ষয় বাবুর ধর্ম্মবিষয়ক মতামত" নামক দ্বিতীয় প্রস্তাবে নব্যভারতে কোন কথাই গোপন করি নাই। প্রথম প্রবন্ধে যে সকল বিষয় বলা হয় নাই, দ্বিতীয় বারে তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছি।

৫। "কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ঘোর অন্যায় পক্ষপাতিতা ব্যতীত বিদ্যানিধির আর এক রোগ আছে। কোন্ কালে কখন কোন্ ব্যক্তি বন্ধুতার খাতিরে কোন্ একটি কথা বলিয়াছিল, কিম্বা কোন একখানি পত্র লিখিয়াছিল, তিনি তাঁহার অনুমতি না লইয়া, তাহা সাধারণের সমক্ষে বাহির করিয়া বিশ্বাসের পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করেন। ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিতে ও তাঁহার সম্প্রতিকের লেখা।"

বসুজ মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা জটিল বলিয়া সংক্ষেপে বিবরণটি পাঠককে বুঝাইতেছি। রাজনারায়ণ বাবু নিজেই এক দিন গল্প করেন যে, অক্ষয় বাবু ও দেবেন্দ্র বাবুর মধ্যে যখন বিচার চলে,

তখন "আমি (বসুজ) কিন্তু স্বভাবতই বরাবর দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে ছিলাম।"

—[মৎপ্রণীত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, ৮৪ পৃষ্ঠার টীকা।]

পাঠকেরা এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঐ বিষয়টি প্রকাশ্য, কি গোপনীয়। উহা যদি অপ্রকাশ্য হয়, তবে প্রকাশ্য বিষয় কিছুই থাকে না।

বসুজ মহোদয় লিখিয়াছেন, "মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের সহস্র গুণ ছিল। তিনি সে বিষয়ে অনুকরণ-স্থল ছিলেন।" কিন্তু দত্ত মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে গৌরব লইবার জন্য লোলুপ ছিলেন, এটি "তাহার একটি দোষ ছিল।" আমি ইহারই উত্তরে লিখি, অক্ষয়বাবু ব্রাহ্মসমাজে যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার গৌরব লওয়া যদি দোষ হয়, তবে বসু মহাশয়ও তো "ব্রাহ্মসমাজে 'প্রীতি' শিক্ষা দিয়াছেন" বলিয়া থাকেন। "এ বিষয়ে বসুজের ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবরের লিপি আছে,"—ইহাও আমি কহিয়াছিলাম। রাজনারায়ণ বাবু ইহাকেও "বিশ্বাসের পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ" করা কহিতেছেন। এ ব্যাপারটিও গোপনীয় কি না, পাঠকগণ পশ্চাৎ দেখুন। বাবু কানাইলাল পাইন্ মহাশয়ের বিরচিত, ইংরেজী ভাষায় লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে লেখা আছে,—

"He (Babu Rajnarayan Basu) writes in a letter to my address dated the 28th October, 1875. "I was the humble instrument in the hand of God of introducing the element of প্রীতি or Love into the Brahma Samaj. The discourses of Akshay Babu and *others* treated only of the contemplation of the Deity through the works of nature and of the moral duties of man in general. In fact the word প্রীতি is only once or twice used in the Baktritas of Akshay Babu."

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যাহা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাও কি প্রকাশ করিলে "বিশ্বাসের পবিত্র নিয়ম" ভঙ্গ করা হয়! বসুজ মহাশয় আশ্বস্ত হউন। তাঁহার গোপনীয় কোন বিষয়ই আমা দ্বারা প্রচারিত হইবে না। তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার আত্মীয়েরা ইতিপূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা ঘটনাক্রমে আমি জানিতে পারিয়াছি। সেই বিবরণ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রকাশ করিলে, আমার একটি বিষয়ের প্রধান প্রমাণ হয়। কিন্তু আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বসুজের নিকট ঐ বিষয়ে "বিশ্বাসের পবিত্র নিয়মে" বদ্ধ না হইলেও, প্রকাশ করিতে সম্মত নহি। বিবরণটি কিছুপরে তিনি লোকমুখে শুনিতে পাইবেন।

৬। "আমার ঈশ্বর-প্রীতি বিষয়ক বক্তৃতার কিসের অভাব যে, অক্ষয়কুমার দত্তের একটি বক্তৃতা চুরি করিতে গেলাম? তাই বলুন যে, তাঁহার প্রেমাস্পদের জন্য তিনি একটি ঐরূপ বক্তৃতা চাহেন, তাহা হইলে তাহার স্বত্ব আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক একেবারে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। ইহা বলিলে আত্মশ্লাঘা হইবে যে, অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বর-প্রীতি-বিষয়ক বক্তৃতা করিতে অথবা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব লিখিতে আমার নিকট শিখেন। পূর্ব্বে তিনি প্রধানতঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রদর্শিত ঈশ্বরের মহিমা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা করিতেন এবং ঈশ্বর প্রীতি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে প্রস্তাব লিখিতেন।"

অক্ষয় বাবু আমার "প্রেমাস্পদ" না হইয়া বসুজ মহাশয়ের "প্রেমাস্পদ" হইলেও

ভাল হয় না? কানাই বাবুর ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া, বসু মহাশয়ের যে পত্র উপরে মুদ্রিত হইল, তাহাতে তিনি এই সময়ের ১৩তের বৎসর পূর্ব্বে কহিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মসমাজে "প্রীতি" শিক্ষা দিয়াছেন। এখন বলিতেছেন, "অক্ষয়কুমার দত্ত প্রীতিবিষয়ক বক্তৃতা অথবা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব লিখিতে আমার (বসুজের) নিকট শিখেন।" তবে বসু মহাশয়ের পূর্ব্ব বাক্যের সহিত ঐক্য রক্ষা করিতে হইলে, "ব্রাহ্মসমাজ" বলিতে একমাত্র অক্ষয়কুমার দত্তকেই বুঝাইতেছে। তবে কি বসুজ, দত্তকেই তদানীন্তন সমাজের প্রতিনিধি বলিতেছেন না? বসুজ মহাশয়, ব্রাহ্মসমাজে প্রীতি শিক্ষা দিয়াছেন, এই বাক্যে দেবেন্দ্র বাবু, অক্ষয় বাবু প্রভৃতি সকলকেই তিনি ঈশ্বর-প্রীতি শিখাইয়াছেন, বলা হইয়াছে। কেন না, তিনি ইংরেজী পত্রে লিখিয়াছিলেন, অক্ষয় বাবু ও অন্যান্য সকলের বক্তৃতায় (The discourses of Akshay Babu and *others*.) প্রীতি ছিল না। তিনি আরও বলেন, অক্ষয় বাবুর বক্তৃতায় "প্রীতি" এই শব্দের একবার কি দুইবার প্রয়োগ আছে। যাহা হউক, দত্তজের বক্তৃতায় তবু তো "প্রীতি" শব্দ দুই একবারও প্রযুক্ত আছে, অন্যান্যের বক্তৃতায় তাহাও যে নাই! যাহা হউক, বসুজ মহাশয় অক্ষয়কুমারকে যদি শিক্ষাই দিয়া থাকেন, উত্তম কথা। এত বিতণ্ডা কেন?

৭। "সুরভিতে বিদ্যানিধির সহিত বেদ অভ্রান্ত, এই মত পরিত্যাগ কার্য্যে অক্ষয়কুমার দত্তের সাহায্য-বিষয়ে আমার যখন তর্ক হয়, তখন আমি দেখাইয়াছিলাম যে, বেদের উক্তি সকল প্রবল যুক্তিযুক্ত, এইজন্য আমরা বেদকে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।

"For the cogency and reasonableness of its doctrines (Vedantic doctrines vindicate.) ' Because they (the Vedas) agree with nature, they (Brahmas) consider them as inspired.' (Rev. Mullen's Vedantism, Brahaism & Christainity.)

"যাঁহারা বেদকে এরূপ ঈশ্বর প্রণীত মনে করিতেন, বেদের অভ্রান্ততাকে তাঁহাদিগের বিশ্বাসকে বিচলিত করা একটা প্রকাণ্ড কার্য্য বলিয়া মনে করি না। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি চারি জন কাশীতে বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আসিবার ও অক্ষয় বাবুর সহিত দেবেন্দ্র বাবুর উহার তর্ক হইবার পূর্ব্বে Reverend Stevenson's Translation of the Sam Veda পড়িয়া অস্পষ্টরূপে বেদের ভ্রান্ততা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের মনে প্রথম প্রতিভাত হয়, তাহার পর বেদাধ্যয়নকারীরা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলে, অক্ষয়বাবুর সহিত ঐ বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হয়। নিজে যে আদোবে বেদের ভ্রম বুঝিতে পারেন নাই, এমন নহে; কিন্তু পাছে যাহা ভ্রম মনে করিতেছেন, তাহা যথার্থতঃ ভ্রম না হয়, এই জন্য অক্ষয়বাবুর সহিত সর্ব্বদা তর্ক করিতেন। তখন অক্ষয় বাবুর অধিষ্ঠান ও অন্যান্য কারণ জন্য সমাজ-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই বহু তর্ক না হইলে স্থিরীকৃত হইত না।"

(ক) ষ্টিভেন্‌সনের অনুবাদিত সামবেদ পাঠে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বেদ-বিষয়ক ভ্রান্তি প্রথম মনে হয়, এই নূতন কথা সকলে এই প্রথম শুনিলেন। অক্ষয় বাবুর জীবিতাবস্থায় বসু মহাশয়

স্মরভিতে আমার যে প্রতিবাদ লেখেন, কৈ তাহাতেও একথা বলেন নাই।

(খ) কাশী হইতে রামনাথ ভট্টাচার্য্য, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, তারকনাথ তর্করত্ন ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এই চারি জন পণ্ডিত ফিরিয়া আসিলে পর, অক্ষয় বাবুর সহিত দেবেন্দ্র বাবুর তর্ক বিতর্ক হয়, ইহাও বসুজ মহাশয় স্মরভিতে লেখেন নাই। এটি ইতিহাস-বিরুদ্ধ বাক্য। এ সম্বন্ধে প্রকৃত বিষয় জানিবার জন্য ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলায়ের মিরার, ১২৯২ সালের ২২শে আশ্বিনের স্মরভি, ১২৯৩ সালের চৈত্র মাসের নব্যভারতের ৫৬৭ ও ৫৬৮ পৃষ্ঠা ইত্যাদি পাঠকগণ দেখিবেন।

(গ) বসু মহাশয়, ১২৯২ সালের ৮ই আশ্বিনের স্মরভি পত্রে তাহার ও আমার বাদ-প্রতিবাদের যখন উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহা পাঠকদিগকে বুঝান আবশ্যক। বসু মহাশয় স্মরভিতে দুইটি বিষয় স্বীকার করেন। (১) বেদশাস্ত্র ঈশ্বর-প্রণীত—এই মত সর্ব্ব প্রথমে তিনি ও দেবেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই মত কিছুদিন মাত্র ছিল, তিনি বলেন। (২) তৎপরে বেদশাস্ত্র সত্যের আকর, অতএব ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ—এই মত দেবেন্দ্র বাবু, তিনি ও অন্যান্য সকলে মানিতেন। অক্ষয় বাবুর সহিত বিচারে এই মত অপনীত হয়, বসু মহাশয় স্বীকার করেন।

(ঘ) রাজনারায়ণ বাবুর মতে শেষাবস্থায় বেদ-সম্বন্ধে তাঁহাদের যে মতামত ছিল, অক্ষয় বাবু তাহাই খণ্ডন করেন। মহাত্মা বসুজের এই মত গ্রহণ করিয়া, আমি স্মরভিতেই লিখিয়াছিলাম যে, বসু মহাশয় যে বিষয়টিকে তাঁহাদের প্রথমাবস্থার মত বলিয়াছেন, তাহাই দ্বিতীয় বা শেষ অবস্থার মত। তাহা যদি শেষাবস্থার মত হইল, তবে অক্ষয় বাবু তাহাই খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বসুজের বাক্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদ-শাস্ত্র—ঈশ্বর-প্রণীত, এই মত, দ্বিতীয় অবস্থার মত কেন, তাহার প্রমাণ স্মরভি পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল,—

"সর্ব্বপ্রথমে বৈদিক প্রত্যাদেশ-বিষয়ে আমাদের (দেবেন্দ্র বাবু ও রাজনারায়ণ বাবুর) এই রূপ মত ছিল—'পরমেশ্বর প্রণীত বেদের ভাব আদি মনুষ্যের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রবণ দ্বারা পরম্পরা প্রবাহিত হইয়া আসিল, যাহাতে শ্রুতি নামে খ্যাত হইল'।"—[স্মরভি ১২৯২। ৮ আশ্বিন]*

"(১)" চিহ্ন এক "পরমেশ্বরের প্রণীত বেদ" ইত্যাদি বিষয়টি ১৭৬৮ শকের চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত আছে। আর দুই "(২)" চিহ্নে যে মত আছে, ১৭৬৭ শকের আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা প্রচারিত আছে। বেদশাস্ত্র পরমেশ্বর প্রণীত এই মত।) "For the cogency and reasonableness of its doctrines") ইত্যাদি কথা কি মতের পরের মত? আর, রাজনারায়ণ বাবু বলিতেছেন, শেষাবস্থায় তাহাদের যে মত ছিল, তাহা দত্ত মহাশয় বিদূরিত করেন। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত—এই মতটি অক্ষয় বাবু দ্বারা তিরোহিত হয়। ইহার সবিশেষ বিবরণ ১২৯২ সালের ২২শে আশ্বিনের স্মরভিতে অথবা ১২৯৩ সালের চৈত্র মাসের নব্যভারতে পাঠকেরা দেখিবেন।

(ঙ) তৎপরে মহানুভব রাজনারায়ণ বসু কহিয়াছেন, অক্ষয় বাবুর পক্ষে উহা একটা "প্রকাণ্ড কাণ্ড বলিয়া মনে করি না।"

---

* রাজনারায়ণ বাবুর নিজের উক্তি এইরূপ।

সুরভিতেও বলিয়াছিলেন, ঐরূপ করা "অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য।" "মহেন্দ্র বাবু উহাকে যেরূপ গুরুতর কার্য্য বলিয়া সাজাইয়াছেন, সেরূপ গুরুতর নহে।" এ বিষয়ে বক্তব্য,—পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত কল্পদ্রুম চতুর্থ খণ্ড, নববার্ষিকী, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলায়ের মিরার, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুনের ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার্ প্রভৃতিতে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে, প্রায় ৭।৮ সাত বা আট বৎসর অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বাবু প্রভৃতির সহিত তুমুল তর্ক বিতর্ক করেন। ফলতঃ ন্যূনাধিক ৭।৮ সাত আট বৎসর ব্যাপিয়া যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা "যদি অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য" অ-"গুরুতর" অ-"প্রকাণ্ড কার্য্য" হয়, তবে অ-"সহজ" "গুরুতর" "প্রকাণ্ড কার্য্য" কাহাকে কহে?

৮।--"দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক। তিনি অক্ষয় বাবুর মতে সায় না দিলে বেদের অভ্রান্ততা পরিত্যাগ-বিষয়ে কোন কার্য্য হইত না। অধিনায়ক কোন বিষয়ে মন্ত্রীদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করেন, তাহা বলিয়া কি সেই কার্য্যের গৌরব কেবল মন্ত্রীদিগেরই প্রাপ্য? অধিনায়কের কি তাহাতে অংশ নাই?"

আমার প্রণীত দত্তজ মহানুভবের জীবনীতেও তো লেখা আছে, "দেবেন্দ্র বাবু, তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মতই সমাজের মত ছিল। অতএব তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে পারিলেই, সমাজের ভ্রান্তি অপসারিত হইয়া যাইবে, এই মনে করিয়া ইনি (অক্ষয় বাবু) ঐ সকল বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন।"—[মৎপ্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, ৮০ পৃষ্ঠা।]

কেবল মন্ত্রীর বুদ্ধিকৌশলেই যদি কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহার গৌরব প্রধানতঃ মন্ত্রীরই প্রাপ্য। রাজা, বুদ্ধিপূর্ব্বক মন্ত্রীর কথা শুনিয়াছেন বলিয়া, সেটি তাহার পক্ষে 'প্রশংসার বিষয়।' তাহাতে তাহার ঔদার্য্যই প্রকাশ পায়। আর রাজা, মন্ত্রীর যুক্তি পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, যদি বিপদ্‌মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে রাজা ও সর্ব্বসাধারণেরই উপকার।

৯। "অক্ষয় বাবু এই বিষয়ে সমাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমরা চিরকাল স্বীকার করিয়া আসিতেছি ও চিরকাল করিব।"

বসুজ মহাশয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের দ্বিতীয় ভাগে ২১১ সংখ্যায় "ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববৃত্ত" প্রস্তাবেও কি এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন? উক্ত সময় কি "চিরকালের" মধ্যে গণনীয় হইবে না?

১০। বসুজ প্রথম প্রস্তাবে লেখেন,—"অক্ষয় বাবুর সংশয়-ভাব-সময়ে চারুপাঠের অনেক সংস্করণ বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে সকল প্রস্তাব আছে, তাহা তাহার ব্রাহ্মসমাজে থাকিবার কালে রচিত হইয়া তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়।"

ইহার উত্তরে আমি লিখি, "চারুপাঠের দ্বিতীয় ভাগে "নীতি চতুষ্টয়" প্রস্তাবে যে ঈশ্বরের করুণাদির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাও কি তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত ছিল? ব্রাহ্মসমাজ হইতে অপসৃত হইবার পর কি তাহা লিখিত নাই?" [ন,ভাঃ,৬খ,২।৩সংখ্যা]

উক্ত বিষয়ের উত্তরে বসুজ, ভাদ্রমাসে

লেখেন, "ইহার উত্তর আমি পূর্ব্বে প্রস্তাবে দিয়াছি। তাহাতে বলিয়াছি যে, 'সংশয় বাদী ও অজ্ঞেয়তাবাদীদিগের মানবজাতির প্রতি এত টুকু করুণা আছে যে, ছেলেদের জন্য তাহারা যে সকল পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে ঈশ্বর-বিষয়ক প্রস্তাব থাকিতে দেন।' এই সম্বন্ধে আমার প্রস্তাবের যে অংশ বিদ্যানিধি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে এই স্থানটি ছাঁটিয়া দিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিদ্যানিধি, উচিত কার্য্য করিয়াছেন কি না, তাহা তিনি বুঝিবেন।'

যে অংশটি বাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সহিত বিচার্য্য ভাগের কোন সঙ্গত সম্বন্ধ ছিল না, এই হেতু উদ্ধৃত করি নাই। অজ্ঞেয়তাবাদীরা বালকগণের নিমিত্ত যে পুস্তক লেখেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্ব রচিত প্রবন্ধে বর্ণিত ঈশ্বরের প্রসঙ্গ বিলুপ্ত না করিয়া, যথাবৎ রাখেন, ইহাই বসুজের লেখায় বুঝায়। এই কারণে ঐ অংশ উদ্ধৃত করি নাই। যে মানুষ, যে সময়ে পরম পিতার করুনাদি গুণ কীর্ত্তন করিলেন, তাহাকে সেই সময়েও "অজ্ঞেয়তাবাদী" কেমন করিয়া বলা যায়? বসু মহাশয়ের উক্তি একাংশে খণ্ডিত হওয়ায়, অপর যে অংশে অক্ষয় বাবুকে অজ্ঞেয়তাবাদী বলা হইয়াছে, তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে, বলাই বাহুল্য।

১১। "শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন মহাশয় এক জন প্রাচীন ও মাননীয় ব্রাহ্ম বটেন, কিন্তু তিনি আত্মীয় সভার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরস্পর-বিরোধী। অতএব বোধ হইতেছে যে এ বিষয়ে কানাই বাবুর ভ্রম হইয়াছে। তাঁহার কথা আপনি আপনাকে খণ্ডন করিতেছে। কানাই বাবু বলেন যে, উপাসনার প্রকরণের কোন্ কোন স্থান পরিবর্ত্তিত হইবে, ইহার বিচার হইত, ঈশ্বরের স্বরূপ-বিষয় বিচার হইত না। কিন্তু আমি বলি, দুইই এক। মনে কর, উপাসনার প্রকরণে আছে "সর্ব্বশক্তিমান।" বিচারের পর অধিকাংশ সভ্যের মত স্থির হইল যে, ঐ শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়া "বিচিত্র-শক্তিমান্" এই শব্দ ব্যবহৃত হউক, এই পরিবর্ত্তনের পক্ষে সকলে হাত তুলিলেন। তবে বস্তুতঃ ইহা ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে বিচার হইল কি না, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। ঈশ্বরের স্বরূপ বিচারিত না হইলে, কেমন করিয়া স্থির হইতে পারে, "সর্ব্বশক্তিমান্" শব্দের পরিবর্ত্তে "বিচিত্র শক্তিমান্" শব্দ ব্যবহার করা উচিত। অতএব কানাই বাবু য বলিতেছেন, সভ্যেরা উপাসনা পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, (ঈশ্বরের স্বরূপ বিচার করিতে চাহেন না), এই কথা পরস্পর বিরোধী।"

আত্মীয় সভা কেন সংস্থাপিত হয়, ইহা স্মরণ করিয়া বিচার করিতে বসিলে, কোনই গোল হইবে না। উপাসনা-প্রণালী পরিবর্ত্তনের নিমিত্তই আত্মীয় সভার জন্ম হয়। ঐ প্রণালীর শোধন করিতে, কয়েকটি শব্দ পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক হয়। তদনুসারে "সর্ব্বব্যাপী" স্থলে 'সর্ব্বত্র বিদ্যমান,' ইত্যাদিরূপ শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়। ইহাকে কি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা বলে? "ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না?" ইত্যাদি বিষয় কি আত্মীয় সভার কেহও কি বলিতেন? ঈশ্বর 'সর্ব্বশক্তিমান' নহেন, কিন্তু 'বিচিত্র শক্তিমান্', সর্ব্ব-'ব্যাপী' নহেন, 'সর্ব্বত্রবিদ্যমান'—সভ্যদের মধ্যে কে

বলিয়াছিলেন কি? ঈশ্বরকে 'সর্ব্বব্যাপী' না বলিয়া "সর্ব্বত্র বিদ্যমান" বলিলে অর্থ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়, এই কারণেই ঐ প্রস্তাব হয়। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর শেষ যুক্তি এই, "যদি ঈশ্বরের স্বরূপের কথা উঠাইয়া দিবার কথা না হইত, তবে ব্রহ্মপ্রাণ সভাপতি কিসের জন্য এত ব্যথিত হইয়া সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভোট সংগ্রহ করিতেন?" আমরাও জিজ্ঞাসা করি, যদি "ঈশ্বরের স্বরূপ" উড়াইয়া দিবারই প্রস্তাব হইত, তবে সভাপতি মহাশয় কেন সেই সভায় উপস্থিত হইতেন? বসু মহোদয়, আরও একটি কথা বলেন, তাহা এই,—"কানাই বাবু বলেন যে, উপাসনার প্রকরণের কোন্ কোন্ স্থান পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার বিচার হইত, ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয় বিচার হইত না। কিন্তু আমি বলি, দুইই এক।" তিনি দুইটিকে "এক" বলুন, অন্যে তো বলিবেন না।

১২।—"তিনি অহর্নিশ ব্রহ্মচিন্তা করিয়া আপ্তকাম হইলেন। কেবল মহেন্দ্র বাবুর বিচারে ও কানাই বাবুর সাক্ষাতে তিনি একটি বেঠিক্ কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। মহর্ষি ছিলেন আত্মীয় সভার সভাপতি, আর কানাই বাবু ছিলেন এক জন মেম্বর। আত্মীয় সভার সভাপতি প্রধান আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত না থাকিলে এবং সভার প্রত্যেক কথায় ও কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ না দিলে, সে সভার কার্য্যই হইতে পারিত না। কিন্তু কানাই বাবুর অবর্ত্তমানে ও অমনোযোগে তাহার কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিত। এ অবস্থায় সে সভার কথা প্রধান আচার্য্য মহাশয় যাহা বলিবেন, তাহা অমান্য করিয়া কানাই বাবুর কথা গ্রাহ্য করিয়া প্রতিবাদ করিতে যাওয়া নিতান্ত অসূয়া-পরতন্ত্র মনো কার্য্য ব্যতীত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আর কি করিতে পারেন?"

বসু মহোদয়, উপরি উদ্ধৃতাংশে যেরূপে বক্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু বক্রতা লক্ষিত হইতেছে। "কেবল মহেন্দ্রবাবুর বিচারে ও কানাই বাবুর সাক্ষাতে তিনি একটি বেঠিক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।" এক জন যুবক এইরূপ লিখন-প্রণালী অবলম্বন করিলে, তত দূষ্য হয় না। "প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের" কথা "অমান্য করিয়া" "কানাই বাবুর কথা গ্রাহ্য" করার তাৎপর্য্য এই যে, কানাই বাবু আত্মীয় সভা স্থাপনের এক জন উদ্যোগী ছিলেন। তিনি ও অপরাপর কোন কোন সভ্য বিলক্ষণ জানিতেন, ঈশ্বর-স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ সভা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন কানাই বাবুর লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে আত্মীয় সভার বিবরণ কেমন যুক্তিসঙ্গত প্রথাক্রমে লিখিত রহিয়াছে! মানুষ, যে দিকে যুক্তি প্রমাণ দেখে, তাহাই বিশ্বাস করে, ব্যক্তিবিশেষকে অভ্রান্ত বলিয়া সমাদর করে না। বসুজ মহানুভবকেই জিজ্ঞাসা করি, অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়, দেবেন্দ্রনাথ বাবুকে বেদাদির ভ্রম প্রদর্শন করেন, এই বিষয় ঠাকুর মহোদয় কোন স্থলেই এ পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করেন নাই কেন? তিনি স্বয়ং নিজের যে জীবনী লিখিতেছেন, তাহাতেও ঐ স্থলে অক্ষয়কুমারের নাম-গন্ধও নাই, এ বিষয়টি আমি আপনাদের আত্মীয় পক্ষের নিকটেই শুনিয়াছি। যে "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পুস্তকে আত্মীয় সভার অস্পষ্ট অসঙ্গত বিব-

রণ লেখা আছে, এবং যে পুস্তকের ঘটনার সহিত কানাই বাবুর বিবৃত বৃত্তান্ত অনৈক্য হওয়ায়, বসুজ মহাত্মা ঠাকুরের বর্ণনাকেই গ্রহণ করিতে বলিতেছেন,কৈ সেই পুস্তকেও তো দেবেন্দ্র বাবু স্বয়ং কোন কথাই লেখেন নাই। কিন্তু আপনি স্বুরভি. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও নব্যভাবতে তদ্বিষয় স্বীকাব কবিয়াছেন। এ স্থলে বেদের প্রত্যাদেশ ত্যাগ-সম্বন্ধে আপনাদেব উভযেব মধ্যে কাহার কথা পাঠকগণকে গ্রহণ কবিতে অনুবোধ কবিবেন?

১৩।—"আমবা স্বীকাব কবি যে, বিদ্যানিধিব অনুসন্ধান শক্তি. উদ্ধাব শক্তি এবং তাঁহার লেখনী চালনা শক্তি অতিশয বলবতী, কিন্তু তাঁহাব দোষ এই যে, তাঁহাব প্রণীত অক্ষযকুমাব দত্তেব জীবনচবিত গ্রন্থ প্রচাব হওযাব কাল হইতে তাঁহাব অনেক বন্ধু তদন্তর্গত কতকগুলি ভ্রান্তিব প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কবিলেও, বিদ্যানিধি তাহা সংশোধন কবা দূরে থাকুক ববং প্রাণপণ চেষ্টায তাহাব সমর্থন কবিযা ও তদতিবিক্ত প্রবন্ধ সকল লিখিয়া অক্ষয বাবুকে ব্রাহ্ম সমাজের **প্রতিষ্ঠাতা** প্রতিপন্ন কবিবারই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাব চেষ্টা বিফল হইবে। অক্ষয় বাবু সকল কথাতেই সকলেব সঙ্গে তর্ক করিযা হারাইযা দিতেন। প্রধানাচার্য্য মহাশয়েব সঙ্গে ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক করিতেন। তাহা দেখাইয়া বিদ্যানিধি উহা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন।"

মৎপ্রণীত অক্ষয় বাবুর জীবন-বৃত্তান্ত পুস্তকের কোন ঘটনার ভ্রম, আমার কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয় ব্যক্তি, অদ্যাপি প্রদর্শন করেন নাই। সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয়েরই সহিত দত্ত মহাশয়ের বেদ-বেদান্তের ভ্রান্ত মত এবং পুষ্পচন্দনৈবেদ্যাদি দ্বারা নিরাকাব ব্রহ্মের পূজা প্রবর্ত্তনেব উদ্যোগ এই ত্রিবিধ মতের নিবাকবণ বিষযেই আদি ব্রাহ্ম সমাজস্থ লোকেবা আমাব লেখার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাহাবা নানা সময়ে নব নব মত প্রচারিত কবিযাছেন। তাঁহাবা সকলে "বন্ধু"-ভাবে আমার প্রকৃত ভ্রমেব দিকে "অঙ্গুলি নির্দ্দেশ" করিতে পাবেন নাই। বন্ধু ভাবে হইলে, তাহার ব্যবস্থা স্বতন্ত্ররূপ হইত। আমি কি ইতিহাসে এতই অনভিজ্ঞ যে, "অক্ষয বাবুকে ব্রাহ্মসমাজেব **প্রতিষ্ঠাতা**" প্রতিপন্ন করিব? মহামনা রাজা রামমোহন রায ভিন্ন দেবেন্দ্র বাবু, অক্ষয বাবু, বা কেশব বাবু কেহই ব্রাহ্ম সমাজেব প্রতিষ্ঠাতা নহেন। যদি আমি অক্ষযকুমাব বাবুকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা কহিযা থাকি, তবে আমার "চেষ্টা বিফল" হইযাছে। বসুজ কেন বলিলেন, "এইবার আমাব চেষ্টা বিফল হইবে?" এখনও হয় নাই কি কাবণে? বসু মহাশয, দযা-পরবশ হইযা, নব্যভাবতের সম্পাদকের নিকট আমার পুস্তক হইতে 'অক্ষয বাবু ব্রাহ্মসমাজেব প্রতিষ্ঠাতা' এই বিষয়ের প্রমাণ প্রেরণ কবিলে, যার পর নাই উপকৃত হইব। অক্ষয় বাবু, দেবেন্দ্র বাবুব সঙ্গে যে যে বিষয়ের তর্ক কবিতেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল কার্য্য, ব্রাহ্মসমাজেব ও ব্রাহ্মধর্ম্মের হিতার্থে নিষ্পন্ন করেন,তাহাও মদ্বিরচিত দত্ত মহাশযের জীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে। বসু মহাশয যে কহিতেছেন, কেবল তর্ক করিয়া "প্রধানাচার্য্য মহাশয়কে হারাইয়া দিতেন" বলিযা, আমি অক্ষয় বাবুর গৌরব করি, তাহা নয়। বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা-

প্রবর্ত্তন, ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মত, ধর্ম্মের বিজ্ঞানসিদ্ধ ভিত্তি ইত্যাদি কার্য্য তাঁহা দ্বারাই সম্পাদিত হয়, ইহা আমি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছি। অদ্যাবধি কেহই তাহার অপলাপ করিতে পারেন নাই। দত্তজের ঐ সকল ক্রিয়া ব্যতিরেকে সমাজে যদি দেবেন্দ্র বাবুর কীর্ত্তিকলাপ না থাকে, বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে। আমি নিজেই যাহা জানি, তাহাই দেবেন্দ্র বাবুর যথেষ্ট কীর্ত্তি।

১৪। "সত্যদর্শী আত্মবিৎ ধীর দেবেন্দ্র নাথের উপর তর্কের দ্বারা জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপরে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে চেষ্টা পাওয়া যাহা, গভীর সমুদ্র বক্ষে ভিত্তি স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রয়াস পাওয়াও তাহা।"

বেদ-বেদান্তাদির ভ্রম অপসারণ কার্য্য ব্যতীত কি মান্যাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ বাবু মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজে কোন কীর্ত্তি নাই? আমি যদি কখন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস-লেখকের কার্য্যে ব্রতী হই, দেবেন্দ্রনাথ বাবুর ব্রাহ্মসমাজে কি কি কীর্ত্তি, তাহা কীর্ত্তন করিব। দত্তজ মহাশয়ের জীবন-চরিতে তাহা বর্ণন করিবার আমার অবসর নাই। বসুজ মহাশয় নিশ্চিন্ত থাকুন। কি কারণে বিচলিত হইতেছেন? রাজনারায়ণ বাবুই এবং ঠাকুর মহানুভবকে নিম্ন আদর্শে গ্রহণ করিতেছেন। বসু মহাশয়ের চিন্তার বিষয় নাই। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি। আমা দ্বারা দেবেন্দ্র-নাথরূপ মহারথীর কিছুমাত্রও অপকার হইবে না। যেমন যৎসামান্য ঝটিকায় সাবধান মহাদ্রুমের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ আমা কর্ত্তৃক ঠাকুর মহাশয়ের কোনই হানি হইবে না। আমার ঐরূপ লিখিবার কারণ এই যে, রাজনারায়ণ বাবু, অক্ষয় বাবুর ঐ একমাত্র বাদানুবাদ-উপলক্ষে ঠাকুর মহাশয়ের বিষয়ে স্থানে স্থানে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন।

১৫।—"আমি অক্ষয়কুমার দত্তের একটি বক্তৃতা চুরি করিয়াছি, বিদ্যানিধি মহাশয় আমার নামে এই উৎকট অপবাদ আনিয়াছেন এবং তাহা প্রমাণের জন্য একটি সাক্ষীও সংগ্রহ করিয়াছেন।"

বসু মহাশয়ের এই কথায় "আমি অবাক্ হইয়াছি।" আমি কুত্রাপি তাঁহাকে চোর বলি নাই। তিনি প্রথম প্রস্তাবে বলেন,—

"বিদ্যানিধি, অক্ষয় বাবুকে ঈশ্বরভক্ত প্রমাণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বে যখন তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী ছিলেন না, তখনকার ভূরি ভূরি বাক্য তাঁহার প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন এমন কি, আমার যে বক্তৃতায় প্রথমে "কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন" এই বাক্য আছে, সেই বক্তৃতা অক্ষয় বাবুর রচিত বলিয়া বিদ্যানিধি, তাহাকে পরম ভক্ত প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা অতি কৌতুকজনক ব্যাপার। এই বক্তৃতা যে আমার রচিত, তাহা সকল লোকেই জানে। তাহা আমার বক্তৃতার প্রত্যেক সংস্করণে আছে।"—(নব্যভারত, ১২৯৪, চৈত্র, ৬৫৬ পৃষ্ঠা।)

বসু মহাশয়ের উক্ত উক্তি আমি খণ্ডন করি নাই, তাঁহার উল্লিখিত বর্ণনার মধ্যে অক্ষয় বাবু ভক্ত ছিলেন কি না, ইহাই দত্তজ মহাশয়ের ১৭৭৭ শকের 'ঈশ্বর-প্রীতি' বিষয়ক বক্তৃতা হইতে প্রদর্শন করিয়াছি।

বসুজ মহোদয় যে বক্তৃতা অক্ষয় বাবুর নহে বলিয়াছেন, তাহা অক্ষয় বাবুর বক্তৃতা বলিয়া কেন উদ্ধৃত করা হইয়াছিল, তদ্বিষযে এইরূপ লিখিত হয়,—

"ঐ বক্তৃতা (১২৯৪ সালের মাঘ মাসের নব্যভারতের ৫১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ হ তে ৫১৫ পৃষ্ঠার প্রথমার্দ্ধ ভাগে উদ্ধৃত "কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন" · "আমি পরিত্রাত ও কৃতার্থ হইলাম" পর্য্যন্ত) যে অক্ষয় বাবুর, এটি আমি রাজনারায়ণ বাবুর কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি। এক্ষণে তাঁহার নামোল্লেখ করিতে ইচ্ছুক নহি। যদি প্রয়োজন হয়, পশ্চাৎ তাহা নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইব। এবিষযে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক হইল। তাহা এই—আমার একটি ছাত্রকে আমি ঐ বক্তৃতা ("কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন" * এবং 'ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি' (১৭৭৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত অক্ষয় বাবুর বক্তৃতা) প্রতিলিপি করিয়া, কোন পুস্তকে (এই পুস্তক খানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই) ও নব্যভারতের প্রবন্ধে (১৭৭৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ব-বোধিনীতে মুদ্রিত অক্ষয়বাবুর "ঈশ্বর প্রীতি" বক্তৃতাটি যাহা ১২৯৪ সালের মাঘ মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত 'স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্মবিষয়ক মতামত" প্রস্তাব হয়, তাহাতে) সন্নিবেশ করিতে বলি। ছাত্রটি নব্যভারতের প্রস্তাবে "ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি" (১৭৭৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের বক্তৃতা) না বসাইয়া, ঐ বক্তৃতাটি ("কোন কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন ··আমি পরিত্রাত ও কৃতার্থ হইলাম") নিবদ্ধ করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'উহাও ("কোন কোন ব্যক্তি" ইত্যাদি) তো অক্ষয় বাবুর লেখা' (ছাত্রটি পূর্ব্বে ঐ বিষয় আমারই নিকট শোনে) ঐটি এখানে সন্নিবেশিত হওয়ায় কি ক্ষতি হইবে ?' এই ঘটনা। এ বিষযে বসু মহাশয়কে বক্তব্য, নব্যভারতে আমার প্রস্তাব হইতে (১২৯৪ সালের মাঘ মাসের লেখা হইতে উহা ("কোন কোন ব্যক্তি" ইত্যাদি) উঠাইয়া দিলেও, প্রমাণের কোন বিঘ্ন হইবে না। "এ সম্বন্ধে আরও জানা আবশ্যক" বলিয়া উহার অবতারণা করা হইয়াছিল এবং উহার (ঐ বক্তৃতার) শেষে লেখা আছে, "আমার লিপির উপর নির্ভর করিয়া, যাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহাদের তৃপ্তি-বিধানার্থ ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জারের প্রামাণিক উক্তি উদ্ধৃত হইল।" এই বলিয়া পরে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব উহা দ্বারা আমার বর্ণনার কোন হানি হইবে না।" [নব্যভারত, ১২৯৫ আষাঢ় ১৩০—১৩১ পৃষ্ঠ।]

উপরি লিখিত বৃত্তান্তে কি বসুজ মহাশয়কে "চোর" বা "বোম্বেটে" বলা গিয়াছিল ? উল্লিখিত উদ্ধৃত ভাগে বন্ধনীর মধ্যে যে সকল শব্দ দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমস্ত রাজনারায়ণ বাবু ও পাঠকগণের সুখবোধের কারণ এবারে লিখিয়া দিয়াছি।

গত আষাঢ় মাসের নব্যভারতে বলিয়াছিলাম, আদি ব্রাহ্মসমাজ আমাকে পাঁচ বার আক্রমণ করিয়াছেন। তৎপরেই দেখি, ঐ মাসের পত্রিকাতে "রাজবল্লভের জীবনচরিত" ও সমালোচনা প্রস্তাবের লেখক

* বসু মহাশয় ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসের নব্যভারতে প্রথম প্রস্তাব লিখিবার পূর্ব্বে ঐ বক্তৃতা অক্ষয় বাবুর রচিত, এই ভ্রান্ত সংস্কার তাঁহারই কোন বন্ধুর দ্বারা আমার মনে দৃঢ় ছিল। তৎপরে সে সংস্কার দুর হয়।

মহাশয়ও অপ্রাসঙ্গিকরূপে আমায় কেবল গালি দিয়াছেন। আর ভাদ্র মাসে বসু মহাশয় পুনরায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। অদ্য পর্য্যন্ত ৭ সাত বার আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে আক্রান্ত হইলাম। বসু মহাশয় বলেন, গত বারে "আমি এমনই কি তাঁহাকে (আমাকে) বলিয়াছিলাম!" যাহা বাকী ছিল, এবারে হইল! যথা,—

(১) "জীবনবৃত্তলেখকদের দৌরাত্ম্য'। "দৌরাত্ম্য" অর্থ দুরাত্মার কার্য্য। অতএব তৎপরিবর্ত্তে "উপদ্রব" "অত্যাচার" "উৎপীড়ন" ইত্যাদি শব্দ কি বসুজ ব্যবহার করিতে পারিতেন না? ভাবিয়াছিলাম, দ্বিতীয় বারে ঐ শব্দ প্রয়োগ করিবেন না।

(২) "যুদ্ধের অশ্ব যেরূপ যুদ্ধ পাইলে উল্লসিত হয়, তেমনি তর্ক পাইলে তিনি (আমি) উল্লসিত হন।"

উপমা একটু উচ্চ করিয়া ধরিলে বসুজের কি অগৌরব হইত?

(৩) "ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার নিজের মত কি, তাহা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। যে দিকে অক্ষয়বাবু যান, তিনি সেই দিকে তাঁহার অনুগমন করেন। ধর্ম্মবিষয়ে "তাঁহার নিজের কোন মত আছে কি না, সন্দেহ।"

এটা জীবনচরিত-লেখকদের বড়ই "দৌরাত্ম্য!" তাঁহারা নায়কের জীবনীতে নিজেদের জীবনবৃত্তান্ত কেন লেখেন না! ইহা অপেক্ষা আর কি দোষের বিষয় হইতে পারে?

(৪) "ধর্ম্মবিষয়ে বিদ্যানিধির অল্পই দেখা শুনা আছে বোধ হয়, নতুবা তিনি অবশ্যই জানিতেন, নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া।"

"নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া" জানা আছে। আমি ধর্ম্মপ্রচারক নহি, আমার ধর্ম্মমত জানিবার প্রয়োজন কি?

(৫) "বিদ্যানিধি, তর্ককে জগতের মধ্যে এক সার পদার্থ বলিয়া জানেন। বোধ হয় ৺অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবল তর্কশক্তিই তাঁহার সকল গুণাপেক্ষা তাঁহার মনোমোহন করিয়াছে।"

অনুমান ঠিক হয় নাই। আমার মত বয়সে এক্ষণকার প্রধান লোকদিগকেও তর্কের সাহায্যে তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছিল। তর্ক করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই মানুষ এত উন্নত। তবে কোন বস্তুরই আতিশয্য ভাল নয়।

(৬) "যিনি ধার্ম্মিক-চূড়ামণি প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে যার পর নাই অভদ্ররূপে গালি দিতে পারেন, (কল্পনা'পত্রিকা) দেখ, যিনি একজন ভদ্র লোককে অনায়াসে চোর অপবাদ দিতে পারেন, তাঁহার সহিত তার কি প্রকারে তর্ক চলিতে পারে, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। তাঁহার সঙ্গে তর্ক চলিতে পারে না। আমি আমার প্রস্তাবের এক স্থানে আভাস দিয়াছি, তিনি ভদ্রলোকের সহিত তর্ক করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে একেবারে বিরত হইলাম।"

বসু মহাশয় প্রথম প্রস্তাবে কহেন, আমি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী বলিয়াছি, "ইহা অল্প ধৃষ্টতার কার্য্য নহে। যিনি এরূপ আচরণ করিতে সক্ষম, তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে কিরূপে তর্ক চলিতে পারে?" এই মাত্র লিখিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি আমার

অনুরাগের বিষয় আষাঢ় মাসে দেখাইয়াছি, সুতরাং বসু মহাশয় সে কথা ছাড়িয়া ধরিলেন কি না, আমি "এক জন ভদ্রলোককে (তাঁহাকে) অনায়াসে চোর" বলিয়াছি। আমি বসুজকে যে কদাচ কোন স্থলেই "চোর"বা"বোম্বেটে"বলি নাই, পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শন করা গিয়াছে। দুইটি আপত্তি খণ্ডিত হইল। আর এক আপত্তি "কল্পনা" পত্রিকায় প্রধানাচার্য্য মহাশয়কে আমি অভদ্র রূপে গালি দিয়াছি। "কল্পনা" পত্রিকায় 'অক্ষয়চরিত' পুস্তকের সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বসু মহাশয় তাহার সহিত তর্ক করুন না কেন? "প্রথম 'প্রস্তাবে' বসু মহাশয় "কোথায় আভাস" দিয়াছিলেন, আমি ভদ্রলোকের সহিত তর্ক করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।" যদি তাই হইল, তবে কেন দ্বিতীয় বার তর্ক করিয়া আপনাকেই আপনি গালি দিলেন—নিম্ন করিলেন? বসু মহাশয়, আপনাকে ভদ্রলোক বলিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক জানি—তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

বসু মহাশয়ের শেষাংশে লেখেন,—

'আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, এই প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পর আমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটনা ও কটুকাটব্য বর্ষণের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু আমি তাহা সকলই সহ্য করিব। এই মনে করিয়া সহ্য করিব যে, তামসী নিশা হইতে অন্ধকার পৃথক করা যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি বিদ্যানিধির ন্যায় লোক হইতে এইরূপ কার্য্য পৃথক করা দুঃসাধ্য।"

"দুঃসাধ্য" কিন্তু অসাধ্য নহে। অতএব হতাশ্বাস হইবেন না, উপদেশাদি দ্বারা দেখুন, কি হয়।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সীতারাম রায়। (৪র্থ)

বাঙ্গালীর জীবন-বৃত্ত অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহার গুরুর জীবন বৃত্তের অনুসন্ধান কর। গুরু মন্ত্রদাতা এবং অনেক সময় সাংসারিক কার্য্যেও তাহার মন্ত্রণা গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য আমরা সীতারামের দীক্ষাগুরু রত্নেশ্বর কবি সার্ব্বভৌমের উত্তর পুরুষ জগচ্চন্দ্র ও বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের গৃহে যে সকল পুরাতন কাগজ পত্র আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়াছি। গৃহদাহ বশতঃ অনেক কাগজই বিনষ্ট হইয়াছে, তথাচ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেক সহায়তা করিবে। কিন্তু ইহা বুঝিতে হইলে, সীতারামের গুরুগোষ্ঠীর একটী বংশাবলী আবশ্যক। নিম্নে তাহা দেওয়া গেল।

রামভদ্র ন্যায়লঙ্কার

- রত্নেশ্বর কবি সার্ব্বভৌম
  - রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
    - মুকুন্দরাম ন্যায়পঞ্চানন
      - (১) মহাদেব ন্যায়বাগীশ (তারা-স্ত্রী)
      - (২) দুর্গারাম
        - নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
          - মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
            - জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (৬৭ বৎসর বর্ত্তমান)
              - অঘোর নাথ ভট্টাচার্য্য
      - (৩) গঙ্গাধর
      - (৪) কালিদাস
      - (৫) বিষ্ণুরাম
  - দেবেন্দ্র ন্যায়রত্ন (উত্তরপুরুষ আছে)
  - শ্রীরাম বাচস্পতি
    - (১) জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন
      - রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
        - সদাশিব ভট্টাচার্য্য
          - বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য (বর্ত্তমান)
    - (২) পুরুষোত্তম ন্যায়লঙ্কার
- রমাপতি সিদ্ধান্ত* (উত্তর পুরুষ আছে)

এক্ষণে যে স্থানে মধুমতীতীরে সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাবুখালির নীলকর সাহেব টমাস ব্রি (Thomas Brae) বাস করিতেছেন, ঐ অট্টালিকার কেবল পূর্ব্বদিকে নন্দনপুর নামে একটী গ্রাম ছিল। এক্ষণে উহা মধুমতীর গর্ভে। নন্দনপুরে রামভদ্র ন্যায়লঙ্কারের আদি বাসাস্থান। তিনিই প্রথমে রাঢ় হইতে বঙ্গে আসেন। ইনি সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণের দীক্ষাগুরু। নন্দনপুরের পার্শ্ববর্ত্তী কলসে গ্রামে তাঁহার টোল ছিল। এ সময়ের টোল বুঝিতে ৫।৭ জন ছাত্রের বিদ্যালয় বুঝিতে হইবে না। টোল বর্ত্তমান সময়ের কালেজের ন্যায়, উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়। এই টোল পাকাবাড়ীতে সংস্থিত ছিল; সেই বাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আছে। উহাতে শতাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিত।

রামভদ্র ন্যায়লঙ্কার নন্দনপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গারামপুরে বাড়ী করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার উত্তর পুরুষ এই গ্রামে আছে, এবং নড়াল বাবুদিগের গুরুগোষ্ঠিও তাঁহারই উত্তর পুরুষ। রামভদ্রের গঙ্গারামপুরে আগমন উপলক্ষে একটী

* রমাপতি সিদ্ধান্তের প্রপৌত্র চন্দ্রচূড় নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। কল্পনা বশত হউক বা যে প্রকারেই হউক, বঙ্কিম বাবুর সীতারাম উপন্যাসে চন্দ্রচূড়ের নাম দেখা যায়। চন্দ্রচূড় সীতারামের পিতৃগুরু পুত্র মাত্র কিন্তু নিজের গুরু নহেন। সীতারামের গুরু রত্নেশ্বর কবি সার্ব্বভৌম। রত্নেশ্বরের প্রপৌত্র মহাদেবের নামে অনেকগুলি দানপত্রে সীতারামকে দাতা দেখা যায়। কিন্তু রমাপতির বংশে এরূপ দান নাই।

কিম্বদন্তী আছে। তিনি একদা নৌকা-যোগে কোথায় যাইতেছিলেন। নবগঙ্গা তীরে গঙ্গারামপুর গ্রামে প্রাতঃকৃত্য করিতে বসিলেন। একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহার গাত্র চাটিতে আরম্ভ করিল। রোসেন সেখ নামে এক ফকির তথায় ছিল। সে দেখিল, ব্রাহ্মণ এমন তেজস্বী যে ব্যাঘ্র তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে সাহস করে নাই। সে ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিল "ঠাকুর! আপনি আমার এই গ্রামে বাস করুন, আমি অন্যত্র চলিলাম। আপনি কেবল এই করিবেন, এই গ্রামে পূর্ব্বগামী ফকিরগণের যে কবরস্থান আছে, তাহাতে সন্ধ্যার সময় আমার অনুরোধে একটা প্রদীপ দিবেন।" বলা বাহুল্য, রামভদ্র তাহা স্বীকার করিলেন। অদ্যাপি রামভদ্রের উত্তর পুরুষেরা সেই প্রদীপ দেওয়া প্রথাটী পরিত্যাগ করে নাই। শুনা যায় এই কবরস্থান খনন করাতে এক সময় কতকগুলি নরাস্থি উঠিয়াছিল।

রামভদ্র ন্যায়লঙ্কার যে একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উপরোক্ত প্রবাদ তাঁহার তেজস্বীতার* প্রমাণ মাত্র। পঞ্চসনা বন্দোবস্তের কাগজের কতকগুলি আংশিক সহি মোহরের নকল আমি দেখিয়াছি। উহাকে তায়দাদ† বলে। ১২০৯ সালের তায়দাদ বলিয়া উহা খ্যাত। ১৯৩৩ নং এবং ১৯০৬ নং তায়দাদ দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায়, রামভদ্র ন্যায়লঙ্কার "রাজা সংগ্রাম সাহা" "রাজা ছত্রজিৎদিগর" এবং "উদয়নারায়ণ রায়ের" নিকট হইতে ক্রমান্বয়ে ভাটুদহে ৩৭।। বিঘা, গঙ্গারামপুরে ১৯২/ বিঘা এবং গঙ্গারামপুর শিমুলিয়া ও ভাটদহে ১৩/ বিঘা জমী ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন। সংগ্রাম সাহা তাহাকে ১০৩১ সালের ১৯শে আকুরণ (১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত জমী দান করেন। ১৯৩৩ নং তায়দাদে আর একটী দানের উল্লেখ আছে, তাহার দাতাও রাজা সংগ্রাম সাহা এবং গ্রহীতা রামতনু ন্যায়লঙ্কার। রামতনু রামভদ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃতনয়। এই দান ১০৪৮ সালের পৌষমাসে (১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহারদ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে স্থিরীকৃত হইল যে ১৬২৬—১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত নলদী পরগণার অনেকাংশ সংগ্রামসাহার হস্তগত ছিল। রাজা ছত্রজিৎ দিগরের সনন্দের তারিখ ১০৫৩ সাল ২৫শে মহরম (১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) এ দানও নলদী পরগণার মধ্যে। সুতরাং এ সময় আর সংগ্রামসাহা নাই। ইহাতে আমাদের পূর্ব্বের অনুমান কিছু ভ্রমাত্মক বোধ হইতেছে। আমরা শ্রীকান্ত বেদাচার্য্যের যে বংশাবলী দিয়াছি, তাহাতে দেবীপ্রসাদের ঊর্দ্ধে একটী পুরুষের উল্লেখ নাই। সেই স্থানে পাঠকেরা একটী পুরুষ আছে মনে করিলে আর কোন গোল হইবে না। ১৯০৬নং তায়দাদে দৃষ্ট হয়, উদয় নারায়ণ রামভদ্রকে নবগঙ্গার উভয় তীরে ভাটদহ এবং গঙ্গারামপুর ও শিমুলিয়া গ্রামে জমী দান করিয়াছেন।*

---

* Quinquennia Register of 1209 B S.

† তায়দাদ পররর্ত্তী কালের বিবরণ পত্রের নকলমাত্র। সে সময় তাহাকে 'রায়' বলা অসম্ভব নহে। পাঠক পরে দেখিবেন উদয় নারায়ণকে 'দাস' বলিয়া এক কবি সীতারামকে পদ্য রচনার উপহার দিয়াছিলেন।

* ভাটদহ নবগঙ্গা পূর্ব্বদিকে, গঙ্গারামপুর ও শিমুলিয়া পশ্চিমে।

এই দানের তারিখ পাওয়া যায় না। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে মূল সনন্দ নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, তায়দাদে তারিখ নাই। কিন্তু ইহার তারিখ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী। এ সময় রাজা ছত্রজিৎদিগর (দিগের) ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে।*

এই সকল কারণে আমরা বিবেচনা করি, উদয় নারায়ণ সাতৈর ও নলদী পরগণায় আংশিক অধিকারী হইয়াছিলেন। এমন সময়ে সীতারাম কর্ত্তৃত্বে প্রবৃত্ত হন।

সীতারামের কার্য্যপ্রণালী তাঁহার পিতার কার্য্যপ্রণালী হইতে বিভিন্ন ছিল। সীতারাম প্রজার অতিশয় হিতৈষী ছিলেন। তিনি অনবরত ২২,০০০ বেলদার উপস্থিত রাখিতেন। ইহারা খননকারী এবং প্রত্যহ পুষ্করিণীর খননকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। পলাশবাড়িয়া বসুবংশের আদি পুরুষ যেন বেলছলা নিবাসী জনৈক কার্য্যদক্ষ লোকের অধীনে এই খননকারী সৈন্যদল সমর্পিত হইয়াছিল। সীতারাম যখন বাহির হইতেন, উক্ত ২২০০০ হাজার সৈন্য তাঁহার সঙ্গে চলিত। যেখানে উপস্থিত হইতেন সেই স্থানে পুষ্করিণী খননের আদেশ দিতেন। জনশ্রুতি এই, প্রত্যহ নূতন পুকুরে তাঁহার স্নান করা হইত। বর্ষাকালে কি প্রকারে পুষ্করিণী কাটা হইত, বুঝিতে পারি না। কিন্তু তথাচ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার খনিত পুষ্করিণীর সংখ্যা এত অধিক যে, আর কোন বাঙ্গালার রাজা কি নবাব এক জীবনে এত পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাই না। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার এই পুষ্করিণী খনন ইচ্ছা কেবল ধন পাওয়ার ইচ্ছা মাত্র। তিনি যেখানে ধন থাকিত, তাহা জানিতে পারিতেন এবং উঠাইতে গিয়া পুকুর খনন করিতেন। যেরূপ অশান্তির সময় তাঁহাকে জীবিত থাকিতে হইয়াছিল, তখন যে ধন গৃহ অপেক্ষায় বাহিরে রাখিতে হইত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুত্রাপি ধন পাইয়া পুনর্ব্বার পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হওয়াও অসম্ভব নহে। তবে কি, যাহা আমরা কিম্বদন্তীর মুখে শুনিতে পাই, তাহা অতিরঞ্জিত। আবার কেহ কেহ বলেন, সীতারাম এক জন অদৃষ্টজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কারণ কি? অদৃষ্টজ্ঞ উত্তর করিলেন, মহারাজ! আপনি পূর্ব্ব জন্মে পুরো অর্থাৎ তরমুজ ব্যবসায়ী ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আপনার নিকট যান। আপনি তাঁহাকে একটী তরমুজের জল পান করান। এই ফলে আপনার এত ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। সীতারাম দেখিলেন, অল্প জল দানেই এত ফল হইয়াছে। সেই জন্য কল্পনা করিলেন, প্রত্যহই পুষ্করিণী খনন পূর্ব্বক জল দান করিতে হইবে। ইহা যে যাচক

---

* রাজা ছত্রজিৎ দিগরকে ছয় চৌধুরী বলিত। ইহারা ছয় ভ্রাতা। সংগ্রাম সাহের নিধনের কারণ সম্ভবতঃ ছত্রজিৎ। উদয়নারায়ণ ইহাদের মধ্যে পত্তনীদার বলিয়া অনুমান করা যায় এবং রাজ ছত্রজিতের সঙ্গেই সংগ্রামের নিধন মানসে আসিতে পারেন। ছত্রজিৎ আমাদের বিষয়ের বহির্ভূত। ছত্রজিতের পতনের পরেই উদয়নারায়ণের বৃদ্ধি। ছত্রজিৎ হইতেই ছত্রজিৎপুর গ্রাম হইয়াছে। রাজা ছত্রজিৎ ক্ষত্রিয়। ইহার উভয় পুরুষ সিংহ উপাধি ধারণপূর্ব্বক কায়স্থ হইয়া অদ্যাপি ছত্রজিৎপুরে বাস করিতেছেন।

ব্রাহ্মণগণের কল্পনাপ্রসূত, সে বিষয়ে বোধ হয় পাঠককে বলিতে হইবে না।

যে কারণ বশতঃই হউক, এই খননকারী সম্প্রদায়ই তাঁহার রাজ্যবিস্তারের মূল। ইহারা যে কেবল খননের কার্য্য করিত, এমত নহে। ইহাদের দ্বারায় সৈন্যের কার্য্যও নির্ব্বাহ হইত। খুলনা জেলায় খানজিহান আলীর যে সকল কীর্ত্তি চিহ্ন আছে, তাহা বর্ণন করিতে গিয়া ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলিয়াছেন যে, খানজিহান আলীর ৬০,০০০ বেলদার ছিল। তিনি ইহাদিগকে পারিশ্রমিক সৈন্য (army of laborers) বলেন। আমাদের বিশ্বাসও তাহাই আমরা রাজা মুকুটরায়ের প্রস্তাবে দেখাইব, তিনিও এই পারিশ্রমিক সৈন্যের সহায়তায় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ফল তিনিই এইরূপ পারিশ্রমিক সৈন্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। সীতারামের সময় সমাজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত; তখন এ অঞ্চল সমধিক বসতিপূর্ণ হইয়াছে। পারিশ্রমিক সৈন্যের চরম উন্নতি তিনিই দেখাইয়াছেন।

সীতারামের ২২০০০ বেলদারেরা যে স্থানে প্রবেশ করিত, সে স্থান অবিলম্বে দখলীকৃত হইত। দখল করিয়া অবিলম্বে সেই স্থানে পুকুর খনন ও রাস্তা প্রস্তত করণ বিষয়ে সীতারাম মনোযোগ করিতেন। প্রজা সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সীতারামকে কর দিতে সম্মত হইত। এই প্রকার প্রজামুখী নীতি দ্বারায় সীতারাম অধিকার বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ অধিকার বিস্তার গবর্ণমেণ্টের চক্ষে তত দূষণীয় ছিল না। যে প্রকার হউক, আয়ত্ত স্থানের কর দেওয়া স্বীকার করিলে গোল চুকিয়া যাইত। এমন কি, এই সময়ের প্রায় শত বৎসর পরেও ভূম্যধিকারীগণের সত্ব তত দৃঢ় বলিয়া স্বীকার করা হইত না। ১৭৭৪ সনে সুলতান পুরের জমীদারী রেবিনিউ কমিটীর অনুমোদন অনুসারে অক্লেশে কাশীনাথ দত্তের হস্তগত হইল। তিনি কর দিতে স্বীকৃত আছেন দেখিয়া তাহাকে জমীদারী অর্পিত হইল। কাশীনাথের ঘটনার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, দশশালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিত্ব হস্তান্তরিত হওয়া অতি সহজ ব্যাপার ছিল।* সীতারামের সময় ইহা আরও কত সহজ ছিল, পাঠকেরা স্বয়ং অনুভব করিবেন।

এই পারিশ্রমিক সৈন্যই সীতারামের একমাত্র সম্বল ছিল, এমন বোধ হয় না। তবে ভারতচন্দ্র যে প্রকার প্রতাপাদিত্যের গজ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ আমরা কোন সূত্র পাই নাই। সীতারামের অশ্বা-

---

* "Kasi nath Dutta was the Zaminder of it (Sultanpur) and he obtained it in a manner which is sufficient of itself to shew how little the idea of proprietorship in the soil, which was at the foundation of the permanent settlement, originally entered in the conception of a Zaminder's right. In 1774 the Committee of revenue reported to the president and council that the then Zamindets of Sultanpur were in arrear and would not pay. They recommended they should be turned out of possession and stated that one Kasi nath Dutta, was ready to pay up arrear and to engage for the payment of future revenue accruing on the estate if it was transferred to him. The Governor General approved the proposal." *Mr. Westland's Report, Page 65.*

দোহী ও গঙ্গারোহী সৈন্যের সংখ্যা অনিশ্চিতই থাকিবে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, তাঁহার সৈন্য সংখ্যার মধ্যে পাঠান ও রাজপুত সৈন্যের মিশ্রণ ছিল। মহাম্মদপুর নগরীর উত্তর পূর্ব্ব দিকে একটী পরিখার তটে ঘুঘুঁইর নামে একটী গ্রাম কেবল পাঠান সৈন্যে পরিপূর্ণ ছিল। তন্নিকটবর্ত্তী "কাটগড় পাড়ায়" বহুসংখ্যক রাজপুত সৈন্য বাস করিত। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মেলা হাতি ও তাঁহার সহযোগী হামলা বা পাঠান বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে পাঠান ও রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ কিছু পরে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ তাঁহাকে বেলদার সৈন্য অবলম্বনে কাজ করিতে হইয়াছিল।

জলাশয় সৃজনে যেমন কৃষির উন্নতি হইতে লাগিল, তেমন অর্থ সঞ্চয়ের সহায়তা করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার অর্থাগমের প্রধান উপায় ১২ জন দস্যুকে নিহত করিয়া তাহাদের ধনাপহরণ। এই দ্বাদশ ডাকাইতের নাম আমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হই নাই। কেহ কেহ বলেন, বধো ও শ্যামা রামা ডাকাইতি এই ১২ জনের অন্তর্গত। দ্বিতীয় প্রস্তাবে সীতারামের আগমন সম্বন্ধে যে ৪টী কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে ১২ জন জমীদারের কর অনাদায়ের কথা আছে। তাহারাই কি ১২ জন ডাকাইত? সে যাহা হউক, সীতারাম ১২ জন দস্যুকে নিহত করিয়াছিলেন।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

কর্ত্তা ব্যতিরেকে জগতের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবে?

জগৎ-সৃষ্টিনামে কতিপয় প্রবন্ধ বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া কোন ব্যক্তি কতকগুলি প্রশ্ন আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, এই সমস্তের উত্তর প্রাপ্ত হইলে তিনি আরও প্রশ্ন করিবেন। বাস্তবিক জগৎ-সৃষ্টি লইয়া আমাদের মধ্যে বিশেষ তর্ক বিতর্ক হইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আমি যে সকল প্রশ্ন পাইয়াছি, তাহা উত্তর সহ নব্যভারতে প্রকাশ করিলাম। পরন্তু প্রশ্ন কর্ত্তার নাম এখন প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যদি তিনি অনুমতি দেন,তবে আগামীতে প্রকাশ করিব।

এতদ্দ্বারা আমি পাঠকবর্গকেও অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারাও যেন এইতর্কে যোগদান করেন। উঁহাদের নাম প্রকাশ করা না করা তাহা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। যদি উঁহারা নাম প্রকাশ করিতে অনুমতি করেন, তাহা প্রকাশিত হইবে, অন্যথা প্রকাশিত হইবে না। আমি পাঠকবর্গকে সানুনয়ে এই জানাইতেছি যে, তাঁহারা কোন নূতন প্রশ্নও করিতে পারেন, অথবা আমার উত্তর সমস্তের ত্রুটী পাইলে তাহাও প্রদর্শন করিতে পারেন। বাস্তবিক জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে পাঠকগণ যাহা-কিছু বলিবেন, যদি পত্রিকা-সম্পাদকের আপত্তি না থাকে, তবে আমি তৎসমুদয়ই প্রকাশ করিব। কেবল তাহার সঙ্গে সম্ভবতঃ আমার মন্তব্য থাকিবে। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমি তাহা প্রাপ্ত হইব।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

জলপাইগুড়ি।

১ম প্রশ্ন। প্রত্যক্ষ বস্তু ধরিয়া উপমা সাহায্যে যদি অনুমান করিতে হয়, তবে পরমাণুর অনুমান কিসে হয় ? যদি পরমাণুর হয়, তবে নিরবয়ব ঈশ্বরের অনুমান হয় না কেন ?

উত্তর। মহর্ষি গোতম ও কণাদ যে অনবস্থা (ক্রিয়ার অবিশ্রান্তি) দোষ ঘটে বলিয়া পরমাণুর অনুমান করিয়াছেন, তাহা, আধুনিক বিজ্ঞান মতে স্বীকৃত হইতে পারেনা। কোন ক্রিয়া অনন্ত কাল চলিবে বলিয়াই যদি তাহা অনবস্থা দোষে অগ্রাহ্য করা যায়, তবে জগতের নিত্য কার্য্য গুলিকেও অচিরস্থায়ী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যথা, সৌর জগতের গতি। অনবস্থা দোষ দ্বারা বিচার করিলে সৌর জগতের গতি অনন্তকাল চলিতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানে প্রতিপাদন করিয়াছে যে, কোনও গতিরই বিনাশ নাই। সুতরাং সৌর জগতের যে গতি দৃষ্ট হয়, তাহা এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে রহিত হইতে পারে না। তবে এই মাত্র হইতে পারে যে, যদি অন্য জড় পিণ্ড কর্ত্তৃক উহার প্রতিরোধ হয়, তাহা হইলে এই গতি প্রতিরোধক পিণ্ডে প্রবেশ করিবে, কিন্তু বিনষ্ট হইবে না। সুতরাং অনবস্থা বাস্তবিক কাল্পনিক দোষ মাত্র।

যদি কাল্পনিক যুক্তিই প্রমাণ রূপে গণ্য হয়, তবে এমত যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে যাহাতে অনবস্থার বিপরীত সিদ্ধান্তে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়। অনবস্থা মতে পদার্থ বিভাগের একটা না একটা সীমা আছেই আছে। কিন্তু মনে কর কোন বস্তু বিভক্ত হইতে অতীব সূক্ষ্ম হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলেও যখন সেই সূক্ষ্ম অংশের দুই পৃষ্ঠ আছে, তখন সেই দুই পৃষ্ঠ পৃথক হইতে পারিবে। আবার সেই বিভক্ত প্রত্যেক অংশেরও দুই দুই পৃষ্ঠ আছে। তাহা হইলে সেই প্রত্যেক অংশও বিভক্ত হইতে পারিবে। এই রূপে বস্তু বিভাগের কোনও সীমাই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। সুতরাং পরমাণুও নাই, স্থির করিতে হয়। অতএব অনবস্থা এবং দুই পৃষ্ঠ বিভাগের যুক্তি অবলম্বন করিলে দুই বিপরীত সিদ্ধান্তে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়। সুতরাং ইহার কোন সিদ্ধান্ত যে সত্য, তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। বাস্তবিক কেবল কল্পনা মূল যুক্তি দ্বারা কোনও প্রাকৃতিক তত্ত্বই নির্ব্যূঢ় রূপে প্রতিপন্ন হয় না।

এখন বিজ্ঞান মতে পরমাণুর অনুমান কিরূপে হয়, তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। অতএব অম্লজান ও জলজান দৃশ্য বস্তু না হইলেও প্রত্যক্ষ বস্তু। এখন এই দুই প্রত্যক্ষ বস্তু ধরিয়া উহাদের পরমাণুর অনুমান করিতে পারা যায় কি না, দেখা হউক। অম্লজান জলজানের সহিত সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট আয়তন পরিমাণে রাসায়নিক রূপে মিশ্রিত হয়। সেই নির্দ্দিষ্ট আয়তন পরিমাণের কদাপিও ব্যত্যয় হইতে দেখা যায় না। যথা, এক আয়তন অম্লজান, দুই আয়তন জলজানের সহিত মিশ্রিত হইয়া জল হয়। কিন্তু যদি ১॥ আয়তন অম্লজান ২ আয়তন জলজানের সহিত, কি এক আয়তন অম্লজান আড়াই আয়তন জলজানের সহিত মিশ্রিত করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে সেই অতিরিক্ত অর্দ্ধ আয়তন অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। অম্লজান ও জলজানের আর এক প্রকার মিশ্রণ আছে। তাহাতে অম্লজানের মাত্রা বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তাহা ভগ্নাংশ মাত্রায়

বৃদ্ধি পায় না, সমস্ত মাত্রায়ই বৃদ্ধি পায়। যথা, দুই আয়তন অম্লজান দুই আয়তন জলজানের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহাতে এই অনুমান হয় যে, এই দুই বায়ু যখন পরস্পর মিশ্রিত হইতে যায়, তখন অম্লজানও কতিপয় সমান সমান অংশে এবং জলজান ও কতিপয় সমান সমান অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। আর ঐ সকল সমান অংশের আয়তন আর ক্ষুদ্রতর হয় না। অতএব এই ঘটনা হইতেই পরমাণুর অনুমান হইতে পারে। আবার মনে কর, এক পাত্র অম্লজানে এবং তাহার দ্বিগুণ আয়তনের অন্য এক পাত্র জলজানে পূর্ণ করিলাম। ঐ দুই পাত্রের সর্ব্বাংশই সমান প্রকার বায়ুতে পূর্ণ। যদি উহারা সমজ পদার্থ বিশিষ্ট হয়, তবে সর্ব্বত্রই পদার্থ থাকাতে কোথাও ফাঁক থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি উহারা কণাজ পদার্থ বিশিষ্ট হয়, তবে কণা সকলের মধ্যে ফাঁক থাকিবে, এখন জলজান পূর্ণ পাত্রটীকে উপুড় করিয়া অম্লজান পূর্ণ পাত্রের উপরে রাখা যাউক। কিছুকাল পরে দৃষ্ট হইবে যে, জলজান বায়ু লঘুতর হইলেও অধোগামী হইয়া অম্লজানের পাত্রে এবং অম্লজান গুরুতর হইলেও জলজানের পাত্রে প্রবেশ করিয়াছে এবং ঐ দুই বায়ু সর্ব্বত্র সমভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে এই অনুমান হয় যে, অম্লজান ও জলজানের মধ্যে স্থানে স্থানে ফাঁক ছিল। তাহাতেই একের পদার্থ অন্যতরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। সেই সকল ফাঁক পরিবেষ্টিত পদার্থ পরিমাণ সমস্তকে অণু, পরমাণু বা কণিকা বলা যাইতে পারে। এখন মনে কর, অম্লজানের এক কণা জলজানের এক কি দুই কণার সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। যদি তখন মিশ্রিত বায়ুতে অগ্নি প্রবেশ করান যায়, তবে ঐ তিন আয়তন বায়ু জলীয় বাষ্প হইয়া দুই আয়তন হইবে। অতএব জলীয় বাষ্পের আয়তন লাঘব হওয়াতে এই অনুমান হইতেছে যে, অম্লজান ও জলজানের উক্ত মিশ্রণ মধ্যেও স্থানে স্থানে ফাক ছিল। আবার উৎপন্ন জলীয় বাষ্পেও যে ফাক না আছে, এমত নহে। কারণ চাপ দিলে তাহার আয়তনও ক্রমে লাঘব হইয়া অবশেষে জল হইবে। এবং সেই জলের আয়তনও চাপদ্বারা কম করা যাইতে পারে। সুতরাং এই দৃষ্ট হইতেছে যে, কি জল, কি জলীয় বাষ্প, কি অম্লজান, কি জলজান, উহারা সকলেই কণাজ পদার্থ বিশিষ্ট। অতএব জলাদির কণা অতীন্দ্রিয় হইলেও অনুমান-সিদ্ধ। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান মতে যে পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে, তাহা কল্পনার কথা নহে, প্রাকৃতিক তত্ত্বেরই কথা।

এখন এই প্রণালীক্রমে নিরবয়ব ঈশ্বরের অনুমান হইতে পারে কি না, তাহার আলোচনা করা যাউক। যখন প্রশ্নকর্ত্তা প্রত্যক্ষ বস্তু ধরিয়া অতীন্দ্রিয় পরমাণুর অনুমানের সহিত অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের সাদৃশ্য করিয়াছেন, তখন নিরবয়ব শব্দ যে অর্থে পরমাণুর প্রতি বর্ত্তে, সেই অর্থে ঈশ্বরের প্রতিও বর্ত্তে বলিয়া গণ্য করা অসঙ্গত হইতে পারে না। দর্শনশাস্ত্র মতে নিরবয়ব শব্দের অর্থ অবয়ব (অর্থাৎ অংশ) হীন। অতএব নিরবয়ব ঈশ্বরের অর্থ অংশহীন ব্যষ্টি ঈশ্বর। পরন্তু যখন অতীন্দ্রিয় নিরবয়ব ব্যষ্টি পরমাণুর অনুমান করিতে হইলে

তাহার সমষ্টি প্রত্যক্ষ বস্তুর আলোচনা আবশ্যক, সেইরূপ নিরবয়ব ব্যষ্টি ঈশ্বরের অনুমান জন্যও প্রত্যক্ষ সমষ্টি ঈশ্বরের আলোচনা প্রয়োজনীয়। অতএব প্রশ্ন-কর্ত্তা যদি প্রত্যক্ষ সমষ্টি ঈশ্বরকে উপস্থিত করিতে পারেন, তবে আমরা তাহা হইতে নিরবয়ব ব্যষ্টি ঈশ্বরের অনুমান হইতে পারে কি না, ইহা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি।

২ প্রশ্ন। যদি অতীন্দ্রিয় পরমাণু সংযোগে জগৎ সৃষ্টি হয়, তবে জগৎও অতীন্দ্রিয় হয় না কেন ?

উঃ। পরমাণু বাস্তবিক প্রকৃতিতে অতীন্দ্রিয় নহে। তবে তাহার ক্রিয়া শক্তি এবং আমাদের ইন্দ্রিয় যন্ত্র দুর্ব্বল হওয়াতেই তাহা ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না। দ্রব্য সকল ইন্দ্রিয় যন্ত্রে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া করে। যদি সেই সকল ক্রিয়া সমুচিত প্রবল হয়, তবেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অন্যথা হইতে পারে না। পরন্তু দ্রব্য সকলের ক্রিয়া শক্তি পদার্থ পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তদনুসারে একই প্রকৃতির দুই বস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রতর অপেক্ষা বৃহত্তরেই অধিক বলে ক্রিয়া করিবে এবং মনুষ্যাদি জীবগণও আপন আপন ইন্দ্রিয়ের শক্তি অনুসারে তাহা ন্যূনাধিক অনুভব করিবে। এই হেতু গোলাপ পুষ্প দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তাহার সৌরভ দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার মনুষ্য যে অন্ধকারে দেখিতে পায়না, বাদুড় আদি রাত্রিচর তাহাতে বিলক্ষণ দেখিতে পারে। এবং যে কীটাণু স্বাভাবিক চক্ষে দৃষ্ট হয় না, তাহা অনুবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা মনুষ্যের নিকটে অতীন্দ্রিয়, তাহা ইতর জন্তুর নিকটে অতীন্দ্রিয় নহে, এবং যাহা স্বাভাবিক চক্ষের পক্ষে অতীন্দ্রিয়, তাহা অনুবীক্ষণের পক্ষে অতীন্দ্রিয় নহে। অতএব অতীন্দ্রিয় শব্দটী প্রকৃতি জ্ঞাপক নহে কিন্তু আপেক্ষিক মাত্র।

৩ প্র। পরমাণুর আকর্ষণাদি শক্তির অনুমানের মত চৈতন্যোৎপাদিকা শক্তির অনুমান কিসে হয় ? যদি চৈতন্যোৎপাদিকা শক্তি থাকে, তবে জগৎ অচেতন কেন ? যদি বলেন, পরমাণু সংযোগের ইতর বিশেষ আছে, তাহার অনুপাত কি ? মৃত্যু হইলে চৈতন্য শক্তি থাকে না কেন ? কারণ পরমাণু ত পূর্ব্ববৎই আছে।

উঃ। পরমাণুর আকর্ষণ এবং চৈতন্যোৎপাদিকা শক্তির মধ্যে তুলনা হইতে পারে না। আকর্ষণ নিত্য পদার্থ। কিন্তু চৈতন্য নিত্য বস্তু নহে। যে আকর্ষণ প্রভাবে দেবাদি পৃথিবীর উপবিভাগে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা কি দিন, কি রাত্রি, কি গ্রীষ্ম, কি শীত, সকল সময়েই সমভাবে ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু চৈতন্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে না। কিছু কাল বিদ্যমান থাকিলেই রহিত হইয়া নিদ্রা আবশ্যক হয়। আবার মর্ম্মট প্রভৃতি শীতাসহ জন্তু সকলকে সমস্ত শীত কালে অচেতন অবস্থায় কর্ত্তন করিতে দেখা যায়। সুতরাং বিরামহীন আকর্ষণের সহিত বিরতিশীল চৈতন্যের তুলনাই হইতে পারে না। তবে বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনির সহিত চৈতন্যের তুলনা হইতে পারে। ধ্বনির ন্যায় চৈতন্যও এই আছে, এই নাই, আবার উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। পরন্তু ধ্বনির সহিত চৈতন্যের সম্যক্ সাদৃশ্য স্বীকার করিবার পূর্ব্বে এই প্রতিপাদন করিতে

হইবে যে, ধ্বনির উৎপত্তি জন্য যেরূপ বাদ্য যন্ত্র এবং বাদক আবশ্যক, চৈতন্যের উৎপত্তি জন্যও সেইরূপ শারীর যন্ত্র এবং তাহার যন্ত্রী প্রয়োজনীয়। কিন্তু মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু মণ্ডলীই যে চৈতন্যের যন্ত্র, তাহা শারীর বিধান বিদ্যা দ্বারা একরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তাহাতে আর কাহারও আপত্তি বা দ্বিধা নাই। অতএব এস্থলে কেবল যন্ত্রীর বিষয়েই কিছু বলা যাইতেছে। আমরা এমন কিছুই কল্পনা করিতে পারি না, যাহা কোনও দিন একত্রে কি পৃথক রূপে জড় জগতে প্রত্যক্ষ করি নাই। সুতরাং আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান আছে, সেই সমুদয়ই উপার্জ্জিত। আর উপার্জ্জিত জ্ঞান ইন্দ্রিয় যোগেই উৎপন্ন হয়। পরন্তু শারীর বিধান বিদ্যা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় যন্ত্রে কোনও কার্য্য হইলে তথায় একটী বল উৎপন্ন হয়। সেই বল মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে পরিচালিত হইয়া উক্ত কার্য্যের প্রকৃতি প্রকাশ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয় যন্ত্রের কার্য্য যখন আলোক, তাপ আদি জড় বস্তুর আঘাত বা সঞ্চার দ্বারাই হয়, তখন যে বল মস্তিষ্কে নীত হয় তাহাও জড় পদার্থের সঞ্চার বিশেষ। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, মস্তিষ্ক আলোক আদির ক্রিয়া প্রভাবে নিয়তই প্রকম্পিত আছে। সেই প্রকম্পন হইতেই বাস্তবিক চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। মনে কর, কোন ব্যক্তির নিদ্রাবেশ হইয়াছে। শব্দাদি দ্বারা তাহাকে জাগ্রত করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে অন্য যন্ত্রী থাকিলেও যখন তাহাতে নিদ্রা নিবারণ করিতে পারে না, তখন শব্দাদি যে মস্তিষ্কের এক যন্ত্রী, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। পরন্তু শব্দাদি যন্ত্রী হইলেও তাহা মূল যন্ত্রী নহে। কারণ তৎসমুদায়ের অভাবেও চৈতন্য থাকিতে দেখা যায়। এখন শীতসহ জন্তু সকলের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মর্ম্মট প্রভৃতি জন্তু সকল শীতকাল নিদ্রিত অবস্থায় কর্ত্তন করে। তখন বিশেষ রূপে আঘাত পাইলেও সহসা জাগরিত হয় না। অতএব শীতকালে এমত বস্তুর অভাব বা লাঘব হয়, যাহাকেই মূল যন্ত্রী বলা যাইতে পারে। ইহা বাস্তবিক সূর্য্যালোকের দুর্ব্বলতা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বাস্তবিক সূর্য্যালোকই পৃথিবীর জীবন ও প্রাণ। সূর্য্য যদি এক দিবস উদিত না হয়, তবে লক্ষ লক্ষ জীব বিনষ্ট হইবে এবং যদি পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত উহার আগমন না হয়, তবে পৃথিবী এককালে জীব শূন্য হইবে। আলোক আদিই যে জীব সকলকে সচেতন রাখে, তাহার প্রমাণ স্বরূপে আমরা "জীবন, আত্মা ও মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান" নামক পুস্তক হইতে (১৯৪ পৃষ্ঠা) নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে এই প্রতিপন্ন হইবে যে, যদি মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডকে বাহ্য উত্তেজন হইতে পৃথক করা যায়, তবে আর চেতনা থাকিতে পারে না। "ডাঃ ষ্ট্রম্পেল ১৬ বৎসর বয়স্ক কোন রোগীর বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার ত্বকের স্পর্শজ্ঞান এত দূর বিনষ্ট হইয়াছিল যে, প্রবলতম উত্তেজন প্রভাবেও বেদনা অনুভূত হইত না। প্রায় সমস্ত প্রবেশ্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিরও বিচেতনা হইয়াছিল। মাংসপেশী সমস্তের চেতনাও এককালে নষ্ট হইয়াছিল। আস্বাদ ও ঘ্রাণ শক্তি এবং দক্ষিণ চক্ষুর দর্শন, বাম কর্ণের শ্রবণ শক্তি এককালে বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং বাম চক্ষু ও দক্ষিণ কর্ণ

বদ্ধ করিলে স্নায়ুমণ্ডলীকে সমস্ত বাহ্য উত্তেজন হইতে পৃথক করা যাইতে পারিত। বাস্তবিক ঐ রূপ করিলে রোগী পাঁচ মিনিট মধ্যে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িত।"

অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি এবং জীবগণের চৈতন্য মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং চৈতন্যকে ধ্বনির সদৃশ পদার্থ বলা অযৌক্তিক কথা নহে। পরন্তু ধ্বনি কোন নিত্য বস্তু নয়, কিন্তু ক্রিয়াবিশেষের ফল মাত্র। অতএব চৈতন্যও কোনও নিত্য পদার্থ নহে, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের বিশেষ ক্রিয়ার ফল মাত্র।

জগতে চৈতন্যোৎপাদিকা শক্তি নামে কোনও বস্তু নাই। তবে যে, প্রাণিদেহে কখন কখন চৈতন্য দৃষ্ট হয়, ইহা কেবল বিশেষ অবস্থাযুক্ত মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের বিশেষ প্রকার ক্রিয়া হইতেই প্রকাশিত হয়। এই হেতু জগৎ অচেতন বলিয়াই প্রসিদ্ধ। পরমাণু সংযোগের সামান্য ইতর বিশেষ হইতে সচেতন পদার্থের উৎপত্তি হয় না। পৃথিবীতে দুই প্রকার বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত এবং জীবিত। জীবিত পদার্থের ইংরেজী নাম প্রোটোপ্লাজম্। জীবন-ধাতু নামে প্রোটোপ্লাজম শব্দের অনুবাদ হইয়াছে। (জীবন, আত্মা ও মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান —৭৬ পৃষ্ঠা।) যে স্থলে জীবন ধাতু আছে, কেবল সেই স্থলেই জীবন দৃষ্ট হয়। যথা, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণি-দেহ। পরন্তু উদ্ভিজ্জ ও প্রাণি-দেহের অধিকাংশই মৃত এবং অত্যল্প অংশ মাত্র জীবিত। যথা, মাংস, অস্থি, রক্তের শোণ কণিকা ইত্যাদি মৃত বস্তু এবং রক্তের শ্বেত কণিকা, মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থ জীবিত দ্রব্য। পরন্তু অস্থি, মাংস প্রভৃতি ও সর্ব্বতোভাবে মৃত নহে। উহাদের মধ্যেও কিছু কিছু জীবিত পদার্থ আছে। আবার রক্তাদির মধ্যস্থ জীবিত পদার্থ প্রকৃত জীবন ধাতু হইলেও তাহা চৈতন্যের যন্ত্র নহে। তাহা সাধারণ জীবনের মূল মাত্র। এই হেতু উদ্ভিজ্জের জীবন আছে কিন্তু চৈতন্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের ধূসর পদার্থই চৈতন্যের যন্ত্র। অপিচ মস্তিষ্কের অভাব থাকিয়া কেবল মেরুদণ্ড থাকিলেও চৈতন্য জন্মিতে পারে। যথা, কৃমি, মহীলতা প্রভৃতি সংক্ষোভশান্ত জন্তুর মস্তিষ্ক নাই, কেবল মেরুদণ্ড সদৃশ জীবনধাতু আছে। সেই জীবন-ধাতু হইতেই উহাদের চৈতন্য জন্মে। জীবন-ধাতু জড় পদার্থের বিশেষ প্রকার মিশ্রণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেই মিশ্রণ বিশ্লিষ্ট হইলেই মৃত্যু ঘটে। তখন বিশ্লেষণোৎপন্ন পদার্থ সকল পড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু জীবন-ধাতুর অভাব হওয়াতে জীবনও থাকে না এবং চৈতন্যও জন্মিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

বিরহ-সঙ্গীত।

ললিত,—আড়া।

এই যে স্বপনে বালা কুসুম গাথিতে-ছিল!
অধরে জোছনা-হাসি অলসে কাঁপিতে-ছিল!
নদী, রাঙা পদ-মূলে,
যেতেছিল ঢুলে ঢুলে,
গুন্ গুন্ গেয়ে অলি অধর চুমিতে-ছিল!

কুহরিতেছিল পিক,
ফুলে ছেয়েছিল দিক;
শিথিল অঞ্চলে কেশে সমীর লুটিতে-ছিল!
উষা, লতা-ফাঁক বেয়ে,
মুখ-পানে ছিল চেয়ে!
কপোলে গোলাপ-রাঙা সরমে ফুটিতে-ছিল!

আঁখি দুটি ঢল ঢল,
চাহিতে নাহিক বল !
হরিণী নয়ান-পানে বিস্ময়ে চাহিতে-ছিল !
সে স্বপন কোথা গেল !
জাগরণ কেন এল ?
জগতের ছাড়াছাড়ি হৃদে যে ঘুচিতে-ছিল !

২

যোগিয়া,—একতালা।

একি—কেমন যাতন !
কিছুতে বোঝেনা মন, কেবল স্বপন !
চাহিলে নয়ন মেলে,
ছোটে প্রাণ ধরা ফেলে,
কোন্ আকাশের দেশে দেখিতে স্বজন !
দিন রাত কার তরে,
নাহি কাজ হাতে, ঘরে।
কেবল স্বপন-ভরে নিদ্রা, জাগরণ !

৩

ভৈরবী,—যৎ।

কোথারে বসন্ত তোর, ওরে সমীরণ।
কোথা সে মদির লীলা, মধুর কম্পন ?
কোথা সে কুসুম-হাস,
তরু-লতা-মৃদু-শ্বাস ?
এ বিরহ হা-হুতাশ, ডাকিছে মরণ,
ওরে, আমারি মতন !

৪

গৌড়-সারঙ্গ,—যৎ।

পথ-ভ্রান্ত, বড় শ্রান্ত, প্রেম-পথে প্রেম-ঘোরে!
কোথা যাই, কেহ নাই, ডাকিবে' যে স্নেহ করে!
হুহু হুহু বহে যায়,
ধুধু, বালু উড়ে যায় ;
তৃষায় ফাটিছে প্রাণ,—ছুটি মরীচিকা ধ'রে !
কোথারে নিকুঞ্জ-ছায়া,
কোথা নিশীথিনী-মায়া,
কোথা মৃদু-কল্লোলিনী, ডেকেনে তুলেনে মোরে।

৫

মুলতান,—আড়া।

কূলেতে জলের কোলে কাঁপিছে তরুর ছায়া !
হৃদয়ে প্রাণের কোলে যেন রে প্রেমের কায়া !
প্রাণ করে হাহাকার,
লভিতে পরশ তার !
যে দূরে সে দূরে প্রেম, হৃদয়ে সে শুধু মায়া !

৬

পূরবী,—আড়া।

নিতি নিতি আসে জলে, আজ কেন
এলোনা রে !
তাল-নারিকেল-ছায়া কাঁপিতেছে পাড়ে পাড়ে
ভাঙা সোপানের মূলে,
মরালী গ্রীবাটি তুলে !
আধেক ডুবেছে রবি, তবু চেয়ে বন-ধারে
জলেতে হিলোল নাই,
মাছেরা দিতেছে ঘাই,
গৃহ মুখে ফেরে গাভী, ডোবে ধরা অন্ধকারে !
কমলে ভ্রমর-গুলি,
এখনো র'য়েছে ভুলি !
ডাকিতেছে চকাচকি, বসে দুটি পর-পারে !
আজ কেন এলোনা রে !

৭

পিলু-বাঁরোয়া,—যৎ।

নীরবে আসিছে সন্ধ্যা, মলিন-মুখী।
নদীতে ওঠে না ঢেউ,
বন-পথে নাই কেউ,
জলে ফুল-মুখী লতা পড়েছে ঝুঁকি।
এলায়ে প'ড়েছে বায়,
শূন্য মাঠ স্তব্ধ-প্রায় !
দূরেতে কি কেঁদে যায়, হতাশ-দুখী !

৮

কাফি,—একতালা।

প্রেমে শুধু আঁখি-জল,
আর কি আছে গো বল!
চোখে চোখে, মুখে মুখে,
যখন র'তেম সুখে,
তখনো শিহরি বুকে
নয়নে আসিত জল!
সে এখন কাছে নাই,
তরু-তলে শূন্যে চাই,
আনমনে ভাবি, গাই,
কপোলে গড়ায় জল।
আর কি আছে গো বল।

৯

খাম্বাজ,—খেমটা।

রজনী যে ছিল অতি ঘোর,
কাছেতে ছিলনা কেহ মোর!
নয়নে ছিলনা ঘুম,
অধরে ছিলনা চুম,
হৃদয়ে ছিলনা বাত ভোর!
রজনী যে ছিল অতি ঘোর!
একেলা করিতে নিশি ভোর,
তুলে নিয়েছিনু কথা তোর!
এ-কথা সে-কথা পরে
আঁখি দুটি ক'রে জোড়—
ক'বে গেল স্বপনে বিভোর!
এ-খেলা সে-খেলা ক'রে
বাহু দুটি বুকে প'ড়ে,
জড় হয়া গেল প্রেম ডোর!
রজনী যে ছিল অতি ঘোর।

১০

বাহার,—ঝাঁপতাল।

ভালবাসা, মোহ আশা ছদ্ম-বেশে কাল!
সে নিশা অনন্ত নিশা, নাহিরে সকাল!
ইন্দ্র-ধনু দেখে দূরে,
সে স্বর্গ-সৌন্দর্য্য-পুরে
যে জন যাইতে ছোটে, ছোটে চিরকাল!
মরু ভ্রমে মরু-মায়া,
দূরে নদী, তরু-ছায়া!
ক'রে তপ্ত ধূধূ বালু, মধ্যাহ্ন করাল!
পারা'র রে কুহেলিকা,
শ্যাম-উপকূল-লিখা।
সে যে ঘূর্ণী, বাড়বাগ্নি, সে পথে পাতাল!
শ্মশান আলেয়া আলো,
বাতায়নে রশ্মি জাল!
সে স্মৃগ পিশাচ হাসি, উৎসব ভয়াল!
ছদ্ম-বেশে কাল!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ইংরাজ শাসনে বঙ্গসাহিত্য। (৭ম

মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য যাঁহারা উপন্যাস-বিভাগে পরিশ্রম করিয়াছেন, এস্থলে তাঁহাদের কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয় বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইহার নাম "আলালের ঘরের দুলাল।" শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়ন করেন।" কিন্তু এই উপন্যাস-বিভাগে যিনি সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার বিষয় স্থানান্তরে উল্লিখিত হইবে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এ পর্য্যন্ত "বঙ্গ-বিজেতা," "মাধবীকঙ্কন" "জীবনপ্রভাত" "জীবনসন্ধ্যা" ও "সংসার" এই পাঁচখানি উপন্যাস, ইউরোপে "তিন বৎসর" নামক একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত, একখানি বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। "ইউরোপে তিন বৎসর" তাঁহার "Three years in Furope" নামক ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী লেখক ইউরোপে ভ্রমণ বৃত্তান্ত এরূপ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার উপন্যাসাবলীর রচনা সুললিত, সুখ-পাঠ্য ও উদ্ভাবপূর্ণ। স্ত্রী, পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোক অবাধে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। প্রথমোক্ত উপন্যাস চতুষ্টয়ে মোগল সম্রাটগণের ঐশ্বর্য্য, রাজপুতনার গৌরব ও তৎকালীন দেশের অবস্থা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার Literature of Bengal নামক পুস্তক ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইলেও বঙ্গ-সাহিত্যের সামান্য উপকার সাধন করে নাই। এইবার আমরা রমেশ বাবুর কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদের কথা উল্লেখ করিব। তিনি ভূমণ্ডলের এই প্রাচীনতম মহাগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া, দুঃখিনী মাতৃভাষাকে অনন্ত রত্নের অধিকারিণী করিয়া দিয়াছেন, এবং স্বদেশবাসীগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন! এই মহা গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা নিজের কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করিয়া সুবিখ্যাত বঙ্কিম বাবুর অভিপ্রায়ের কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপার। রমেশ বাবু যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, বিশুদ্ধি ও সর্ব্বাঙ্গীনতার সহিত এই কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, ইউরোপ হইলে, এত দিন বড় জয় জয়কার পড়িয়া যাইত।

* * * *

যিনি যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই কীর্ত্তিটী চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল ইংরেজী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায় অনুবাদের প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া ছিলেন। রমেশ বাবুর প্রতিও সেই রূপ অত্যাচার হওয়াই সম্ভবে। কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই বিবাদে ইউরোপ উাধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় সেই উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশ বাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী কখন ইহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না।"

শ্রীযুক্ত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গ ভাষার সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান "নবেল" লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই মনোহর গ্রন্থের নাম "স্বর্ণলতা"। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে Novel বলে, তাহা যে বাঙ্গালার উপন্যাস হইতে পৃথক বস্তু, ইহা আর কষ্ট করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে হইবে না। স্বর্ণলতায়" এই নভেলের গুণ ও লক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তারক বাবুর চরিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়। এরূপ স্বভাবসঙ্গত চরিত্রবর্ণনা বঙ্গ সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। এই পুস্তকে "প্রমদা" ও "সরলা" চরিত্রের পার্থক্য অতি সাবধানতার সহিত রক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গালী গৃহে "প্রমদা" চরিত্র স্ত্রীলোকের আধিক্য বলিয়া বোধ হয়। "সরলা"

প্রকৃতি রমণী বঙ্গ সমাজ হইতে যেন দিন দিন অন্তর্হিতা হইতেছেন। ইহা এক খানি উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। তারক বাবু 'হরিষে বিষাদ" প্রভৃতি আর কয়েক খানি সুপাঠ্য উপন্যাসের রচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এ পর্য্যন্ত "শরচ্চন্দ্র," "বিরাজমোহন," "সন্ন্যাসী," "যোগজীবন" "ভিখারী," ও "নবলীলা," এই কয়খানি উপন্যাস, এবং "সোপান," "বিবেকবাণী," ও "জ্যোতিকণা"—এই তিন খানি প্রবন্ধ পুস্তকের রচনা করিয়াছেন। দেবীপ্রসন্ন বাবু এক্ষণ "নব্যভারত" নামক এক খানি উচ্চদরের মাসিক পত্রের সম্পাদক। ইহা নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এই পত্র এক্ষণে ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে যতগুলি মাসিকপত্র সম্পাদিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এই "নব্যভারত" নিয়মিত রূপে, প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। রং তামাসাপূর্ণ প্রবন্ধসকল যে দেশের গ্রাহকগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়,—গভীর চিন্তাপূর্ণ সংবাদ ও সাময়িক পত্র গ্রাহকাভাবে যে দেশে জল বুদ্বুদের ন্যায় ভাসিয়া মিলাইয়া যায়,—সে দেশে নব্যভারতের ন্যায় সুরুচি ও সদ্ভাবপূর্ণ, নিরপেক্ষ, সাময়িক পত্র যে ছয় বৎসর কাল ক্রমোন্নতির সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে ইহা সম্পাদকের সামান্য গৌরবের কথা নহে। দেবী বাবুর উপন্যাস সমূহের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, রুচি অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার "সন্ন্যাসী বঙ্গভাষার একখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। ইহাতে যে সকল চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে সে গুলি যারপর নাই মনোহর হইয়াছে। এই অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস গুজরাটী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ সকলে সরলতা, সত্যানুরাগ, স্বদেশবাৎসল্য, হৃদয়ের ঔদার্য্য ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক এ গুলি বঙ্গভাষার মহামূল্য সম্পত্তি। দেবীপ্রসন্ন বাবু মাতৃভাষার এক জন ঐকান্তিক উপাসক, সখ মিটাইবার জন্য তিনি কখন লেখনী ধারণ করেন না। দুঃখিনী মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার নিমিত্ত তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নানা কারণে তাঁহার বিষয় আর আলোচনা করা আমার শোভা পায় না।

শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় এ পর্য্যন্ত "মৃণ্ময়ী," "বিমলা," "দুই ভগ্নী," "প্রতাপসিংহ," "কমলকুমারী," "শুক্লসুন্দরী"—এই কয় খানি উপন্যাস ও কয়েক খানি বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর 'প্রবাহ" নামক এক খানি সুপাঠ্য মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে ভাষার পরিপাট্য বর্ণনার মাধুর্য্য ও চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজী ভাষা হইতে বহু সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য দামোদর বাবুর যথেষ্ট আগ্রহ আছে।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব "হরিদাসের গুপ্তকথা" ও "বঙ্গগিরি" প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরাজী Mystery র অনুকরণে এই দুই খানি রহস্য পূর্ণ আখ্যায়িকা বিরচিত হইয়াছে সত্য বটে, তথাপি এ গুলিতে গ্রন্থকারের বর্ণনা শক্তি, ভাষা পারি-

পাট্য, উপাখ্যান-সংস্থাপন-কৌশল, চরিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য ও বিবিধ রসোদ্দীপনী ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত-'জীবন প্রদীপ' বঙ্গভাষার একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। দেবী বাবু ও বিষ্ণুবাবুর উপন্যাস রচনা সম্পূর্ণ একরূপ। ("জীবনপ্রদীপের") ভাষা তেজস্বিনী, বর্ণনা বিষয়ের সম্যক উপযোগিনী, রুচি মার্জিত, লক্ষ্য উচ্চ, স্বদেশ বাৎসল্য এবং চরিত্রাঙ্কন শক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। হরগোবিন্দ রায়ের চরিত্র আদ্যোপান্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। বর্তমান সময়ে এদেশে হরগোবিন্দ রায়ের ন্যায় চরিত্রের বিশেষ অভাব আছে। যিনি এরূপ মহাপুরুষের চরিত্র চিত্রিত করিতে পারেন, তিনি বঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। গ্রন্থের অন্য দোষ থাকিলেও, এই "হরগোবিন্দ" চিত্রের জন্য ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত "চন্দ্রনাথ" বঙ্গভাষার একখানি উপাদেয় উপন্যাস। ভাষার পারিপাট্য ও চরিত্রাঙ্কন শক্তি অতীব প্রশংসনীয়। কিন্তু গ্রন্থকারের রুচি সর্ব্বত্র মার্জ্জিত নহে। সমাজের দোষ সংশোধন করিবার বাসনা ক্ষেত্রপাল বাবুর বিলক্ষণ আছে। তিনি যে একজন সুলেখক, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষেত্রপাল বাবু "মুরলা" প্রভৃতি আর কয়েক খানি উপন্যাস ও "হীরকাঙ্গুরীয়ক" নামক এক খানি প্রহসনেরও রচনা করিয়াছেন। প্রহসনের উদ্দেশ্য মহৎ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মৃত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ বঙ্গভাষার কয়েক জন উৎকৃষ্ট উপন্যাস-রচয়িতা। ইঁহাদের দ্বারা স্বদেশীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে।

স্বর্গীয় কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী "অপূর্ব্ব কারাবাস," "অপূর্ব্ব সহবাস," "চিত্রশালা" প্রভৃতি উপন্যাসের রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার উপন্যাস সকলের ভাষা যেমন মনোহারিণী, বর্ণনাও সেইরূপ হৃদয়গ্রাহিণী। চরিত্র চিত্রিত করিবার ক্ষমতাও তাহার অসাধারণ ছিল। তিনি অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া না গেলে, তাঁহার দ্বারা মাতৃভাষার মুখ আরও উজ্জ্বল হইত।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন এ পর্য্যন্ত "টম্ কাকার কুটীর' 'মহারাজা নন্দকুমার" দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ", "অযোধ্যার বেগম" ঝান্সীর রাণী," 'লর্ড মেটকাপের জীবনচরিত" প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। "টমকাকার কুটীর" সুপ্রসিদ্ধ Uncle Tom's cabin) এর অনুবাদ। অবশিষ্ট পুস্তক গুলির রচনা করিতে চণ্ডী বাবুকে যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও বহু অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিটীশাধিকারের প্রারম্ভের বঙ্গদেশের অবস্থা অতি সুন্দর ভাবে এই সকল উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। দেশের কলঙ্ক মোচন করিবার ইচ্ছা গ্রন্থকারের বিলক্ষণ বলবতী। চণ্ডী বাবুর ভাষা উত্তম, উদ্দেশ্য মহৎ। সাধারণে ঐতিহাসিক জ্ঞান বিস্তার করা বোধ হয় চণ্ডী বাবুর অভিপ্রায়। কিন্তু তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা প্রশস্ত নহে। ঐতিহাসিক সত্য উপন্যাসের সহিত মিশ্রিত হইলে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ পক্ষে বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটে।

শ্রীহেমনাথ মিত্র।

জাতীয় সমিতি—উহার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য।*

(প্রথম প্রস্তাব।)

শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়, সুশিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ এবং সমবেত ভ্রাতৃবর্গ, জ্ঞানবিকাশিনী সভার যত্নে আজি এই প্রজা সভার অধিবেশন হইয়াছে—সভার একদিকে দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ বিস্তর সুশিক্ষিত, সুবিজ্ঞ ও স্বাধীনচেতা মনুষ্য এবং অপরদিকে কৃষক ও শ্রমজীবী এবং অন্যান্য ব্যবসাবলম্বী প্রজাবর্গের একত্র সম্মিলন দৃষ্টে আমার মন গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দেশের ধনী ও নির্ধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, কৃষক ও শ্রমজীবী এত অধিক সংখ্যক লোক আপন আপন পদ-মর্য্যাদা-গত পার্থক্য ভুলিয়া একস্থানে একত্র সম্মিলনে প্রিয় জন্মভূমির কল্যাণকর কার্য্য পর্য্যালোচনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই প্রাণ-মুগ্ধকর পবিত্র দৃশ্য অবলোকন করিলে কাহার হৃদয় স্বভাবতঃই আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ না হয়? এই আনন্দদায়ক সভায় ভারতীয় জাতীয় সমিতি (Indian National Congress)—উহার উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও কার্য্যাদির পরিচয় দান করিবার জন্য আমি জ্ঞান-বিকাশিনী সভার মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং কতিপয় সুযোগ্য সভ্য কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বলিতে দুঃখিত হইতেছি যে, বিষয়টি যেরূপ মহৎ এবং পবিত্র, তদনুরূপ ক্ষমতা ও বাক্পটুতা আমার নাই। এই সভাস্থলে অনেক সুশিক্ষিত ও দূরদর্শী লোক উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন এক জন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এই গুরুভার অর্পিত হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইতাম; কিন্তু যৎকালে আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতিই উক্ত ভারাপণ করিয়াছেন, তখন আমি আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নবান হইব। প্রায় চারি বৎসর হইল, জাতীয় সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, সভাস্থলে এমন অনেক চিন্তাশীল সুবিজ্ঞ লোক উপস্থিত আছেন, যাঁহারা এই চারি বৎসরের মধ্যে জাতীয় সমিতির প্রত্যেক বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার তৎসম্বন্ধীয় বক্তব্য বিষয়ের অনেক স্থলে হয়ত অনেক অভাব ও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য যেন কেহ আলোচ্য বিষয়ের পবিত্রতা ও গুরুত্ব বিষয়ে সন্দিহান না হন। পক্ষান্তরে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সমস্ত ত্রুটি মাপ করিলে আমি একান্ত বাধিত হইব। এই সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন কাল হইতে আমি উহার উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও কার্য্যাদি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছি। উক্ত অধিবেশনে জ্ঞানবিকাশিনী সভা দুই জন প্রতিনিধি প্রেরণ

* বিগত ২৫শে কার্তিক আড়বালিয়া জ্ঞান-বিকাশিনী সভার যত্নে এলাহাবাদ জাতীয় সমিতিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন জন্য একটি প্রজাসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

করিয়াছিলেন,তন্মধ্যে আমি একজন। দ্বিতীয় জাতীয় সমিতির কার্য্যে যোগ দান করিয়া উহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলাম, তদবধি একাল পর্য্যন্ত উক্ত সমিতি সম্বন্ধীয় প্রত্যেক অত্যাবশ্যক বিষয় বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলাম--- আশা করি, উহা আপনাদের অপ্রীতিকর হইবে না।

জাতীয় সমিতি ও উহার উৎপত্তিঃ—জাতীয় সমিতি কি, এবং উহার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, এই সভার শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্য অনেকেই তাহা অবগত নহেন, এজন্য আমি সর্ব্বাগ্রে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিব। 'জাতীয় সমিতি' ভারতবর্ষের কোটি কোটি প্রজাবর্গের সুশিক্ষিত, সুদক্ষ ও সম্মানিত প্রতিনিধিগণের সমিতি— ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতীয় কোটি কোটি নর নারীর হিতের জন্য এই সভার সৃষ্টি হইয়াছে, এই জন্যই উহা "ভারতীয় জাতীয় সমিতি" নামে অভিহিত।

আজি প্রায় চারি বৎসর হইল এই সমিতি পরিগঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার আবশ্যকতা ও উপযোগিতা দীর্ঘকাল হইতে শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট অনুভূত হইয়াছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারল লর্ড লিটন বাহাদুর বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শনে জগতের নিকট ভারতীয় রাজ শক্তি ও ইংলণ্ডের বল বিক্রমের পরিচয় দান এবং সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় হইতে প্রবল রাজ ভক্তি আকর্ষণের জন্য দিল্লীতে একটী মহাদরবারের অনুষ্ঠান করেন। ঐ দরবারে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান মহারাজা, রাজা, নবাব, জমিদার, সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারবর্গ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সম্পাদকগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এ দেশের অনেক সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে স্বভাবতই এই ভাব উদিত হইয়াছিল যে, উক্ত দরবার উপলক্ষে দেশ বিদেশের বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ লোক একত্র মিলিত হইবেন, সেই মহা সুযোগে তাহারা রাজা মহারাজাদিগের ন্যায় শুদ্ধ দরবারের বাহ্যশোভা ও আড়ম্বরে মোহিত না হইয়া পরস্পরের সুবিধা অনুসারে শিক্ষিত ও দূরদর্শী ব্যক্তিগণের সহিত একত্র সম্মিলনে স্বদেশ-হিতকর বিষয়ের আলোচনা করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সি ও প্রদেশবাসী প্রধান প্রধান লোকের এক পরামর্শে যাহা অত্যাবশ্যক ও পরম শুভকর বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার আন্দোলন ও অনুষ্ঠান হইলে তদ্দারা দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে। স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণের মনে যখন এই ভাব উদিত হইয়াছিল, তখন তাহারা জাতীয় সমিতির ন্যায় একটী ভারতীয় বিভিন্ন জাতীয় সভার আবশ্যকতা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অনেকের মতভেদ ও অনাস্থাবশতঃ তখন তাহারা উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের অভিপ্রায় কতক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। ঐ বৎসর সুপ্রসিদ্ধ জুবার্ট সাহেবের যত্নে কলিকাতায় যে অন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী

(International Exhibition) হইয়াছিল, তাহাতে যেমন দেশ বিদেশের বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছিল, তেমনই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রধান প্রধান স্থান হইতে সহস্র সহস্র শিক্ষিত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই মহা মেলা উপলক্ষ কলিকাতাস্থ ভারতসভা (Indian Association) বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী, এলাহাবাদ, বেনারস, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের অনেক সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ লোককে নিকটে পাইয়া তাঁহাদের পরামর্শ অবলম্বনে স্বদেশ-হিতকর বিষয় অবধারণ করিবার জন্য একটী জাতীয় মন্ত্রণা সভা (National Conference) আহ্বান করেন। কলিকাতাস্থ আলবার্টহলে উহার অধিবেশন হয়। ঐ শুভদিনে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় জাতীয় সমিতির প্রথম সূত্রপাত হয়। সেই সময় হইতে ভারতীয় জাতীয় হৃদয়ে জাতীয় সভার উপযোগীতা সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া ক্রমে উহা তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় সমস্ত ভারতময়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সভার অল্প দিন পরেই মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, মিরট, ও আজমীর প্রভৃতি স্থানে জাতীয় সভার (National Conference) এক একটী অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জাতীয় সমিতির (National Congress) আকার কল্পিত ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হয় নাই। বিগত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই নগরে এই মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন হয়—ক্রমান্বয়ে তিন দিন উহার কার্য্য নিয়মিত রূপে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বেনারস, আহমদাবাদ ও করাচী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় এক শত রাজনীতিজ্ঞ উচ্চপদস্থ লোক উহার কার্য্যে যোগ দান করিয়াছিলেন, আমাদের দেশীয় ব্যারিষ্টার-অগ্রগণ্য বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ শ্রদ্ধাস্পদ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। পার্শী সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা সুপ্রসিদ্ধ দাদাভাই নারোজী, কে, টি, টেলাং ও বৃটন-গৌরব মহাত্মা হিউম, প্রভৃতির আন্তরিক যত্নে প্রথম বৎসরের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল।

তৎপর বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় উক্ত সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সময় হইতেই উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতীয় সমিতি নামে পরিগণিত হইয়াছে। প্রথম জাতীয় সমিতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশানুরাগী রাজনীতিবিশারদ মহাশয়ের প্রাণপন যত্ন ও পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সমিতিতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রধান প্রধান স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রায় ৫০০ সুশিক্ষিত মান্য ও গণ্য লোক যোগ দান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান সভা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আজি যেমন আপনারা আগামী জাতীয় সমিতিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য এই বৃহৎ সভার আয়োজন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর সভায় সহস্র সহস্র শিক্ষিত লোক কর্ত্তৃক ঐ সকল প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত

হইয়াছিলেন। এই সমিতির উদ্বোধন দিবসে বঙ্গের সুপণ্ডিত খ্যাতনামা ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমাগত স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণকে জ্বলন্ত ভাষায় সাদরে প্রেমভরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ বৃটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের প্রধান প্রধান নেতাগণ উহাতে অন্তরের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। উহার অধিবেশনের তিন দিবস বোম্বাই নগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ দাদাভাই নাবোরজী সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল।

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজ নগরে এই মহাসমিতির তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। গত দুই বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর সমিতেতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধির সমাগম হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে কোটি কোটি প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রায় ৭০০ লোক নির্ব্বাচিত হইয়া ইহার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ সার্, টি, মাধব রাও উহার উদ্বোধন দিবসে শত শত প্রতিনিধি ও শত শত দর্শকগণকে প্রাণের ভাষায় সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; এবং বোম্বাই নগরীর মুসলমান সম্প্রদায়ের সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ নেতা খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার বদিরুদ্দিন তাএবজী অধিবেশনের তিন দিবস বিশেষ দক্ষতা সহকারে সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। এই বৎসরের কার্য্য গত দুই বৎসরের কার্য্য অপেক্ষা সমধিক সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজের অনেক সহৃদয় ইংরাজ ও ইংরাজ মহিলা ও কতিপয় প্রসিদ্ধ মহারাজা ও জমিদার তিন দিবস নিয়মিতরূপে সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া উহার প্রত্যেক কার্য্যে গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য।—

মহাশয়গণ, এক্ষণে আমি উক্ত মহাসমিতির উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রদান করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, অতি পবিত্র। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইতিপূর্ব্বে কত শত সভা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত কোন সভা এই জাতীয় মহাসমিতির ন্যায় এত গুলি সুমহৎ ও সুপবিত্র উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। উক্ত উদ্দেশ্য গুলি অতি সংক্ষেপে এইরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১ম উদ্দেশ্য—সুবিস্তৃত নানাবর্ণ-প্লাবিত ভারতভূমির বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ও বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ ও এক মহাজাতি রূপে পরিগঠিত করণ, এবং জাতীয় জীবনের উন্নতিবিধানে সমগ্র দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন।

২য় উদ্দেশ্য—এই নূতন পরিগঠিত মহাজাতির শারীরিক ও মানসিক এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানে জগতের সুসভ্য জাতীয় সমাজে ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করণ।

৩য় উদ্দেশ্য—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর সংস্কার সাধন, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের পক্ষে প্রকৃত হিতকর ব্যবস্থা প্রণয়নে ভারতীয় প্রজাবর্গের

অবস্থার উন্নতি সাধন, সাধারণ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তার এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতের চিরবন্ধুতা সংস্থাপনে ভারতবর্ষে বৃটিশ অধিকার সুদৃঢ় ও বৃটিশ গৌরব চিরস্থায়ী করণ।

এই উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের প্রকৃত শুভকর এবং ইংলণ্ডের মঙ্গলজনক বিবিধ বিষয় নিহিত রহিয়াছে। অপেক্ষা পবিত্রতর উদ্দেশ্য আর কি পারে, জানি না! একদিন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ প্রকৃত উন্নতি এবং প্রকৃত সুখ শান্তির মুখ দেখিয়াছিল—যে দিন ভারতবর্ষের জ্ঞান-গরিমা, বাহুবল, ধর্ম্ম-ভাব ও সম্পদশ্রী সভ্যজগতের দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছিল—কিন্তু, হায়, বলিতে চক্ষে জল আইসে, ভারতবাসীর নিজ দোষে—ভারতবাসীর আত্ম-বিচ্ছেদ-জনিত ভারতের অবনতি ও পতন নিবন্ধন শত শত বর্ষের কঠোর পরাধীনতায় ভারতের সেই পূর্ব্ব সুখের দিন অস্তমিত ও পূর্ব্বগৌরব শ্রী বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এখন নানাজাতি ও নানাসম্প্রদায়ের বাস—ভারতবাসীর প্রকৃত একতা ও জাতীয় জীবন দীর্ঘকাল হইতে বিলুপ্ত। ইংলণ্ডের অধিকারে বিবিধ সুবিধা ভোগ ও সুশিক্ষা লাভে স্বদেশের দুর্গতি ও অনন্ত অভাবজনিত বেদনাবোধ ও জাতীয় জীবনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে। ইংলণ্ডের অনুগ্রহে, ইংলণ্ডের সহায়তায় ভারতবাসী ধীরে ধীরে জাতীয় একতা ও জাতীয় জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন, চক্ষুকর্ণ বিশিষ্ট কোন বুদ্ধিমান মনুষ্য তাহা অস্বীকার করিতে পারেন? সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা প্রফেসর সিলি তৎপ্রণীত "Expansion of England" নামক গ্রন্থে ভারত-সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ভারতের জাতীয় জীবন স[illegible] এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, "There [illegible] no Indian nationality [illegible] though [illegible]e are some germs which, we can conceive, an nationality developing it[illegible] . সুপণ্ডিত সিলি সাহেব যদি জাতীয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনের পর ভারতীয় বিভিন্ন জাতীয় সুশিক্ষিত প্রতিনিধিগণের একতা ও জাতীয় জীবনের প্রতি অনুরাগ পর্য্যালোচনা করিয়া উক্ত পুস্তক খানি প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিস্ময় সহকারে উল্লেখ করিতেন যে, ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির কোটি কোটি লোকের রাজনৈতিক একতাবলে একটি মহাজাতিরূপে পরিণত হইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি ভারতীয় জাতীয় জীবনের যে অঙ্কুর কল্পনা করিয়াছিলেন, জাতীয় সমিতির যত্নে তাহা একটি সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, স্বদেশানুরাগী ভারতবাসীগণের যত্নে উহা সত্বর ফুল ফলে পরিশোভিত হইবে।

জাতীয় সমিতি আপাততঃ সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা সুসঙ্গত বিবেচনা করেন না। প্রতিক্ষণে যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছেদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে, সমিতি তদ্বিষয় বর্ত্তমান আলোচনার মধ্যে না আনিয়া সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। অনেকে বলেন, অনর্থক রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা ও আন্দোলন না করিয়া, সামাজিক বিষয় সকল,

অর্থাৎ বাল্যবিবাহ, ও বিবাহের অযথা ব্যয় নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রণয়ন ইত্যাদি বিবিধ বিষয় জাতীয় সমিতির আলোচ্য হওয়া উচিত। চিন্তাশীল ম দই বুঝিতে পারেন যে, বর্ত্তমান র তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যারম্ভ হইলে এ তির জীবন এক বৎসরের মধ্যে হইয়া আসিবে। বর্ত্তমান অবস্থায় যে সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব সমিতিতে আলোচিত হইবে, সেই দণ্ডেই বিভিন্ন সমাজভুক্ত ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শত শত লোকের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ জন্মিবে — তখন তাহার অব্যর্থ অশুভ ফল এই হইবে যে, হিন্দু মুসলমানের নিকট হইতে শত হস্ত দূরে যাইবেন, মুসলমান, হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হইতে সহস্র হস্ত দূরে যাইবেন, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হইতে শত সহস্র দূরে গমন করিবেন — এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক সকল পরস্পরের নিকট হইতে বহু দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। তখন কাহাকে লইয়া এই জাতীয় সমিতি বিদ্যমান থাকিবে? সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি সাধন উক্ত সমিতির উদ্দেশ্যের বহির্ভূত না হইলেও আপাততঃ উহা তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইতে পারে না।

সংক্ষেপতঃ ইহাই জাতীয় সমিতির বর্ত্তমান প্রধান উদ্দেশ্য যে, বৎসরান্তে, চারি দিনের জন্য ভারতীয় সমস্ত জাতিগণের সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য প্রতিনিধিগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের হৃদয় ও মনোভাব অবগত হইয়া পরস্পরের সহিত সরল অন্তঃকরণে বিবিধ বিষয়ের কথোপকথনে স্ব স্ব জ্ঞান উন্নতি সাধন, স্বদেশের দুঃখ ও অভাব-রাশির আলোচনায় তদ্বিমোচনের উপায় বিধান এবং সকলে এক মতাবলম্বী হইয়া স্বদেশের সর্ব্বপ্রকার হিত সাধনে যত্ন গ্রহণ করেন। ভারতের কোটি অধিবাসীদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, শিক্ষিত ভারতবাসীগণের সমবায় সম্মত উল্লিখিত মহান উদ্দেশ্যগুলি সহজেই সুসিদ্ধ হইতে পারে। ২৫ কোটী ভারতবাসী এখন এক সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীন — সুশিক্ষিত ইংরেজ এখন এই বিশাল ভারতের একাধীশ্বর — ভারতবাসীগণের সমস্ত সুখ দুঃখ এখন ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিতেছে — ইংরাজী ভাষা কোটি কোটি ভারতবাসীর নিকট রাজকীয় ভাষা বলিয়া বিশেষ আদরণীয়। হিন্দু, মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান, জৈন, পার্সী একেশ্বরবাদী ও সাম্যবাদী প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়গণ অন্য যত বিষয়ে অনৈক্য হউন না কেন, এক রাজার অধীনে থাকিয়া, একরূপ ভাষার সহায়ে। সকলে পরস্পরের নিকট স্ব স্ব অভিপ্রায় ও স্বদেশের শাসন

এবং স্বদেশের অবস্থার ভালমন্দ বিচার করিতে সমর্থ — এই অপূর্ব্ব রাজনৈতিক একতা দৃঢ়ীকৃত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

অভিনয়।

যে নাটকে দেশের লোক ভুলিয়াছে, আমি তার কথা বলিতেছি না; অথচ নাটকে যে এক অপূর্ব্ব রচনা-রস সঞ্চিত আছে, সে বিষয়ে কিছু বলিব। আমার নিকট অভিনয় ভূমি অতি প্রকাণ্ড, দশ সহস্র ক্রোশেরও অধিক, সেখানে এক কালে কত প্রকার কাব্য কার্য্যে পরিণত হয়, গণনা করিয়া ফুরাব না। কোটী কোটী লোক একত্র হইয়া সভা রচনা করিয়াছে, কিন্তু অভিনয়ের রসজ্ঞ অতি অল্প লোককেই দেখিতে পাই। বোধ করি, ইহার কারণ এই যে, যাঁহারা অভিনেতা তাঁহারাই দর্শক, সুতরাং আপনার অভিনীত অংশের মর্ম্ম আপনি বুঝিতে তাদৃশ সক্ষম নয়। কিন্তু নাটকের ইতিহাস যাহারা পড়িয়াছে, তাহারাই জানে যে, অভিনেতৃদিগের মধ্যে যাঁহারা অভিনয় রস বুঝিয়াছেন, তাহারা যেমন রসিক, তেমন অপরে কখনই হইতে পারে না। আমি নিজে অভিনেতা, সুতরাং আমার উল্লিখিত বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র ব্যক্ত করিতে পারিব, এরূপ আশা করি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অভিনয় ভূমি দশ সহস্র ক্রোশেরও অধিক বিস্তীর্ণ এবং কোটী কোটী লোক এই লীলা দেখিতে আসিয়াছে। রৌদ্র এবং জ্যোৎস্না রঙ্গভূমির নিম্নদেশ আলোকিত করিয়াছে, অগণ্য জোতিষ্কমালা নেপথ্যের উপরিভাগে দোলিতেছে—গভীর অভেদ্য অন্ধকার দূরবর্ত্তী পশ্চাৎভাগকে ঘেরিয়াছে। ঊষা এবং সন্ধ্যা-জড়িত নীলাম্বর পতিত এবং উত্থিত হইয়া এই বিচিত্র রঙ্গভূমিকে কখনও প্রকাশ করিতেছে, কখনও অবগুণ্ঠিত করিতেছে। যে সকল দৃশ্যে এই রঙ্গভূমি গঠিত, তাহার আর কত প্রশংসা করিব। কোথাও প্রকাণ্ড বনরাশি, কোথাও বহুসহস্র ক্রোশ-ব্যাপিনী প্রসন্ন-সলিলা নদী—কোথায়ও অগণনীয় অট্টালিকা ও রাজপথময় নগর, এই প্রকৃতিতে যত শোভা আছে, সমুদয় জড়িত হইয়া এই আশ্চর্য্য অভিনয় ক্ষেত্রকে রচনা করিয়াছে। অভিনেতা একজন নয়—শতজন নয়—সহস্রজনও নয়, কিন্তু বংশ বংশান্তরে এই অভিনয় ক্রীড়া চলিতেছে! পৌরাণিক এবং অভিনব এক একটী ইতিহাস, এক একটী শতাব্দী, এক একটী যুগ—এই প্রকাণ্ড নাটকের অন্যতম গর্ভাঙ্ক মাত্র। এই রূপ পরিচ্ছেদের পরিচ্ছেদ লিখিত হইতেছে, বংশের পর বংশ পাঠ করিতেছে ও অভিনয় করিতেছে, কিন্তু মর্ম্ম বুঝিতেছে কয় জন? অথচ এই বিশ্ব-কৌশলে এমন একটী অক্ষর নাই, এমন একটী ছত্র নাই, এমত একটী ঘটনা নাই, যাহা সমস্ত রচনার সম্বন্ধে সুমিশ্রিত ও সংযুক্ত নহে। এই বিশাল ধারাবাহিক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে, এমন পণ্ডিত বিরল। যিনি রচয়িতা, যিনি কবি, তিনি অভিনেতৃদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। তিনি নেপথ্যে অদৃশ্য থাকিয়া সূক্ষ্ম সূত্রে সকল অভিনেতাদিগকে জড়িত করিয়াছেন,

এবং নিজের কৌশল অনুসারে তাহাদিগের দ্বারা অভিমত কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইতেছেন। যাহারা এই সকল কার্য্য করিতেছে—না বুঝিয়া করিতেছে, বুঝিতে চায় না—বুঝিতে পারেও না। যারা বুঝিতে চায়, সে জন্য ব্যাকুল হয়, রচয়িতার নিকটে সকল ছন্দের, সকল অঙ্কের মর্ম্ম বুঝাইয়া লইবার নিমিত্ত বড় অনুরোধ করে, তাহারা কিছু কিছু বুঝিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পারে না। কেন না, এই জীবন্ত অভিনয়ের পরিণাম, এই নিগূঢ় রহস্যের শেষ অঙ্ক এখানে নয়। কালে ইহার আরম্ভ, কিন্তু অন্ত কোথায়? এই পৃথিবীতে ইহার প্রথমভাগ— ইহার পর্য্যাপ্ত কোথায়? সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস করিতেছে, কেহ উঠিতেছে, কেহ বসিতেছে, কেহ শয়ন করিতেছে, আর উঠিতেছে না। কেহ কাঁদিতেছে কেহ হাসিতেছে, কেহ মত্ত হয়, কেহ নিরাশ্রয় হয়, কেহ উপদেশ লয়, কেহ আচার্য্য হয়, কাহারও অঙ্গে রূপের সাজ, কাহারও ললাটে কলঙ্কের তাড়া, কাহারও দেহে যৌবনের সৌরভ, কাহারো মুখে অকাল বার্দ্ধক্যের কালিমা, কোন জাতি প্রভু, কোন জাতি দাস। এ প্রহেলিকার মীমাংসা না পাইয়া, অভিনেতাদিগের উপর হইতে নয়ন বিমুখ করিয়া যাহারা রচয়িতার দিকে আকুলে দৃষ্টিপাত করে, অভিনেতার প্রতি উদাসীন হইয়া প্রগাঢ় মনে অভিনয়কে সমালোচন করে, তাহারা কিছু কিছু মর্ম্ম বোধ করিতেও সক্ষম হয়। আমি সত্যের অঞ্জন চক্ষে মাখিয়াছি, আমি প্রেমের দূরবীক্ষণ দৃষ্টিযোগে সংলগ্ন করিয়াছি, আমি অভিনেতাদিগের সঙ্গে চির সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারিয়াছি, রচয়িতা নিজ বিদ্যালয়ে ছাত্রতালিকার শেষ অংশে আমার নাম লিখিয়া লইয়াছেন। আমি দৃশ্য হইতে দৃশ্যে, অর্থ হইতে অর্থে, রস হইতে রসে মগ্ন হইতেছি। সমুদয় জগৎরূপ সূক্ষ্ম যবনিকা আরো সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে, জড় হইতে চিদ্ঘনরূপ আত্ম প্রকাশিত হইয়া ত্রিভুবন গিরি-ভেদ করিয়া অগ্নির ঝলকে ঝলকে দিঙ্মণ্ডল আবরণ করিতেছে। সেই অগ্নিতে সকল মানুষ কেবল আহুতির ন্যায়, সকল কীর্ত্তি কেবল তৈল বিন্দুর ন্যায়, সকল দুঃখ সুখ কেবল ধূম বাষ্পের ন্যায়। বিশ্বরঙ্গভূমি কেবল এক জনেরই সত্যবিভূতি, আয়ু এবং কাল কেবল অনন্তের দিকে সঙ্কীর্ণ পথমাত্র, আমি এবং তুমি সেই আলোক প্রকাশ করিবার ক্ষীণ প্রদীপ; সমস্তই অসাড়, সমস্তই অচির, কেবল তিনিই সার, কেবল তিনিই সার। হে নব্যভারত, সেই তীর্থে যাত্রিক হও। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

কপটতার ছবি।

বিগত বৎসর মান্দ্রাজে যে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গপ্রদেশ হইতে অনেক প্রতিনিধি গিয়াছিলেন। অধিকাংশ প্রতিনিধিই জাহাজে গিয়াছিলেন। জাহাজে কেহ ব্রাহ্মণ পাচক লইয়া যান নাই—জাহাজের বন্দোবস্তেই অনেকে সন্তুষ্ট ছিলেন। বঙ্গের কোন জেলা হইতে এক জন প্রতিনিধি মান্দ্রাজ হইতে

দেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পিতা মাতার একান্ত অনুরোধে, জাতি রক্ষার জন্য, জাহাজে তিনি ফল মূলাহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার কোন সহ-যাত্রীর নিকট শুনিয়াছি, অন্যান্য যাত্রিগণের ন্যায় তিনিও মুসলমানের রন্ধনের কুক্কুটাদির মাংস প্রভৃতি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়াছিলেন। এটী একটী সামান্য ঘটনা বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এরূপ ঘটনা অনেক মিলে। যাঁহারা কৃতবিদ্য, যাঁহারা দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতে প্রয়াসী, তাঁহারাও সামান্য কারণে এরূপ কপটতা ও মিথ্যার প্রশ্রয় দেন, ভাবিলেও কষ্ট হয়। কিন্তু অনুসন্ধান কর, হাজার হাজার এরূপ কপটতার প্রশ্রয়দাতা দেখিতে পাইবে।

কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে লোকেরা মনে করে, ব্যক্তিগত-কুৎসা প্রচার হইল। বাস্তবিক তাহা হয় না। সত্য বাহির করিতে হইলে ঘটনার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। যা বল, যা লেখ, বলিবার বা লিখিবার সময় ভাবিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে, অবশ্য কোন ঘটনা সম্মুখে আছে। শূন্য লইয়া, কেবল কল্পনা লইয়া মানুষ আজ পর্য্যন্ত সত্য আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ঘটনা বা অবস্থাই সত্য আবিষ্কারের পথ।

যত লোকের সহিত দেখা হয়, তাহাদের ভিতর এবং বাহিরে যেন—আকাশ পাতাল প্রভেদ। নিজের জীবন আলোচনা করিলেও দেখি, অন্যের চরিত্র সমালোচনা করিলেও বুঝি,—মানুষ দিবানিশি কি যেন চাপা দিতে ব্যস্ত, কি যেন ঢাকিতে উন্মত্ত। ভিতরে হিংসা, বাহিরে প্রেম-বিহ্বলতা, ভিতরে অহঙ্কার, বাহিরে বিনয়-প্রকাশ;—ভিতরে রিপুর উত্তেজনা, বাহিরে বৈরাগ্য। যার ভিতরে প্রেমের উদয় হইয়াছে, সে আর তার বাহ্য প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয় না, যার শির অবনত হইয়াছে, সে আর বাহিরে বিনয় দেখাইতে ব্যস্ত হয় না; অথবা যার অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, সে বাহিরে গৈরিক বস্ত্র পরিয়া, ভেক ধরিয়া, উপবাসী থাকিয়া, ধর্ম্মের ঢাক বাজাইয়া বেড়াইতে চায় না। ভিতরে কেবল গরল, কেবল খোসা, কেবল ভণ্ডামি,—তাই মানুষ দিবানিশি কি যেন ঢাকিতে, কি যেন চাপা দিতে ব্যতিব্যস্ত।

আজ কালকার দিনে, ধর্ম্ম, চরিত্র, প্রেমপুণ্য—জীবনের ভূষণ, এ সকল ফাঁকি বলিয়া মানুষকে বুঝাইতে হয়। প্রকৃত খাটী জিনিসের অভাব হইলেই এরূপ হয়। আমরা এমন লোক দেখিয়াছি, যাহারা মানুষ দেখিলে উপাসনা করিতে বসে, যাহারা অবসর ও সুযোগ পাইলেই নিজ চরিত্র-গৌরব ঘোষণা করে। "আমি উপাসনা করি তখন, যখন আর কেহ কাছে না থাকে"—একথা অতি অল্প লোকেই বলিতে পারেন। "ভিতরে মরিয়া রহিয়াছি, বাহিরে গৈরিকবস্ত্র পরিয়া বৈরাগী সাজিয়া কি করিব, অথবা ভিতরে যখন জীবিত রহিয়াছি, তখনই বা এ বাহ্য-প্রকাশের প্রয়োজন কি?"—একথা এই বাহ্য-চটকের দিনে কই বড় একটা শুনিতে পাই না। এখন যে একখানি গৈরিকবস্ত্র পরে, যে দুই একটা মিষ্ট সঙ্গীত করে, যে একটা অনুষ্ঠান করে, বা যে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে, সে ব্যভিচারী হউক, আসক্তির দাস হউক, সে হৃদয়ে ভয়ানক নরক পোষণ করুক, তার

আর এ ভব-বাজারে বিপদ নাই। সে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাজে সমাদৃত। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঘাটে দীর্ঘ তিলকধারী ব্রাহ্মণকে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি, অথচ দেখিয়াছি, তাহারা আড়নয়নে যুবতীর পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিতেছে। দেখিয়াছি, গোপনে গো মাংস ভক্ষণ করিতেছে, অথচ বাহিরে নামাবলী গায় দিয়া নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। সঘন ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি, অথচ দেখিয়াছি, তাহারাই সুবিধা পাইলে অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিতেছে দুই দশ টাকার প্রলোভনে ঘুষ লইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এই ধারণা জন্মিয়াছে মানুষের ভিতর ও বাহিরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ধারণা জন্মিয়াছে, যাহারা বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ করে, অন্তরে তাহারা নর-পিশাচ।

"যে খাটী জিনিসের কাঙ্গাল, সে মেকি চায় না। যে চরিত্র পাইয়াছে, সে প্রতারণা জানে না। তোমার চক্ষে ধূলি দিতে পারি, কিন্তু বিধাতাকে বা নিজ আত্মাকে ত আর পারি না, তার প্রাণে দিবানিশি এইরূপ ভাব। তুমি তাহাকে ধার্ম্মিক বল বা না বল, তাতে তার বড় একটা আসিয়া যায় না;—কেনন সে সার ... অসার বুঝিয়াছে। সে কখনও সত্য ... করিতে পারে না। "আমি জাতিভেদ মানি না মুসলমানের হাতের ভাতও খাই—তোমার ভয়ে তাহা অস্বীকার করিব?'—না—তা কখনই পারিব না," সে ব্যক্তি এইরূপ বলে। আর যে প্রতারক, সে অন্যায় করে, কিন্তু তাহা চাপা দেয়। এইরূপ চাপা দেওয়ার ভাব আজ কাল দেশে বড়ই বাড়িয়াছে। কপটতার আচ্ছাদনে বড় বড় ভণ্ড তপস্বীরা আজ ভারতে দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এ সকল কথা কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে। খুব অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, খাটী জিনিস এদেশে দিন দিনই বড় দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া যাহারা চিৎকার করিয়া ফিরিতেছে, প্রকৃত ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে অতি অল্পই দেখি। দুই দশদিন পরেই মেকি ধরা পড়িতেছে। যাহারা পরোপকার, দেশোদ্ধার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতির ধূয়া ধরিয়া বেড়াইতেছে, দেখি, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মধ্যে কেবল স্বার্থ-চিন্তা। টাকা, যশ, মান, প্রতিপত্তি গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানলাভকামনা, দেশের বড় ছোট অধিকাংশ হিতৈষীর প্রাণে। ধর্ম্ম বক্তৃতার জিনিস নয়, কিন্তু উপভোগের জিনিস, কিন্তু কয় জন লোক তাহা উপভোগ করে? সজন ছাড়িয়া নির্জ্জনে বসিয়া কয়জন লোক ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে? কয় জন তাকে পাইবার জন্য তার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করে? পরোপকার বা দেশাচার-রতও বক্তৃতার বিষয় নয়, তাহা জীবনে প্রতিপালনের জিনিস। কিন্তু কয় জন তাহা করে? গবর্ণমেণ্ট একটু খাতির করিলে, দেশোদ্ধার বা পরোপকারের কথা নিমেষের মধ্যে চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই যে এত বড় জাতীয় মহাসমিতি বসিতেছে, যাহার কার্য্য কলাপে হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে, কত ধুমধাম হইতেছে, আজ বড় বড় লোকদিগকে ডাকিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি বড় বড় উপাধি দেন, বা বড় বড় পদ দেন, অমনি মুখ বন্ধ হইয়া যায়। দেখিয়াছি, দশদিন পূর্ব্বে যে খুব মহাসমিতির সপক্ষ ছিল, আজ সে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদ লাভ করিয়া ইহার ভয়ানক বিরোধী হইয়াছে। যাহা সুব্রহ্মণ্য আচার্য্যের জীবনে

ঘটিয়াছে, তাহা শতজনের জীবনে ঘটিতে পারে। একটু প্রসাদ লাভ করিবার জন্য, যাহারা, অপমানের বোঝা মস্তকে পাইয়াও, অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য লাটভবনে বার-ম্বার ধাবিত হয়, তাহারা গবর্ণমেণ্টের কৃপা পাইলে যে দেশের কথা ভুলিবে না কেন, জানি না। যিনি একবার গবর্ণমেণ্ট প্রসাদ লাভ করিয়া বাঙ্গালীকে ঘৃণা করিয়াছিলেন, এবং যিনি হারিসন সাহেবের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী হইয়া করদাতাগণের রক্ত শোষণের টাকা জুবিলিতে অথবা ব্যয় করিতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তিনি আজ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য বা লাট সাহেবের সদস্য পদ পাইলে আবারও সেইরূপ মুখবক্র করিতে যে পারি-বেন না, কেমনে জানিব? দশ টাকার জন্য যে দেশের লোক মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, একটু সম্মানের জন্য যে জাতি কপটতার জাল বিস্তারে সদা প্রস্তুত, সে জাতির উন্নতি কোথায়, কেবল বিধাতাই বলিতে পারেন।

এ দেশের সর্ব্বত্রই একরূপ দৃশ্য,—কেবল বাহিরের পোষাকের চাকচিক্য। হই-হৈচ, কোলাহল, আন্দোলন,—সব আছে,—কিন্তু ভিতরে চরিত্র, ধর্ম্ম, বা কর্ত্তব্য পরায়ণতারূপ খাটী জিনিসের একান্ত অভাব। তাই লোক গোড়ায় জল না ঢালিয়া মাথায় ঢালে। তাই লোক গৈরিক বস্ত্র পরিয়া, নিরামিষ-আহারী হইয়া বাহ্য-চটকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চায়,—তাই লোক দেশের লোকদিগকে না জাগাইয়া, না তুলিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে চায়! বাহির—বাহির—বাহির—কেবল বাহির-সর্ব্বস্ব। "মুখে জগৎ মারিব" ইহাই মূল মন্ত্র। কিন্তু জগৎ যে কেন ভুলেনা, এই ত বিষম দায়।

লর্ড ডফরিণ বিদায় ভোজ উপলক্ষে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে। তাঁহাকে আমরা গালাগালি দিতেছি, কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন, তার মধ্যে কি সত্য কিছুই নাই? অশিক্ষার ঘোর অন্ধকারে কি ভারতের পোনের আনা লোক নিমগ্ন নয়? এই অশিক্ষার অন্ধকার না ঘুচিলে কি এ দেশের উদ্ধার হইবে? এই অশিক্ষার কলঙ্ক মোচনের জন্য আমরা কি দায়ী নই?—কিন্তু কে একথা বুঝিবে? জাতীয় মহাসমিতিতে এত ধূমধাম হইতেছে, কিন্তু কাজের ফল কি? কেবল কতকগুলি ফাঁকা প্রস্তাব। সে গুলির সার মর্ম্ম কি? না—গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেওয়া—"ইহা কর, তাহা কর?" বলি, গবর্ণমেণ্ট কি এতই নিরেট বোকা যে, তোমাদের এত আয়োজনের ও এত অর্থব্যয়ের ফলস্বরূপ একটু উপদেশ পুরস্কার পাইয়াই সব ভুলিয়া যাইবেন? দেখ—আশার কুহক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চতুর ডফারিণ সব বুঝিয়া লইয়া কি অক্ষয় গালাগালির কবজ তোমা-দের গলদেশে পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন! তোমাদিগকে গবর্ণমেণ্ট সাক্ষী মানে না, তবুও সাক্ষী দিবে?—এমন নির্লজ্জ ব্যবহার ত আর কোথাও দেখি নাই! হায়, এত আয়োজনের ফল কেবলই ফাঁকা আও-য়াজ—একটীও প্রকৃত কাজের কথা নাই। আমাদের কর্ত্তব্য কেবল বক্তৃতা পর্য্যন্তই শেষ! কি শোচনীয় শিক্ষা! এত বড় বৃহৎ ব্যাপার হইতে একটা মহৎ কাজও প্রসূত হইল না। কিন্তু একথা কাকেইবা বলি, কেই বা শুনে?

এখন কয়েকজন জন মাত্র দেশীয় মাজি-ষ্ট্রেট আছে, আন্দোলনের পর নয় ৫০জন

হইল। এখন অল্প কয়েক জন গবর্ণমেণ্টের সদস্য আছেন, আন্দোলনের পর নয় শত জন হইল ;—তাতে আপামর সাধারণের কি উপকার হইল, বলিতে পার ? তুমি বড় হইলে, বা সে বড় পদ পাইলে আপামর সাধারণের তাতে কি ? দশজন দেশী লোক আইন করিল, কি বিদেশী লোক আইন করিল, তাতেই বা তাদের কি ? তাদের উদ্ধারের, বা উন্নতির পথ কিসে মুক্ত হইবে ? একমাত্র শিক্ষা ভিন্ন আর তার উপায় নাই। এই সাধারণের শিক্ষা-ব্রত কি জাতীয় মহাসমিতি লইতে পারেন না ?—না—যতদিন বাহিরের চাকচিক্য, বা যশ মানের প্রতি লোভ, তত দিন কিছুতেই এ কাজ হাতে লইতে পারেন না। কাজেই বলি, কেবল বাহির, কেবল বাহির লইয়া মাতামাতি !। ভিতর কে চায়, ভিতর কে খোজে ? অন্তরদৃষ্টি ভিন্ন, আপামর সাধারণের উন্নতি ভিন্ন কখনও কোন জাতির উন্নতি হয় নাই, হইবে না। কিন্তু এ সকল কথা বলিতে গেলে লোক বড়ই বিরক্ত হয়। কি দুঃখের বিষয়, একই ভাব, একই কথা, একই প্রণালী যেন সকলের মস্তিষ্ক-প্রসূত। চারি বৎসর ভারতের মহা মহা ধুরন্ধর ব্যক্তিগণ মিলিয়াও একটা প্রকৃত উন্নতির পথ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না ! আবেদন-প্রস্তাব (Petition) ভিন্ন, ভিক্ষানীতি ভিন্ন আর ভারতবাসীর উন্নতির যেন কোন পন্থা নাই ! শুন, কি মর্ম্মভেদী কথা ! সব লোকের মুখে এক কথা, সব সংবাদ পত্রে একই ভাষা, একই ভাব। একটু অন্য রকম লিখিলেই বিরক্তির উৎপত্তি। আমরা এ সকল বিরোধী চিন্তা লইয়া এখন দাঁড়াই কোথা, তাহাই ভাবিতেছি।

একজন প্রতিনিধির সহিত এইরূপ অনেক বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "আবেদন করা বা অন্যের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, তাহা কি আপনি জানেন না ? বৎসরের মধ্যে ৪।৫ দিন ব্যয় করা সহজ, কিন্তু সমস্ত বৎসর দেশের উন্নতির চিন্তা লইয়া কি আমাদের পক্ষে থাকা সম্ভব ? আমাদের দ্বারা তাহা হইবে না, তাহা পারিব না।" আমরা বলিলাম, "যাহা নিজেরা পারেন না, অন্যে তাহা কিরূপে পারিবে ? দেশের উন্নতির জন্য আপনারা কোন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবেন না, তবে অন্যকে উপদেশ দেন কেমনে ? ইংরাজ-জাতি স্বার্থ সাধনের জন্য ভারতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বার্থ ছাড়িতে এত উপদেশ দিতে যাইতেছেন, কিন্তু নিজে একটুও স্বার্থ ছাড়িতে প্রস্তুত নন। এ দেশ-হিতৈষিতা না করিলেই কি হয় না ?" তিনি বলিলেন, "নয় প্রতিনিধি না হইলাম, দর্শকের ন্যায় সমিতিতে উপস্থিত থাকিব ?" আমরা বলিলাম, "প্রতিনিধি হইয়া প্রতিনিধির কাজ অবহেলা করা ভয়ানক অন্যায়। যখন প্রতিনিধি হইয়াছেন, তখন প্রাণপণে প্রতিনিধির উপযুক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত। নয় কার্য্য দ্বারা, নয় চিন্তা দ্বারা, নয় অর্থ দ্বারা দেশের মঙ্গল করুন ; কেবল গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় দশ জনের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া যাইলে কখনই আশানুরূপ ফল পাইবেন না। কর্ত্তব্য-বোধ ও দায়িত্ববোধ না জন্মিবার দরুণই যে আমাদের অনেক কাজ বালকের ক্রীড়ার ন্যায় হইতেছে, তাহা কি বুঝিতেছেন না ? সাবধান হউন, দায়িত্ব বুঝুন,

কর্ত্তব্যপালনে জীবন উৎসর্গ করুন;—নচেৎ ঠাট্টা তামাসা করিয়া, হাসিয়া নাচিয়া কখনও দেশোদ্ধার করিতে পারিবেন না,—একরূপে কেহ কখনও দেশোদ্ধার করিতে পারে নাই।” এই কথাগুলি প্রতিনিধি মহাশয়ের প্রাণে বড় লাগিল, তিনি আপনার দায়িত্বহীন ব্রত গ্রহণে বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং শেষে বলিলেন—“এবার আমি জাতীয় সমিতির কার্য্যাদি পরিদর্শন করিব, তার পর আগামী বৎসর হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিব।”

আমরা জানি, অনেক লোকই এইরূপ দায়িত্ববিহীন ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। আনন্দ, উল্লাস, দেশভ্রমণ,—যশ মানের কুহক,—এ সকলের আকর্ষণেই অনেকে “প্রতিনিধি” সাজিবার জন্য সভা আহ্বান করেন, এবং প্রতিনিধি হন। নচেৎ এক হাজার প্রতিনিধি যদি প্রকৃত পক্ষে দেশের উন্নতির জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিতেন, নিশ্চয় বলিতে পারি, দেশের অনেক দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইত। একা ম্যাট্‌সিনি, একা ওয়াসিংটন জগতের কি না করিয়া গিয়াছেন! আর আমাদের দেশে এত প্রতিনিধি, এত দেশহিতৈষী, তবুও ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে—কি পরিতাপের বিষয়! যতদিন আমাদের দেশের লোকের দায়িত্ববোধ, কর্ত্তব্য বোধ না জন্মিবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না।

ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন সেরূপ দায়িত্ববোধ, সেরূপ কর্ত্তব্য-বোধ জন্মিতে পারে কি না, প্রশ্ন এই। আমরা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছি যে, তাহা অসম্ভব। মানুষ যতদিন মানুষ হইবে না, ততদিন তার কর্ত্তব্যবোধ জন্মা অসম্ভব। ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্ম ভিন্ন মানুষের প্রতারণা, ছলনা বা কপটতার জাল ছিন্ন হয় না,—মানুষের চরিত্র লাভ হয় না, মানুষ মানুষ হয় না। ধর্ম্মহীন মানুষ না করিতে পারে এমন কাজ নাই। মদ্য পান, ব্যভিচার, মিথ্যা কথা বলা, নরহত্যা, পরস্বাপহরণ, এ সকলই মানুষ করিতে পারে, যতদিন তার ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে নাই। যে নরহত্যা করিতে পারে, যে অন্যের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারে, যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে পারে, তার দ্বারা জগতের উপকার হইবার আশা যে করে, সে মূর্খ। কারণ, মানুষকে যে ভাই বলিয়া না বিশ্বাস করিল, সে কেন তার উপকার করিবে? ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিন্ন মানুষের ভিতরে তার জ্বলন্ত প্রকাশ দেখিতে পাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং মানুষকে আদর করিতে পারাও অসম্ভব। মানুষকে ভ্রাতার ন্যায় না দেখিয়া যে পশুর ন্যায় ঘৃণা করে, তার দ্বারা মানুষের উপকার হওয়া অসম্ভব। যশমানের কুহক, স্বার্থের আকর্ষণ এই পথে কিছুদিন মানুষকে চালাইতে পারে বটে, কিন্তু যখন সেই কুহক বা সেই আকর্ষণ ছিন্ন হয়, তখন, হায়, তখন মানুষ “পা গুটাইয়া” লয়, এবং তখন আর এক মুহূর্ত্তও পরের কথা ভাবিতে পারে না। অতএব—পরোপকার বল, বা দেশোন্নতি বল, বা জাতীয় মিলন সংঘটনের কথা বল, ধর্ম্ম বিশ্বাস ভিন্ন এ সকল সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। ইতি মধ্যেই দেখিতেছি, আজ যিনি দেশ-সংস্কারক, কাল গবর্ণমেণ্টের প্রসাদ লাভ করিয়া তিনি দেশের শত্রু। সুব্রহ্মণ্য আচার্য্যের কথাই বল বা শিবপ্রসাদের কথাই

বল, আমরা অনেকেই যে গবর্ণমেন্টের প্রসাদ লাভে অধিকারী হইলে এরূপ করিতে পারি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের মধ্যে কে এমন আছেন, যিনি জীবনের ঘটনার দ্বারা ইহার অন্যরূপ দেখাইয়াছেন? কই, খুঁজিয়া ত পাই না। আমাদের চরিত্রের এইরূপ চাঞ্চল্য দেখায়াই ডফারিণ এত গালাগালি দিয়া গিয়াছেন। একথা গুলি একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখা নিতান্ত উচিত। আমরা কি প্রকৃতি লইয়া দেশে হই-চই করিতেছি, একবার স্থির চিত্তে অনুধাবন করা একান্ত উচিত। বাহিরে এক ভাব, ভিতরে আর এক ভাব; বাহিরে দেশের উন্নতির কথা, ভিতরে নিজের স্বার্থ চিন্তা;—বাহিরে দেশ-সংস্কারক, ভিতরে দেশ-তস্কর হইয়া আমরা যে কি অপদার্থতার পরিচয় দিতেছি, সকলেরই একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। মনুষ্যত্বহীন, চরিত্রহীন ব্যক্তি কতদিন কপটতার আচ্ছাদনে আপনাকে ঢাকিয়া জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে? আজ, নয় কাল, তার চাতুর্য্য ধরা পড়িবেই পড়িবে। মানুষ—আগে চরিত্রবান হও, ধার্ম্মিক হও, বিধাতার ইঙ্গিত বুঝ, তার পর কর্ত্তব্য ব্রত গ্রহণ করিয়া বীরের ন্যায় তাহা পালনে জীবন বিসর্জ্জন কর। কেবল হুজুগ, কেবল স্বার্থচিন্তা, কেবল মুখ-সর্ব্বস্ব ভাব লইয়া আর কতদিন কাটাইবে? ছি,জগতের লোক যে তোমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে—বা ফেলিবে, অন্ততঃ এ ভাবনাও একবার আত্মদৃষ্টি কর। সর্ব্বোপরি বিধাতা যে সকল ভণ্ডামি দেখিতেছেন, ইহা জানিয়া আপনাকে সংশোধন কর। কপটাচারী হইয়া আর কত কাল উন্নতির অন্তরায় হইবে? উন্নতির সরলপথ নিজ কপট ব্যবহারের দ্বারা আর রুদ্ধ করিও না, পারে ধরি সতর্ক হও। দেশের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, পায়ে ধরি, একবার তাহা চিন্তা কর।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।**—প্রথম ভাগ, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টচার্য্য, এম, এ, বি, এল প্রণীত; ঢাকা আদর্শ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১॥০ মাত্র।

ত্রৈলোক্য বাবুর নাম নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নয়। কয়েক বৎসর যাবৎ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য ত্রৈলোক্য বাবু যে গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার কতক পরিচয় পাঠকগণ পাইয়াছেন; কিন্তু তাহা অতি সামান্য পরিচয় মাত্র। এই গ্রন্থে তাহার উজ্জ্বল পরিচয় রহিয়াছে। পৃথিবীর বড় বড় লেখকগণ বহু বৎসর ঘরের দরজা আবদ্ধ করিয়া গভীর গবেষণার পর জগতে কত অমূল্য কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশে তাহাদের সমতুল্য লোক দেখা যায় না। আমাদের দেশের বর্ত্তমান লেখকগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্যবসার জন্য লেখেন,—স্কুলের পাঠ্যপুস্তক, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এই সকল লিখিতেই অনেকে ব্যাপৃত। যাতে পরিশ্রম অল্প, এবং অর্থের আশা অনেক, তাহা লইয়াই অনেকে ব্যস্ত। এই জন্য আমাদের দেশে মৌলিক ইতিহাস বা বিজ্ঞানের পুস্তক একখানিও হয় নাই। ইংরাজি ইতিহাসের দোষ দেখাইতে আমরা যত মজবুত, একখানি

পরিশুদ্ধ মৌলিক ইতিহাস লিখিতে তত অগ্রসর নহি। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত পয়সার মায়ায় সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস খানি শেষ না করিয়া এখন স্কুল-পাঠ্য লিখিয়া ধনী হইতেছেন। চণ্ডী বাবু ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া উপন্যাস লিখিতে বসিয়াছেন। যাহাতে অর্থ নাই, অথচ গভীর গবেষণা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন এমন কার্য্যে কে সময় নষ্ট করিবে? স্বর্গীয় রামদাস প্রাচীন কীর্ত্তি অনুসন্ধানে অনেক অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া অসময়ে পরলোকবাসী হইলেন। রাজকৃষ্ণ ইতিহাসের আয়োজন করিতে করিতেই অসময়ে অন্তর্হিত হইলেন। একজনও এই কার্য্যে সফলকাম হইতে পারিলেন না। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই, বাঙ্গালা ভাষার দারিদ্র্যের অবধি নাই। ... আছে।

দেশের এই দুরবস্থার সময়ে ত্রৈলোক্য বাবু ক্ষীণ লেখনী ধারণ করিয়া বাঙ্গালা-ভাষার উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। বঙ্গদেশ যদি এই মহাত্মাদের নিঃস্বার্থ-ব্রত পালনে সাহায্য না করেন, তবে বুঝিব, এদেশের উন্নতির কথা কেবল বক্তৃতায় লিপিবদ্ধ, কিন্তু প্রাণে নয়।

আমরা জানি, ত্রৈলোক্য বাবু একজন দরিদ্র ব্যক্তি। মাতৃভাষার দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের হীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি এই বৃহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছেন। বঙ্গভূমির কৃতবিদ্য সন্তানগণের নিকট সহানুভূতি এবং উৎসাহ পাইবেন, অবশ্যই তিনি আশা করিতে পারেন। এ কার্য্যে তাঁহার অর্থের বড় প্রত্যাশা নাই;—কেননা, এইরূপ গভীর গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ পুস্তকের পাঠক অতি বিরল! স্কুলের পুস্তক লিখিলে অর্থাগম হয়, জাঁকজমকপূর্ণ বিজ্ঞাপনের জোরে সাহিত্যপ্রান্তরের আগাছা নাটক নবেল খুব বিকায়, তাহা জানিয়াও তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে মহৎ হৃদয়ের এবং জ্বলন্ত স্বদেশোন্নতির পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য এদেশ ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না? সম্পাদকগণ ইঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবেন না? কৃতবিদ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ উৎসাহ প্রদর্শনে ইঁহাকে কৃতার্থ করিবেন না? এমন কথা ভাবিতেও আমরা ব্যথিত হই।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ পর্য্যন্তের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি, তিনি অতি বিশুদ্ধ ভাষায়, উপন্যাসের ন্যায় মধুর করিয়া ইহা লিখিয়াছেন; পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার গবেষণা এবং তাঁহার বিজ্ঞতার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া কঠিন। এই পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার পরিচয় রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের একরূপ গভীর গবেষণাপূর্ণ বিস্তৃত ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ত্রৈলোক্য বাবু বঙ্গদেশের সুসন্তান,—তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতার স্বর্ণাক্ষরে বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যের ইতিহাসে লেখা থাকিবে। আমরা আশা করি, এই দরিদ্র গ্রন্থকার বঙ্গদেশে বিশেষ রূপ আদৃত হইবেন। সৎ উদ্দেশ্য লইয়া অগ্রসর হইলে কাহাকেও আক্ষেপ করিতে হয় না, আশা করি, কৃতবিদ্যগণের উৎসাহ এবং সহানুভূতিতে ত্রৈলোক্য বাবু এ উপদেশ পাইবেন। বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগী এবং হিতৈষী ব্যক্তিগণের পুস্তকালয়ে

এ অমূল্য গ্রন্থ যে স্থান পাইবে, এ বিষয়ে আমাদের একটুও সন্দেহ নাই।

২। মিত্রকাব্য। আনন্দচন্দ্র মিত্র বিরচিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ টাকা। এই পুস্তক খানির একটা বিস্তৃত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা হইল না। এই পুস্তকে গ্রন্থকারের এক যুগের নানা বিষয়ক কবিতা মিত্রাক্ষর ছন্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার একজন বাঙ্গালাভাষার সাধক—অনেক দিন হইতে তিনি কাব্য জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত হেলেনাবধ কাব্য বাঙ্গালাভাষায় একখানি সুন্দর পুস্তক। কাব্য—গ্রন্থকারের হৃদয়ের ছবি। যিনি হৃদয়াংশে নিকৃষ্ট, তাঁহার পত্ত রচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আনন্দ বাবু একজন প্রকৃত হৃদয়বান ব্যক্তি। তাঁহার হৃদয়ের ছায়া দেখুন—

"এই ফুল গুলি সহ হৃদয় আমার রে,
আজি হতে চির তরে সঁপিলাম তোমারে;—
এখনো এ ফুলগুলি পতঙ্গেরা খায়নি,
শিশির রয়েছে গায় রোদেতে শুকায়নি;
সেই রূপ এ হৃদয় ফুটিয়াছে যখনি,
অর্পিব তোমার হাতে ভোরছিনু তখনি;
একদিন দুই দিনে বনফুল শুকাবে,
অনন্ত অনন্ত কাল এই প্রেম থাকিবে।"

গ্রন্থকারের অধিকাংশ কবিতাই সরল, মধুর, জমাটভাবের ছায়া। তাঁহার নিশীথ-চিন্তা, সুখের শরৎ, বিনোদ ও মালতী, কবির স্বপ্ন, বিজয়া দশমী প্রভৃতি কবিতাতে উচ্চদরের কবিত্ব-শক্তি বিকশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে কতকগুলি মধুর সঙ্গীত আছে, সে গুলি অতি সুন্দর ও গ্রন্থকারের দেশ-হিতৈষিতার জলন্ত নিদর্শন। "কলির রাজসূয়" "বিবাহ শঙ্কট" ও "আনন্দমোহনের প্রতি", প্রভৃতি কবিতা অনেকটা ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যে পূর্ণ; এগুলিকে স্থায়ী সাহিত্যে স্থান না দিলেই ভাল হইত। পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিলে সহজেই মনে হয় যে, পুস্তক দেশে খুব আদৃত হইয়াছে। বাস্তবিক, মিত্র কাব্যের আদর হওয়া একান্ত উচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ মিত্র কাব্য—প্রথম সংস্করণ হইতে অনেক বড় হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণের যে আরো অধিক আদর হইবে, তাহা আমরা ...সেই অনুভব করিতে পারি।

কবি যে একজন প্রকৃত দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি, তাঁহার কবিতা হইতে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি,—

"কোথা ভবরাণি, জগত জননি
একবার মাতঃ দেখ না এসে;
তোমার বিহনে, যে তোমার সংসার,
নয়নের জলে যায় মা ভেসে।
কোথা সে উল্লাস, কোথা সে উৎসব,
গিয়াছে, সকলি আর কি হবে?"

কবির স্বভাব বর্ণনাও বড় স্বাভাবিক, ইচ্ছা ছিল দুই চারিটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাই,- কিন্তু স্থান নাই। আশা করি কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন।

অন্যান্য পুস্তক আগামী মাসে সমালোচিত হইবে।

ভারত-সমাজ।

মনুষ্য-সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; উচ্চশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী। যাহাদিগের অক্লেশে অপর্য্যাপ্ত আয় হয়, ভৃত্যাদি রাখিতে কষ্ট বোধ হয় না, যানে ভ্রমণের বাধা হয় না, তাহারা উচ্চশ্রেণী; যাহারা করপদ-সঞ্চালন-জনিত ঘর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা নিম্নশ্রেণী; আর যাহারা এই উভয়ের মধ্যে স্থিত, তাহারা মধ্যশ্রেণী বা মধ্যবর্ত্তী শব্দে বাচ্য।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও এই তিন শ্রেণীর লোক আছে। উচ্চেরা বিস্তৃত ভূমি সকলের অধিকারী, অথবা যথেষ্ট বাণিজ্যবান্ কিম্বা প্রচুর নগদ সম্পত্তির অধীশ্বর। নিজ হস্তে লেখা পড়া পর্য্যন্ত করিবার প্রায় আবশ্যক হয় না, ভৃত্যেরা সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্যের আহরণ করে, কর্ত্তারা ক্রীড়া কৌতুকে থাকিয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন। ইংলণ্ডের উচ্চেরা বিদ্বান, ব্যায়াম ও অশ্বারোহণ-তৎপর এবং বন্দুক চালনায় সক্ষম; তাঁহারা সচরাচর জাতীয় কার্য্যে যোগ দিয়া থাকেন; কখনও যুদ্ধের সেনাপতিত্ব, কখনও প্রদেশ বিশেষের শাসনকর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

এদেশের জমিদারেরা এক্ষণেও প্রায় নিদ্রিত। কেহ কেহ ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের নাম করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন যে, ইংরেজ রাজত্বে আমাদিগের জমিদারেরা কি অপূর্ব্ব একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছেন? কিন্তু তাঁহারা ভ্রান্ত। এক্ষণও জমিদারদিগের মধ্যে কত যে অর্দ্ধশিক্ষিত লোক আছে, তাহার অবধি নাই; তাহারা ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন কি পদার্থ, বুঝিবে কি প্রকারে? কত এরূপ জমিদার আছে যে, যোগ দেওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করিতে অসমর্থ; কেহ বা যোগ দিয়াছেন চাঁদা দিয়া থাকেন, কিন্তু কোন কার্য্যে যোগ দিবার বুদ্ধির অভাব। কত এরূপ আছে যে, চাঁদা দেওয়ার ভয়ে যোগ দিতে অনিচ্ছুক।

পতিত দেশের সকলই পতিত। জাতীয়তা-বোধ জমিদারদিগের মধ্যে শতকরা পাঁচ জনেরও নাই। কেহ কেহ স্কুল করিয়াছেন, নিয়মিতরূপে ব্যয় ভার বহন করিতেছেন, কিন্তু ফলাফলের প্রতি অণুমাত্রও দৃষ্টি নাই, ইহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না কি যে, যেমন চড়িবার অনভ্যাস সত্ত্বেও দশটা ঘোড়া রাখা হইয়াছে, স্কুলটীও সেইরূপ নাম লাভের জন্য সংস্থাপিত? বহুসংখ্যক জমিদার তাস পাশায় দক্ষ; পরিশ্রম-ঘৃণী, কেহ কেহ বা ঘোর বীভৎস দোষাসক্ত। সংবাদপত্র লন কিন্তু পড়ে পরে; লাইব্রেরি আছে, তাহাতে সাপ থাকে কি ব্যাং থাকে, তাহা অবগত নহেন। নিজে নিয়ত এক প্রকাণ্ড তাকিয়ার পৃষ্ঠে বিপুল বপু প্রসারিত করিয়া মুহুর্মুহু যটকায় তামাক খাইতেছেন, কর্ত্তাভজা নংপুংসকবৎ মুদা-এবেরা চতুর্দ্দিক হইতে হাঁচির সঙ্গে হাঁচিতেছেন, কাশির সঙ্গে কাশিতেছেন। ঘোর আলস্যের পুত্তলি,

চরবিতে আপাদ মস্তক আচ্ছন্ন করিয়াছে, পুত্র হইল না, পুনরায় বিবাহ হইল, তাহাতেও হইল না, তখন কাজে কাজেই পোষ্যপুত্র রাখা সাব্যস্ত হইতেছে। পবিশ্রমের অভ্যাস রাখিলে কি সন্তানের জন্য এমন করিয়া পরের দ্বারস্থ হইতে হয় ?

আয় ব্যয় বোধ নাই, প্রজাদিগের সহিত পরিচয় নাই, নিজের অধিকারের সীমা সকল জানিবার চেষ্টা নাই। এই সকল দোষে ঋণী হইয়া কত জমিদার শিঙ্গা ফুঁকিয়াছেন, কেহ বা দুদিন বাদে ফুঁকিবেন, কেহ কেবল রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ। সবিকি গোল এদেশের মজ্জাগত, কারণ নিজের উচিত প্রাপ্যটা ঠিক করা, এদেশের ছাগবুদ্ধির অসাধ্য, তাহাতে কত জমিদার প্রকৃত্ব পাইয়াছে, পাইতেছে ও পাইবে।

যাহার সম্পত্তি স্বকৃত নহে, পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত, তাহার তাহাতে আত্মপ্রসাদ হওয়া অসম্ভব, কিন্তু তথাপি অনেক আত্মত্ব-বোধশূন্য লোককে নৃত্য করিতে দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বর যে ব্যক্তি বিশেষের আমোদ প্রমোদের জন্য একটী সুবৃহৎ বিত্তের সৃজন করিয়াছেন, ইহা ভাবা যাইতে পারে না, তুমি জনসাধারণের উপকারার্থ পরিমিতরূপে ব্যয় করিবে বলিয়া সম্পত্তি পাইয়াছ, এক্ষণ যদি তুমি তাহা নিজ চক্ষে না দেখিবে, নিজে না ব্যয় ও রক্ষা করিবে, তাহা হইলে উহা থাকিবে কেন ? কর্তব্যের লঙ্ঘন কর বলিয়া ঋণী হও, সম্পত্তি হারাও। রাজপুরুষদিগের সেবা কালে তুমি অচৈতন্য হও, উইলসনকে লম্বা লম্বা কার্ডের দেও, কিন্তু প্রজার দুঃখে ভ্রূক্ষেপ কর না। এত পাপ সহিবে কেন ? যদি তুমি জমিদারীর অথবা সম্পত্তির উপযুক্ত ব্যবহার না করিতেই, পৌরুষ ভার, তবে তোমার ঐশ্বর্য্য যে যোগ্যতর লোকের হাতে যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি !

যদি সম্পত্তির উপযুক্ত হইতে চাও, তবে অগ্রে বিদ্যাভ্যাস করিয়া নিজের আভ্যন্তরীণ মালিন্য সকলের অপনয়ন কর, তার পর আত্ম কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখ। পাল্কী চড়া ছাড়িয়া দেও ; উহা বৃদ্ধ, রোগী ও নারীদিগের ব্যবহার্য্য। অন্ততঃ ৫ পাঁচ মাইল হাটিবার অভ্যাস রাখ, বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য হইলে ঈশ্বর পা দিতেন না ; যদি পায়ের সদ্ব্যবহার না কর, তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে এবং পরে যদি তোমার কোন সন্তান জন্মে, তাহা হইলে তাহার পদদ্বয় বলহীন হইবে ; যদি বিপদে পড়িয়া হাটিবার আবশ্যক হয়, তখন পারিবে না, কাঁদিয়া ভাসাইবে।

ঘোড়ায় চড়িবার অভ্যাস রাখ ; অন্য যান অপেক্ষা অশ্বযানে স্বাধীনতা আছে, কারণ অশ্ব তোমার ইচ্ছামত দ্রুত বেগে চলিবে, মনুষ্য যানে তাহা হইতে পারে না, শঙ্কা আছে, কারণ মানুষ পরের পরামর্শ শুনে। যাহাতে নিজের প্রজাবর্গের মনস্তুষ্টি হয়, তাহাদিগের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, ও সন্তানেরা সুশিক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা কর। তুমি তোমার জমিদারীর দেওয়ান হইয়া মাস মাস উপযুক্ত বেতন লও ; বেতন সমষ্টি মোট আয়ের চতুর্থাংশ না অতিক্রম করে, তদ্দ্বারা তোমার সন্তান সন্ততির ব্যয় নির্ব্বাহ কর। বৎসর বৎসর আয়ের চতুর্থাংশ সঞ্চিত হউক, তাহা হইলে অভাব তোমার নিকট আসিবে না।

যদি ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনকে

একটা প্রকৃত জমিদার-সমিতি করিতে চাও, তবে, উহাকে চিন্তার সমিতি না করিয়া একটা কার্য্যের সমিতি করিতে চেষ্টা কর। নিয়ম কর যে, পাঁচ হাজার কিংবা ততোধিক আয়ের ধনী, বা জমিদার উহার সভ্য হইতে সমর্থ, বৎসর বৎসর অন্ততঃ একবার সাধারণ সভা বসুক, সাধারণ সভার ভোটের দ্বারা তিন কিম্বা দুই বৎসরের জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত হউক, মন্ত্রী নিজের অভিপ্রায় মত সদস্য নিযুক্ত করিয়া একটা ক্যাবিনেট করুন। মন্ত্রী স্বয়ং ও সদস্যেরা সকলেই বেতন পাইবেন, তাহারা একটা বোর্ডের ন্যায় জমিদারদিগের ম্যানেজার হইবেন। ক্যাবিনেটের মেম্বরেরা প্রত্যেকে দুই তিনটা জেলার ভার লইবেন, মন্ত্রী তৎসাধারণের উপর তত্ত্বাবধারণ করিবেন। প্রত্যেক সভা-ভুক্ত জমিদার বৎসরের আয় ব্যয়ের বজেট এই সভা হইতে পাশ করাইয়া লইবেন ও তদনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। জমিদারদিগের বার্ষিক উদ্বৃত্ত টাকা হইতে কিয়ৎ পরিমাণ একত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বোর্ড বা ম্যানেজিং বডি দুই এক মাইল রেল, ষ্টিমার, ট্রামওয়ে কিম্বা কাপড়ের বা কাগজের কল খুলিবেন। যদি এরূপ করিতে পার, তাহা হইলে তোমরাও জীবন প্রাপ্ত হইবে, গবর্ণমেণ্টের নিকট মান্য পাইবে ও দেশের উন্নতি হইবে।

যদি এরূপ করিতে পার, তাহা হইলে এই সভার দ্বারা জমিদারীর বাটওয়ারা ও জরিপ ও বাড়ী প্রস্তুত মেরামত ইত্যাদি হইতে পারে। এমন দিন আসিবার সম্ভাবনা, যখন গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ডের হাঙ্গাম নিজের স্কন্ধ হইতে এই সভার স্কন্ধে দিতে পারেন; নাবালকদিগের শিক্ষা-দমনের ভার এই সভা লইতে পারেন। বিভাগীয় মেম্বরগণ রাজকীয় বিভাগের কমিসনার স্বরূপ কার্য্য করিবেন এবং স্থানীয় জমিদার তদীয় বিভাগীয় মেম্বরের অধীনে কলেক্টর হইয়া থাকিবেন। এরূপ না করিলে ব্রিটিস-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সম্ভ্রান্ত লোকের সমিতি হইলেও একটা ফাঁকা কথা মাত্র; কারণ বিনা কার্য্যের সভার কোন গুরুত্ব হওয়া অসম্ভব।

তোমাদিগের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট টাকা ধার করিয়া তদ্দ্বারা রেলওয়ে করিতেছেন, রেলওয়ের উৎপন্ন হইতে মোটা মোটা বেতনের দ্বারা কতকগুলি ইংরাজ প্রতিপালিত হইতেছে, তোমরা সুদ পাইতেছ, ইহা বাদেও গবর্ণমেণ্টের মুনফা থাকিতেছে, এ দেশের জন কতক কেরাণী, মুটিয়ায় যাহা পায়, সে অতি সামান্য। যদি টাকা ধার না দিয়া তোমরা সমবেত হইয়া রেল করিতে, তাহা হইলে চারি টাকা সুদের স্থলে পাঁচ টাকা সুদ পাইতে ও তোমার দেশের কতকগুলি লোক সম্ভ্রান্ত-উপজীবিকা লাভ করিতে পারিত। রেলওয়ে ছাড়া এরূপ কত বিষয় আছে, তাহা একটু চিন্তা করিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, বলিতে গেলে কথা বাড়িয়া যায়।

মধ্যবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যস্থায়ী পদ; কার্য্য অশেষ। জনসাধারণের শিক্ষা-বিধান করা, শ্রমজীবীদিগের শ্রমজাত দ্রব্য সকল পরিমিতরূপে বণ্টন করা, উদ্বৃত্ত মালামাল বিদেশে লইয়া বিক্রয় করা, ও তথা হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য আনয়ন করা, রেল, টেলিগ্রাফ, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি যন্ত্রের কার্য্য চালান, দলবদ্ধ শ্রমের কার্য্য তত্ত্বাবধান করা, রাজ্য রক্ষা করা, চিকিৎসা করা, রাস্তা

পুল অট্টালিকাদি প্রস্তুত করা ইত্যাদি। যুদ্ধ স্থলে যাও, দেখিবে তথায় মধ্যবর্ত্তী সেনাপতি একাকী সহস্র সৈনিক পুরুষের বল সঞ্চার করিতে সমর্থ; বিচারালয়ে যাও, তথায় দেখিবে, মধ্যবর্ত্তী বিচারক, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা ন্যায়ান্যায় অবধারণ পূর্ব্বক বাদী প্রতিবাদীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতেছেন; সমুদ্র মধ্যে যাও, দেখিবে, মধ্যবর্ত্তী পোতাধ্যক্ষ, আবশ্যক মতে নানা দেশে নানা বন্দরে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

এ দেশের মধ্যবর্ত্তী লোকেরা ইংরেজদিগের অভ্যুদয়ে অনেকগুলি উপার্জ্জনের পথ হারাইয়াছে। রাজকীয় উচ্চ কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারে না, ঔষধ প্রস্তুত ও চিকিৎসা ব্যবসায় হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, সামরিক বিভাগের উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আরও কত প্রকারে ইহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ হইয়াছে। যখন প্রথমতঃ ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়, তখন ভাবিয়াছিল, শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হইবে, বস্তুতঃ প্রথম প্রথম শিক্ষিত লোকেরা যেরূপ দ্রুতবেগে রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সকলেরই মনে এক অদ্ভুত আশার সঞ্চার হয় যে, শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে; এজন্য বহুসংখ্যক মধ্যবর্ত্তী লোক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষার দিকে ধাবিত হয়। এক্ষণ দেখিতেছে, সে আশা মরীচিকার মোহ মাত্র; এই দারুণ হতাশের আঘাতে আজ মধ্যবর্ত্তী লোক শয্যাগত; শিক্ষা প্রণালীর দোষে শিক্ষিত সাধারণের দেহ আছে বটে কিন্তু শক্তি নাই; শিরঃপীড়া, অম্লরোগ, বা হৃদ্রোগে সকলেই জর্জ্জরীভূত; পরিশোভিত মস্তিষ্ক আছে, বিশুদ্ধ চরিত্র আছে, কিন্তু দেহ নাই বলিয়া কেরাণীগিরি ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই।

চাকরির প্রতি এতটা আশা স্থাপন করা বিধেয় হয় নাই; পরিশ্রমের অভ্যাস ছাড়িয়া যে ঝকমারি করিয়াছ, তজ্জন্য অনেক অশ্রুপাত করিতে হইবে। যদি শারীরিক পরিশ্রম অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম অধিক হয়, তবে সে দেহ রক্ষা হওয়া অসম্ভব। আজকাল শারীরিক-শ্রমের আবশ্যকতা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে; স্থানে স্থানে স্কুল সমূহে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, ছাত্রদিগকে ব্যায়ামের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। ইহাতে কালক্রমে শিক্ষিতদিগের দৈহিক অসামর্থ্য দোষ অপনীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মধ্যবর্ত্তী সাধারণের দুঃখের মুখ্য কারণ অপরিমিত বিদেশীয় শ্রম ক্রয়। যদি কোন ব্যক্তির উপার্জ্জন অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে তাহার পতন যেমন অনিবার্য্য, একটা জাতির পক্ষেও সেই নিয়ম প্রবল; অর্থাৎ যদি কোন জাতির শ্রম (Labor) অপেক্ষা ক্ষয় (Consumption) বেশী হয়, তাহা হইলে সে জাতির দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। তোমার দেশের ভরণ পোষণ চলিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহাই তোমার শ্রমস্তূপ; ঠিক এই স্তূপটীর বিনিময়ে যদি তুমি বিদেশীয় শ্রম ক্রয় কর, তাহা হইলে তোমার অবস্থার তারতম্য হইবে না, কিন্তু যদি এরূপ পরিমাণে শ্রম ক্রয় কর যে, ঐ স্তূপ শোধ না হইয়া আরও কিছু দিতে হয়, তবে তোমার অনাটন রোধ করিবে কে?

ভয়ঙ্কর বিদেশীয় শ্রমের ঋণ পরিশোধ করিতে গিয়া তুমি দেশের পতিত জঙ্গলময় জমিগুলি পর্য্যন্ত চাস করাইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কূল পাইলে না, চাকরিতে পেট ভরিল না, ব্যবসায়ে পেট ভরিল না, কৃষিতে পেট ভরিল না; যেন একটী প্রতপ্ত কটাহের উপর বাস করিতেছ, যে রস টুকু পড়িতেছে, অমনি সেই খানে শুকাইয়া যাইতেছে, ইহার কারণ কি! কারণ সংক্ষেপে উপরে বলিয়াছি, আবার সবিস্তরে বলিতেছি। মধ্যবর্ত্তী সাধারণের শতকরা একজনে চাকরি পাইয়াছে কিনা সন্দেহ, সেই যাহা পাইয়াছে তাহাও চাকরির মত চাকরি নহে, প্রায়ই কেরাণীগিরি ও চাপরাসীগিরি; ব্যবসায় বাণিজ্য যাহাকে বলে, তাহার ছায়াও তোমার স্পর্শ করিবার যো নাই; স্বদেশীয় বাণিজ্যে ব্যক্তি বিশেষের উন্নতি হইলে হইতে পারে, কিন্তু জাতির উন্নতি হইতে পারে না; বিদেশীর বাণিজ্য (যদ্দ্বারা জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে) সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর হস্তে রহিয়াছে। তোমার দেশের যে জিনিস বিদেশে যায়, তাহা তুমি দেশে বসিয়া বিদেশীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাক; ও বিদেশ হইতে যে দ্রব্য তোমার দেশে আসে, তাহা বিদেশীয়েরা আনিয়া তোমার হাতে পৌছাইয়া দেয়, সুতরাং আমদানি রপ্তানির যে মধুটুকু, তাহা তোমার হাতছাড়া; তুমি দেশে বসিয়া হাতে পাইয়া নানা স্থানে ছড়াও, তাহাতে কি হইতে পারে? তুমি বিদেশীয় সওদাগরের ফ'ড়ে বৈত নও! যদি তুমি তোমার দেশের মাল বিদেশীর দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতে'পারিতে, তাহা হইলে তাহার দেশের মালের মুনফাও তুমি পাইতে, বাণিজ্যের প্রকৃত ফললাভ করিতেও পারিতে।

হণ্টার সাহেবের ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণী অনুসারে তোমার বার্ষিক রপ্তানি ৭০ কোটী টাকা ও আমদানি ৬০ কোটী, ইহা হইতে তুমি এক কথায় বুঝিয়া লইতে চাও যে, রপ্তানি যখন ১০ কোটী বেশী হইল, তখন, বাণিজ্যে তোমার ১০কোটী টাকা মুনাফা হইতেছে; কিন্তু বৎসর বৎসর তোমাকে যে ১৪ চৌদ্দ কোটি টাকা হোম চার্জ স্বরূপে দিতে হয়, তাহা কোথা হইতে দিবে? বেতন ও ব্যবসায়ের মুনাফা স্বরূপে বৎসর বৎসর যত টাকায় বিদেশীর শ্রম ক্রয় করিতেছ, তাহার মূল্য কোথা হইতে দিবে? প্রতি বৎসর যে ৮ কোটী টাকার কেবল ধান ও গম তুমি বিদেশীর নিকট বিক্রয় কর, তাহা থাকিলে সমস্ত ভারতবাসীর ১০ দিন চলিত, অথবা ৫৫ লক্ষ লোকের এক বৎসরের খোরাক চলিত। আমাদিগের রপ্তানি দ্রব্য সকল আয়তনে বেশি; মূল্যে হীন; আমাদিগের পাঁচ জাহাজ তুলার বিনিময়ে আমরা এক জাহাজ কাপড় পাইলেও আমাদিগের পাওনা শোধ হইয়া আরও ঋণী হই। এরূপ অবস্থায় ইংরেজদিগকে এদেশে অনেক খালি জাহাজ আনিতে হইতেছে,সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট চক্রান্ত করিয়া ইংলণ্ডকে আমাদিগের লবণের যোগানদার করিয়াছেন।

ভূমির শস্য কৃষকের সম্পত্তি; ভূমির কর তোমার সম্পত্তি; বাণিজ্যের তুফানে শস্যের মূল্য যে পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে, করের পরিমাণে সে অনুপাতে বৃদ্ধি হয় নাই, অথচ সভ্যতার হিল্লোলে পড়িয়া তোমার ব্যয় অশেষ প্রকারে বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে

নারিকেল কোরা ও গুড় উপাদেয় খাবার-ছিল, এক্ষণ সন্দেশ রসোগোল্লা না দিলে মান থাকেনা; পূর্ব্বে জুতা লাগিত না, এক্ষণ নগ্ন পায়ে কোথাও যাওয়া অসাধ্য; পূর্ব্বে তালপাতার ছাতায় চলিত, এক্ষণ কাপড়ের ছাতা প্রচলিত; দুই আনার স্থলে পাঁচশিকা লাগিতেছে। এক্ষণ জামা ইকিনের চলন হইয়াছে, উহা পূর্ব্বে ছিল না। মোটা গজীতে পূর্ব্বে শীত মানাইত, এক্ষণ দোলাই পশমী কাপড়,বিলাতী আলোয়ান চলিতেছে। পূর্ব্বে যেরূপ হাটিয়া যাতায়াত করিতে, এক্ষণ তাহা কর না, কথায় কথায় মোকর্দ্দমা মামলা কর, তাহাতে বহুতর অর্থ নষ্ট হয়। পূর্ব্বের ব্যবহার ছাড়িয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছ, সভ্য হইয়াছ, তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু এই সকল নূতন অবলম্বনগুলি যদি স্বদেশীয় পদার্থ হইত, তাহা হইলে তোমার আজ এরূপ মুমূর্ষ দশা দেখিতাম না। এই গেল নূতন নূতন ব্যয়বৃদ্ধির কথা।

পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার ছিল, এক্ষণও তাহাই আছে, অথচ সেই সকল দ্রব্যের মূল্য তোমার অজ্ঞাতসারে বৃদ্ধি হইয়া তোমাকে একেবারে দরিদ্র করিয়া ফেলিয়াছে। ১২৪০ শালে অথবা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাচি তেলের সের সাত পয়সা আট পয়সা ছিল; দুই পয়সা লবণের সের ছিল; কাঁচি দশসেরা কাঠার (পালির কিংবা খুঁচির) চব্বিশ কাঠা করিয়া ধান এক টাকায় বিকাইত; বোঝার হিসাবে চৌদ্দ বোঝা ও আটির হিসাবে সাড়ে তিন হাজার আটি করিয়া খড় (কিংবা কুটা) এক টাকায় মিলিত, এক শত বিশ তোলার সেরের বারসের করিয়া দুদ ও দুইসের করিয়া ঘৃত এক টাকায় পাওয়া যাইত; সুন্দর-বন প্রদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা একসের তেলের বিনিময়ে একসের ঘৃত পাইত। মায় খোরাক ছ পয়সা কোথাও বা আট পয়সা দিলে সমস্ত দিন একজন মজুর খুসি হইয়া কাজ করিত, জলখাবার পর্য্যন্ত চাহিত না; চারি আনা বেতন ও খোরাক পোষাক দিলে একজন রাখাল মিলিত; ষোলসের চাউলে এক সের দিলে ভাড়ানীরা ধান ভানিয়া দিত, আট আনা রোজায় দুই জন জেলে পাটকে নৌকা সমেত এক রাত দিন খাটাইতে পারিতে। দশটি পৌষ্য বিশিষ্ট একটী পরিবারের কাপড় বার্ষিক এক টাকায় কাচা হইত, ধোপা তাহাতে কৃতার্থ থাকিত, নাপিত বার্ষিক এক টাকায় খুসী থাকিত, হাড়ি একটা আদ পয়সা, কলসী একটা এক পয়সা ছিল, সরা মালসার দাম লাগিত না, একটা হাড়ি কিনিলে সেই সঙ্গে একটা পাওয়া যাইত। জ্বালানি কাঠ কেহই প্রায় কিনিত না, কোষ্টার কোন কোন স্থলে একে বারেই মূল্য ছিল না, কোথাও এক পয়সা দেড় পয়সা সের বিক্রয় হইত। ভাল ভালুকা বাঁশ একটা দেড় পয়সা দু পয়সায় পাওয়া যাইত। এই সমস্ত বিষয়েরই মূল্য এক্ষণ চারগুণ ছয়গুণ ও কোন স্থলে আট গুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে বগাইতেরা তোমার বাড়ীতে ধান তুলিয়া মলিয়া তোমার অংশ তোমার বাড়ীতে রাখিয়া নিজের অংশ লইয়া যাইত, এক্ষণ তাহারা নিজের বাড়ীতে তোলে, ধান গুলি দিয়া যায়, পলগুলি তোমায় আনিয়া লইতে হয়।

আবার দেখ,তুমি পূর্ব্বে যেরূপ পরিশ্রমী ছিলে, এক্ষণ তাহা নাই। পূর্ব্বে নিজের জমি

সকল চিনিতে, সীমানা চৌহদ্দি জানিতে, এক্ষণ সে ক্লেশ ছাড়িয়া দিয়াছ। নিজে জমি কোপাইয়া নিজ ব্যবহারের তরকারি সকল প্রস্তুত করিতে, ঘর একখানা বাঁধিতে হইলে, নিজে তাহার সাজ প্রস্তুত করিয়া চাল বাঁধা পর্য্যন্ত সারিতে, বেড় ঘেরা বা বেড়া বাঁধা কিম্বা পরছত্রের চাল প্রস্তুত করার জন্য কখনও জন বা কৃষাণ লইতে না, গোরু নিজে রাখিতে, জাবনা দিতে, দুহতে, যোগান দুদ তৈল লবণ নিজে লইয়া আসিতে, জেলে বা নিকারীর বাড়ী কিংবা বাঁধাল হইতে মাচ কখনও চাহিয়া কখনও পয়সা দিয়া আনিতে; এখন এ সমস্তই তোমার অসাধ্য, লোক রাখিতে, পার এরূপ পয়সা নাই, নিজে করিতেও মান হানি ভাব, সুতরাং তোমার উপায় কি? এ সকল না করাতে তোমার যে সময়টা বাঁচে, তাহা যদি কোন অর্থজনক কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার এত অচল হইত না, তাহা যখন পার না, তখন তোমার নিজের কাজ নিজে করাটা হেয় বোধ করা কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

কেহ কেহ সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া সহরের চাকুরে হয়; সহর হইতে তাহারা পল্লীগ্রামে সভ্যতা আনিতে আরম্ভ করে; সেই সভ্যতার সঙ্গে শ্রমত্যাগ, পরিচ্ছদের পরিপাটী ও তাস ইত্যাদি গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে। স্মরণ হইতে পারে, এক সময়ে তাস ও গান বাজনায় পল্লীগ্রাম প্রতিধ্বনিত ছিল। যখন সেই অবস্থায় অননুমোদিত ক্রীড়া ও নৃত্যগীতে মত্ত হইয়াছিলে, সেই শ্রমত্যাগের সময় হইতে তোমাদিগের পতনের সুরু হইয়াছে। উৎসবে মত্ত থাকিয়া ঋণী হইয়াছিলে, সেই ঋণে এক্ষণও জড়িত আছ। এখন তুমি গলিত পত্রের ন্যায় লঘু, বায়ুতে যে দিকে লইয়া যায়, সেই দিকে যাও। কখনও পনের টাকা বেতনের কেরাণী হইয়া গলায় কম্ফরটার জড়াইয়া, মাথায় পমেটম লেপিয়া বসিয়া থাক, কখনও ছয় টাকা বেতনে দোকানের মুহুরি হও, কখনও বা তিন টাকা বেতনের তহসিলদারী কর, আবার কখনও বা কাজকর্ম্ম নাই, ডাকে দরখাস্ত দেও, হয়ত কখনও ধার ধোর করিয়া পাঁচ টাকা খোরাকী লইয়া উমেদারভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ কর। অনাহারে ন্যূনাহারে শরীর শীর্ণ, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, দেহে তেজ নাই, সন্তান জন্মিল না, যদি জন্মিল তাহা বাঁচিল না; কর্জ্জ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলে, সে ঋণ সঙ্গের সাথী হইল; চালে খড় নাই, অচ্ছিন্ন বস্ত্র নাই, এরূপ অবস্থায় কি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাক, বুঝা যায় না।

অবোধ বিদেশীর নিকট তোমরা (মধ্যবর্ত্তীরা) নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদিগের যে স্বাভাবিক যোগ্যতা আছে, তাহা বিলুপ্ত হয় নাই; চন্দনখণ্ড যেখানেই রাখ, আদর কর আর নাই কর, তাহার সৌরভ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না, কারণ সুগন্ধ তাহার পরমাণুর সহিত বজনির্ম্মিত তন্তুদ্বারা গ্রথিত; সেইরূপ, অনাদৃত হও আর আদৃত হও, তোমরা যাহা তাহা থাকিবেই। প্রফুল্ল মধ্যবর্ত্তী লোক যেখানে অবস্থিতি করে, সেখানকার শ্রমজীবীও অবশ্যই প্রফুল্ল হইবে, কারণ, মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে বহুবিধ পদার্থের প্রয়োজন হয়,

তাহার প্রধান সমস্ত গুলিই মধ্যবর্ত্তীর আয়ত্ত এবং শ্রমজীবীর শক্তির অতীত। মধ্যবর্ত্তী যে সৈন্যের সেনাপতি নহে, সে সৈন্য কদাচ কোন যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে না; কোন রাজ্যের শান্তি মধ্যবর্ত্তী ব্যতিরেকে রক্ষিত হইতে পারে না। যদি কেহ বলে যে, অমুক দেশের গবর্ণমেণ্ট সুচারুরূপে চলিতেছে, তাহা হইলে ইহাও সপ্রমাণ হয় যে, সেই গবর্ণমেণ্টে তত্রত্য মধ্যবর্ত্তীদিগের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এ দেশের সুশাসনের সম্পূর্ণ যশ টুকু ইংরেজেরা লইতে ইচ্ছুক. কিন্তু সে কৃতকার্য্যের মূল যে তোমাদিগের সহায়তা, তাহা জগৎ দেখিতেছে। তোমরা এ গবর্ণমেণ্টের লুপ্তনামা সেনাপতি, লুপ্তনামা মন্ত্রী, বস্তুতঃ মেরুদণ্ড, প্রত্যেক আইনের অভিপ্রায় তোমরা পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে কর্য্যে পরিণত করিতেছ, এজন্য তাহার উদ্দেশ্য বিকীর্ণ হইতেছে। ঈদৃশ ক্ষমতাশালী হইয়াও কেন যে কীটস্য কীট হইয়া রহিয়াছ, তাহার প্রধান কারণ এই যে, দেশবাৎসল্য সম্বন্ধে তোমরা এক প্রকার ইহুদী হইয়া দাঁড়াইয়াছ। ইহুদী যখন যে দেশে থাকে, তখন সেই দেশকেই নিজের দেশ মনে করে, জেরুজ্যালমের জন্য তাহার প্রাণ কাতরায় না; তোমার এই দোষ দাঁড়াইয়াছে যে, তুমি যখন যে বিষয়ে থাক, সেই বিষয় আত্মকে একেবারে আহুতি দিয়া বসিয়া যাও, দেশের কথা কিছুই মনে পড়ে না।

নিজের দেশ ভুলিতে ভুলিতে তুমি এতই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছ যে, তোমারও কখনও কখনও স্বদেশীকে "কাল" বলিতে ইচ্ছা হয়। স্বদেশীয় পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দিয়া বিদেশীর পরিচ্ছদ পরিতে চাও, কিন্তু হাঁসের মধ্যে বক যে মিস খায় না, ইহা তুমি নিজের প্রণীত গ্রন্থে শত স্থানে উল্লেখ করিয়াছ *। দেশের সুখাদ্য ক্ষীর অপেক্ষা বিদেশী (Condensed milk) ঘনীভূত দুগ্ধ তোমার উপাদেয়; টাট্‌কা সুজী অপেক্ষা টিনের বিশকুট সুস্বাদু। তোমার উদরে অন্ন নাই, চালে খড় নাই, কিন্তু পায়ে ষ্টকিং দেওয়াই চাই, গলায় একটা কম্ফরটার জড়ান চাই, মাথায় একটু পমেটম মাখান চাই, নিজ দেশের শিক্ষা নাই বলিয়া কি এমন করিয়া পরকীয় দ্রব্যের শ্রাদ্ধ করিতে হয়! এরূপ বিভ্রান্ত ভাবে চলিলে তোমার কিস্তী বানচাল হইবে না কেন?

যে জাতি বিদেশীয় বিলাস দ্রব্য ক্রয় করে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী; তোমার দেশকে ঈশ্বর কোন অভাবের দ্বারাই কলুষিত করিয়া সৃষ্ট করেন নাই, কিন্তু নিজের বুদ্ধির দোষে তুমি, বিলাস দ্রব্য কেন, জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্য পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে কিনিতেছ। লোণা জলে তোমার দেশ পরিবেষ্টিত, কিন্তু তুমি লবণ কেন বিদেশীর নিকট, তোমার তুলায় ইংলণ্ড আচ্ছন্ন. কিন্তু কাপড় কেন ইংলণ্ডের নিকট, বিদেশীর বস্ত্রে সজ্জিত হইতে তোমার অনুমাত্রও লজ্জাবোধ নাই, গ্লানি বোধ নাই। কখনও যে নিজে কল করিয়া আত্মবশ হইবে, এরূপ প্রতিজ্ঞা নাই, মোহের খরতর স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া কোন সমুদ্রে যাইতেছ, তাহার ঠিকানা নাই।

* যাঁহারা সরকারী কার্য্যের অনুরোধে পরকীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, অথচ কর্ম্মান্তে নিজ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন. তাঁহাদিগকে নিন্দা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

এই সকল অবোধতা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা কর, পরিশ্রম করিতে শেখ, উন্নতি কখনও আপনা হইতে গায়ে উড়িয়া পড়িবে না, তাহার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে। সচ্চরিত্র, সত্যবাদী ও শ্রমশীল হইবার আবশ্যকতা এক্ষণ যেরূপ বাড়িয়াছে, এরূপ কোন কালে ছিল না। তোমার গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় বলিয়া ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নহে, কারণ তোমার অদ্যাপি আত্মত্ব-বোধ জন্মে নাই; তুমি যদি যোগ্য হও, বিনা চেষ্টায় এ গবর্ণমেণ্ট তোমার হস্তে আসিবে। একজন আদর্শ ইংরেজের সহিত তোমার একজন আদর্শ স্বদেশীকে তুলনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, কত দোষে তুমি এক্ষণও আচ্ছন্ন রহিয়াছে। তুমি যদি তোমার স্বদেশীর নিকট বিদেশীর অপেক্ষা পরিশ্রমী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পার, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী যুঠিয়াও তোমার সৌভাগ্যের গতিরোধ করিতে পারিবে না। আর যদি অযোগ্য থাকিয়া তুমি আজ ইংরেজকে কোন কৌশলে অপসারিত কর, তাহা হইলে অবিলম্বে রুষ কিংবা ফরাসী তোমার শিরে দণ্ডায়মান হইবে।

খোলাভাটীর জন্য তুমি গবর্ণমেণ্টের প্রতি তীব্র দোষারোপ করিয়া থাক, কিন্তু তুমি খাও কেন? গবর্ণমেণ্ট তোমাকে খাইতে বলে নাই, তোমার সম্মুখে দোকান হইয়াছে, তুমি না ফিরিয়া চাহিলেই পার; শতবর্ষ ইংরেজগণ তোমার দেশে অবস্থিতি করিতেছে, নানাবিধ মিষ্টান্নে তোমার দোকান শোভিত রহিয়াছে, কৈ ইংরেজ ত তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। তুমি যদি সুরা প্রচলনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে নিন্দা কর, মৎস্যেরাও বড়শীওয়ালাদিগকে নিন্দা করিতে পারে। ইংরেজ-চরিত্রের নিকট তোমার চরিত্র সহস্র বিষয়ে পরাস্ত, তুমি তাহার সার না বুঝিয়া অসারের অনুকরণে ব্যস্ত। তুমি একজন দোষীকে সহজেই নির্দ্দোষী বলিতে সম্মত হও; রোগীকে নীরোগী এবং নীরোগীকে রোগী বলিতে পার, কিন্তু ইংরেজের দ্বারা এরূপ করান সহজ নহে। একজন ইংরেজ তোমাকে সেকহ্যাণ্ড করিলে তুমি নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্পত্তি ভুলিয়া এতই পুলকিত হও যে, আমি তাহাতে তোমার ক্ষুদ্রতা না স্বীকার করিয়া পারি না, কারণ মানহীন লোকেই সামান্য অভ্যর্থনায় গলিয়া যায়।

এ সকল দুর্ব্বলতা ও ভ্রম ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত পথে বিচরণ করিতে অভ্যাস কর; ভর্গী অনিশ্চিত ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকা আর বিধেয় হইতেছে না। শান্তি-রক্ষার গুরুতর ভার যখন অন্যের স্কন্ধে রহিয়াছে, তখন যদি শুইয়া থাক, তাহা-হইলে উন্নতির চেষ্টা করিবে কবে? পরের কাপড় পর, পরের লবণ খাও, পরের কেরছিন তৈল পোড়াও, পরের কৃত ছাতা মাথায় দেও, পরের দেসলাই জ্বাল, পরের মদ আফিং ব্যবহার কর, পরের খেলনা খেলাও, পরের রেলে ষ্টিমারে চড়, ইহাতেই তুমি ঘোর দরিদ্র। এ সকল তোমার স্বেচ্ছাধীন ব্যয়, এজন্য বলি, এ সকলের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টাকর! যে ৩ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া অনর্গল দেশের হিত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে পারে, তাহার অপেক্ষা, যে আমাদিগকে ক্ষুদ্র একটা আলপিন সম্বন্ধে আত্মবশ করিতে পারে, সে বেশি দেশ-হিতৈষী। শিল্প-সম্বন্ধীয় পরাধীনতা হইতে মুক্তি পাই-

বার জন্য সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর যত্নকরা উচিত। অদ্যাপি আমরা দেসলাইটী পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে পারি নাই, ইহাতে আমরা সমগ্র জগতের নিকট উপহাসাস্পদ হইতেছি। বক্তৃতা দ্বারা টেম্‌স কিম্বা ছিন নদীকে উজান চালাইলে সে কলঙ্কের অপনয়ন হইতে পারে না।

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিবৃত্তি।

যে সুখ পায়, সেই দুঃখ পায়। যে দুঃখ পায় না, সে সুখও পায় না। কখনও গিরি-শৃঙ্গে কখন সাগর গহ্বরে এই এক জনের ভাগ্যে, অন্যে নিরন্তর নিরবলম্ব শূন্যে।

এই দুইটী মধ্যে কোন্‌টী ভাল? এক ফোঁটা সুখের মধু, দুখের গরল রাশীকে পরাস্ত করে। এক মহূর্ত্তের জন্য মনুষ্য অনন্ত কাল জলাঞ্জলী দিতে পারে। এজন্য মনুষ্য সুখ দুঃখ মর্য্যে'ত জীবনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

সুখ দুঃখের প্রসূতি প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি পরিচালিত মনুষ্য ও মনুষ্যের দেবতাগণ। নিবৃত্তি কল্পনায় জন্মে না। মানস-সরোবর-সম্ভূত সে সরোরুহ। প্রবৃত্তির পরিচালনায় কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে সুখ বা দুঃখ। নিবৃত্তি নিষ্কাম, তাহা হইতে কর্ম্ম জন্মে না।

কর্ম্মের স্থিরতা নাই, আবিলতা বিস্তর, অথচ কর্ম্ম যোগের অখণ্ডনীয়তা দেবগণেরও অপরিহার্য্য, প্রতিশ্বাসে কর্ম্ম ভিন্ন হয়। সে কর্ম্মের সুখদুঃখে হৃদয় আমূল আলোড়িত হয়। আত্মার অনন্ত স্থায়িতার সহিত কর্ম্মের অস্থিরতা তুলনা করিলে বালুঘটিকার একটী কণা বলিয়াও বিবেচিত হয় না। অথচ সেই কণা মাত্রে অনন্ত জীবন পঙ্কিল হয়। নিষ্প্রবৃত্ত সন্ন্যাসী তুঙ্গ গিরি শিখরে, স্থির নীল শান্তিময় আকাশে উপবেশন করিয়া নির্নি-মেষ নয়নে জ্যোতির্ম্ময় মানব সন্তানকে জল-বুদ্‌বুদের অন্বেষণে সুদুস্তর পঙ্কে নিমজ্জিত সন্দর্শন করেন। ক্রোধ, ভয়, প্রীতি অনন্ত জীবনে কত বার আবর্ত্তিত হইবে। অথচ যেটী বর্ত্তমানে আছে, সেইটীর উপর মনুষ্য আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারে। যেটী আছে, সেটী না থাকিলে সে দিশেহারা হয়।

প্রবৃত্তির প্রয়াস এক মুহূর্ত্তে চরিতার্থ হয়। সেই মুহূর্ত্তের সুখের পশ্চাতে অনন্ত জীবনের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ। লোকে না জানুক, মান বজায় থাকুক, কিন্তু সে অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণা পরিহার করিবারও উপায় নাই। তথাপি মনুষ্য প্রবৃত্তির পরাধীনতা স্বীকার করে।

কর্ম্মের পরিসর অল্প। কর্ম্মে আপনাকে ও প্রতিবেশী কয়েক জনকে অনুশাসন করে। আপনার ভিতর আপনার অনন্ত পুরুষ। অসীম জগতের অগণ্য জীব আমার কর্ম্মে অনুশাসিত হয় না। কিন্তু আমার জ্ঞানে হইতে পারে। আমার কথা, আমার মত, আমার আদেশ, আমার উপদেশ আমাকে ও আমার প্রতিবেশীকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত জগতে উছলিয়া পড়ে। চিত্র বা কবিতা, মূর্ত্তি বা অক্ষর কর্ম্ম নহে, জ্ঞান। অথবা যাহা কিছু লিখি, অন্যের জ্ঞান হইতে

কর্ম্ম হইতে নহে, তুমি কি কর তাহা লক্ষ্য করি না, তুমি কি বল, তটস্থ হইয়া তাহা অনুধাবন করি। আবার সে জ্ঞান নিরীহ, কর্ম্মের মত সংক্রামক নহে। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি জ্ঞানকে উপেক্ষা করিতে পার, ইচ্ছা হয়, গ্রহণ কর। কিন্তু কর্ম্ম তোমার অনিচ্ছা সত্বে তোমার দেহ মন গরলিত করিবে। প্রবৃত্তি বরফ-রেখা অতিক্রম করে না। যত দূর পৃথিবীর ধূলী বায়ু বলে তাড়িত হয়, প্রবৃত্তির উর্দ্ধগামীতা ততদূর পর্য্যন্ত। অন্ধকার ও ঝটিকা, বরষা ও বরফ, বিদ্যুৎ ও বজ্রের সীমা লইয়াই প্রবৃত্তির সীমা। সত্য বটে সে সীমার মধ্যে শ্যামলা সুজলা ধরণী, তরুলতা ও গাছের পাতা, গোলাপ ও মালতী, কোকিল ও মলয় আছে, কিন্তু সেখানে নীলগগণ ও তারকার রেখা নাই, সেখানে মন্দাকিনী বহে না। যেখানে ভাগিরথীর আবিলময় তরঙ্গ, সে নিম্ন ভূমি। যেখানে অনাবিল প্রসৃতি, সে হিমালয়ের কন্দর ভূমি। জীবনের আরম্ভ, জগতের জরায়ু উর্দ্ধ দেশে। জীবনের সংগ্রাম, পৃথিবীর পরিণাম প্রবৃত্তি পরিসরস্থিত সমতল ক্ষেত্র।

মানব সুখের জন্য লালায়িত। শান্তি ভিন্ন সুখ নাই। যাহা আবেগময়, উদ্বেগপূর্ণ, হৃদয় আলোড়িত করে, তাহা আর কিছু হইতে পারে, সুখ নহে। তাহাতে শান্তি নাই। শান্তি আবেশময়, চির নিদ্রিত। তাহাতে সংগ্রাম নাই, আলোক নাই। রক্ত গরম করিবার জন্য লোকে মদ খায়, মদ মাতালের আবশ্যক। যাহারা উৎসাহের নেশা করে, উৎসাহ না থাকিলে জীবনকে মৃত্যু বলিয়া অনুভব করে, তাহারা কর্ম্মের জন্য প্রয়াস করে। তাহারা লোভ মোহ ক্রোধের অবলম্বন অন্বেষণ করে। স্ত্রী ও সন্তানের কামনা করে, এক জনে তৃপ্ত না হইয়া দশজন অন্বেষণ করে। নির্জ্জনতা সহ্য করিতে পারে না, সমিতি খুঁজিয়া বেড়ায়। চোখ বুজাইতে পারে না, চারি দিকে ঘুরাইয়া বেড়ায়। একটী পদার্থে অনিমেষ সংযোগ তাহাদের প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ, অবলম্বন যত অধিক হয়, একটু একটু করিয়া যত অধিকটা জানিতে পারে, ততই তাহারা আপনাদিগকে সুখী বলিয়া গণ্য করে। মানুষের শরীর রক্তে গঠিত, প্রবৃত্তি শোণিতসম্ভাত। রক্ত মাংসের ক্ষমতা যতক্ষণ অতিক্রম করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ জ্ঞানের মহিমা অনুভূত হয় না। কুয়াসা ও মোহ আদরনীয় হয়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ধূলি বিমিশ্রিত। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য স্থূল। স্থূলতার সৌন্দর্য্য অকিঞ্চিৎকর। কবি, চিত্রকর ও ভাস্করাচার্য্য স্থূলতাকে অতিক্রম করেন। চিত্র প্রকৃতির ফটোগ্রাফ হইলে চিত্রের আদর থাকিত না। কি দেখিয়া গাইডো চিত্র কল্পনা করেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটী কুলীকে ডাকিয়া তাহার মস্তকের আদর্শ করিয়া একটি মস্তক চিত্র করিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনে তাহা কুলির মস্তক বলিয়া অনুভূত হইত, কিন্তু নিরীক্ষণ করিলে বুঝা যাইত, তেমনটী জগতে কাহার নাই। কবি যে চিত্র কল্পনা করেন, তাহার আদর্শ জগতে নাই। প্রকৃতিকে যে যত অতিক্রমণ করিতে পারে, সে তত উচ্চদরের মনীষা। প্রাকৃত কবি অনেক, কিন্তু অপ্রাকৃত কয়েক জন আছে বলিয়া জগতে বাস করা সাধ্য।

ইন্দ্রিয়ের স্থূলতা অতিক্রম করিতে

প্রবৃত্তির সাধ্য নাই। প্রকৃতির গহ্বর ও আলবালে প্রবৃত্তি প্রবাহিত। নিবৃত্তি স্থূলতাকে অতিক্রমণ করিয়া সৌন্দর্য্য অনুভব করে, প্রবৃত্তিপরায়ণ বিলাসীর ভাগ্যে তাহা ঘটেনা। এজন্য প্রবৃত্তি তাহার অস্তিত্বও স্বীকার করে না। প্রবৃত্তি, দেবতাকে স্থূল প্রতিমায় পরিণত করে, নিবৃত্তি রূপ ও আকার উড়াইয়া দিয়া অলখ ও অরূপ বলিয়া ধ্যান করে। নামের যে মধুরতা, তাহা প্রবৃত্তির অনুভব করিবার সাধ্য নাই। নিবৃত্তি একটী নামের মধ্যে বিশ্বের সকলি দেখিতে পান। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহার যে সৌন্দর্য্য দেখে, তাহা ভালবাসার নাই। তাই সে তাহার জন্য পাগল।

প্রবৃত্তি বর্ত্তমানে ব্যস্ত। নিবৃত্তি অতীত ও ভাবিষ্যৎ-পরায়ণ। বর্ত্তমান তাঁহার অতীত কারণ ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের চিন্তনীয়। প্রবৃত্তির ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা নাই। যাহা কেহ দেখেনা, শুনেনা, যাহার কেহ তত্ত্ব লয়না, নিবৃত্তি তাহারই অনুসরণ করেন। কারণ,তাঁহার চক্ষে সেই গুলিই উজ্জ্বল। যাহা সকলের নিকট সুন্দর বা উজ্জ্বল, তাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা। নিবৃত্তির দৈবজ্ঞতা এইরূপে ঘটে। লোকে যাদুকর বা প্রতারক বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করে।

মানুষের সৃষ্টি করিবার সাধ্য নাই। সৃষ্টি কার্য্যের যে অদ্ভুত আনন্দ,তাহা মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু সৃষ্টির পরেই আবিষ্কার। সৃষ্টি প্রথম, আবিষ্কার দ্বিতীয়। নিবৃত্তিপরায়ণ মনুষ্য অন্যের অগ্রাহ্য অলীকতার মধ্যে নূতন নূতন আবিষ্কার করেন, তখন স্থূলদর্শীর দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হয়। উন্নতি নিবৃত্তি-মূলক।

সকলে নিবৃত্তি-পরায়ণ হইতে পারে না। নিবৃত্তির পদাঙ্কচারী প্রবৃত্তি। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ চিরকাল থাকিবে। একজন শিখাইবে, দশজন শিখিবে। একজন রোপিবে, দশজন তাহার ফল ভোগ করিবে, একজন আবিষ্কার করিবে, দশজন তাহা দেখিবে। আজ গুরু যেখানে, কাল শিষ্য সেখানে উপস্থিত হইতে পারে। আজ নিউটন যাহা জানেন, কাল মাঠের রাখাল তাহা শিখিতে পারে, কিন্তু সেই কালিকার দিনে গুরু আবার কত অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার গুরুত্ব চিরদিনই বজায় থাকিবে। যেদিন সকলেই গুরু হইবে, শিষ্য থাকিবেনা, সকলেই শিখাবে, কেহ শিখিবে না, সে দিন উন্নতি অবরুদ্ধ হইবে, বিশাল প্রশস্ততা অন্ধকূপে পরিণত হইবে। সাম্য অব্যাচীনের প্রলাপ।

যে দিন নিবৃত্তি উপেক্ষিত হইবে, সকলে প্রবৃত্তিপরায়ণ হইবে, যে দিন জ্ঞান ভাবের রাজ্য হইতে দূরীভূত হইবে, তুফানে শান্তি থাকিবে না, ঝটিকায় নীলগগনে অদৃশ্য হইবে, আঁধার ধ্রুবতারা ঢাকিয়া ফেলিবে, যে দিন প্রতিমা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অরূপ অলসশূন্যে পর্য্যবসিত হইবে, যে দিন কাব্য ইতিহাসে ও চিত্র প্রকৃতিতে পরিণত হইবে, সেই দিন প্রলয় ঘটিবে।

সুখ সুখ! সত্যই কি সুখ জলবুদবুদ, দূর হইতে দেখিতে ভাল, পাঁচরঙ্গে খেলা করে, কিন্তু হাতে ধরিলেই ভাঙ্গিয়া যায়? না। ভালবাসায় সুখ নাই, স্নেহে সুখ নাই, বিজয়ে সুখ নাই। সুখে দুঃখ নাই, দুগ্ধ ও নবনীর ন্যায় সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত নহে। প্রবৃত্তি মার্গে সুখ ঘটে না। উত্তেজনা ঘটিতে পারে। মত্তা জন্মিতে পারে,

নেশ্য হয়। সুখ মিলে না, খুঁজিতে হয় না। সুখ একটী পদার্থ নহে। আত্মার অবস্থা বিশেষের নাম সুখ। বহিরিন্দ্রিয়ের সন্ন্যাসে ও অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রমবিকাশে সে অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তাহা অচল, অনন্ত স্থায়ী, তাহা শূন্য নির্জীবতা নহে। প্রবৃত্তির নিকট যাহা আশা করি, প্রবৃত্তির নিকট তাহা পাওয়া যায় না, নিবৃত্তির আশ্রয়েই তাহা পাওয়া যায়। প্রবৃত্তি মেকি জহরের আকর।

Happiness is the last state of being; it is centered in a soul to which all passion is unknown.

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

ইংরাজ শাসনে বঙ্গসাহিত্য। (৮ম)

শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ পর্য্যন্ত "কণ্ঠমালা" ও "মাধবীলতা' নামক দুই খানি উপন্যাস, "জাল প্রতাপচাঁদ" নামক একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর পর ইনি কয়েক বৎসর বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার উপন্যাস দুই খানি বঙ্গভাষার অমূল্য সম্পত্তি। এরূপ গভীর চিন্তাপূর্ণ, সুরুচিসঙ্গত উপন্যাস বঙ্গভাষায় অল্পই বিরচিত হইয়াছে। এই দুই খানি পুস্তকে সঞ্জীব বাবুর ভাবুকতা, সহৃদয়তা, পাণ্ডিত্য, বর্ণনার পারিপাট্য, মানব-চরিত্র-জ্ঞান ও ভূয়োদর্শনের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। চরিত্রাঙ্কনেও তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। "কণ্ঠমালা"র মধ্যে যে কয়েক খানি পত্র আছে, বঙ্গসাহিত্যে তাহাদের তুলনা নাই। "জাল প্রতাপচাঁদ" বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব উপাদেয় পদার্থ। সত্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া এরূপ ধরণে ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস, এ পর্য্যন্ত আর কেহ কখন করেন নাই। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সঞ্জীব বাবুকে যে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও বিস্তৃত অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বোপরি প্রশংসনীয় তাঁহার ভাষা। বিদ্যাসাগর বল, অক্ষয়কুমার বল,—সকলেই আদর্শ সাহিত্য-লেখক,—কেহই আদর্শ বাঙ্গালা লেখক নহেন। সঞ্জীবচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালাই আদর্শ বাঙ্গলা। যে ভাষায় মনের ভাব অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারা যায়, পাঠ বা শ্রবণ মাত্রেই যাহার অর্থপ্রতীতি হয়, কথোপকথন সময়ে যে ভাষা অবাধে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং যাহা গ্রাম্যতা দোষের সংস্পর্শ শূন্য, তাহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভাষা। এই লক্ষণানুসারে বিচার করিতে হইলে, সঞ্জীব বাবুর ভাষাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয়। তিনি "বঙ্গদর্শনে" "পালামৌ" শীর্ষক যে কয়েকটী প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন, সে গুলি যিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, বাঙ্গালা ভাষার উপর সঞ্জীবচন্দ্রের কি অসামান্য অধিকার। তিনি "বঙ্গদর্শনে" "সিরাজউদ্দৌলা" শীর্ষক যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা যদি কখন সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী পাঠক বুঝিতে পারিবেন—সঞ্জীব বাবুর গবেষণা

কিরূপ বহুদূরগামিনী—সত্যের প্রতি অনুরাগ কেমন প্রবল—স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচনের শক্তি কি অপরিসীম! নিম্নে তাঁহার কয়েকছত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

"আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার।
যত পে'ল আঁখিজল, তত হইল প্রবল,
এখন, লতাভরে তরু মরে, কে করে বিহিত তার।"

* * * *

প্রণয় মোর সাগর তুল, সে কি অনাদরে শুকাবার?
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার।
সখি, কতদূরে ভানু রয়, সাগর তাহে কাতর নয়,
পসারি সে অগাধ হৃদয়, তবু তারে দেয় উপহার।"

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী এ পর্য্যন্ত "দীপনির্ব্বাণ," "ছিন্ন-মুকুল" "মালতী," "হুগলীর ইমামবাড়ী," "মিবাররাজ" প্রভৃতি উপন্যাস দুই খানি কবিতাপুস্তক—"বসন্তোৎব" ও "গাথা" এবং "পৃথিবী" নামে এক খানি বিজ্ঞান পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি ঋষিকল্প মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুহিতা। এই বিশাল বঙ্গভূমে কেবল এই ঠাকুর পরিবারের মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী পুরাণবর্ণিত সপত্নীভাব পরিহার পূর্ব্বক পরম সম্প্রীত সহকারে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাগ্রজ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পর, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী নাম্নী মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গৌরবের সহিত বহন করিয়া আসিতেছেন। অন্য কোন ভাষায় এক খানি উচ্চ দরের সাময়িক পত্রের সম্পাদন কার্য্য মহিলা দ্বারা আর কখন সম্পন্ন হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বঙ্গ ভাষার পক্ষে ইহা সামান্য শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় নহে। তাঁহার "পৃথিবীর" মধ্যে গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল যেরূপ মধুর ভাষায় ও সরলভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা গ্রন্থকর্ত্রীকে শতমুখে প্রশংসা করিতে বাধ্য। ইহার কোন কোন স্থল পাঠ করিতে করিতে একেবারে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। রমণী—বঙ্গ রমণী এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন, ইহা যার পর নাই আশার কথা। বঙ্গভাষা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে যে বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করিয়াছে, বঙ্গমহিলা বিরচিত এই "পৃথিবী"ই তাহার জলন্ত সাক্ষী। ইহার উৎসর্গ পত্রটী সকলেরই পাঠযোগ্য। গীতিকবিতা লিখিবার ক্ষমতাও তাঁহার বিলক্ষন আছে। তাঁহার উপন্যাস সকলে বর্ণনার ছটা, ভাষার পারিপাট্য, চরিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্য ও স্বদেশানুরাগের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী বঙ্গভাষার অতি উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ-লেখকগণের পার্শ্বে স্বর্ণ সিংহাসন পাইবার সর্ব্বথা অধিকারিণী। এতদিনের পর বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষার সুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদের গতি সংযত করিতে হইবে।

উপসংহারকালে (প্রবন্ধের নহে) আমরা সুগৃহীত-নামা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হই-

লাম। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যের গতি ফিরাইতে যাঁহারা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, বঙ্কিম বাবু তাঁহাদের অগ্রণী ও অগ্রগণ্য। সুতরাং ইহার বিষয় উল্লেখ করিবার সময় যথেষ্ট সাবধানতার সহিত আমাদিগকে লেখনী ধারণ করিতে হইবে। ইঁহার গ্রন্থাবলীর রীতিমত সমালোচনা করিতে হইলে, এক খানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। যিনি হিন্দুধর্ম্মের লেখনী-যুদ্ধে দুরন্ত হেষ্টিকে পরাস্ত করিয়া জাতীয় ক্ষেত্রে সগৌরবে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া দিয়াছেন, —যিনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সরল, ললিত ও মধুর ভাষায় প্রকাশ করিয়া, "উপন্যাস অপেক্ষা সত্য কথা যে অধিকতর মনোরম" সপ্রমাণ করিয়াছেন, — যিনি কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী চরিত্র স্তরে স্তরে উদ্ঘাটন করিয়া সাধারণের নয়ন পথবর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন, —হিন্দু ধর্ম্মের নৈসর্গিক মূলও যে ইউ-রোপীয় বিজ্ঞান সম্মত, যিনি ইহা বাঙ্গালীকে সর্ব্বপ্রথম বুঝাইয়া দিয়াছেন,—ব্যাস বাল্মীকি, কালিদাস ও ভবভূতির পর, ভারতে যাঁহার ন্যায় চরিত্র-চিত্রকর আর কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই,—ভারতচন্দ্র ব্যাখ্যাত দুষ্ট প্রণয়ে নিমজ্জিত বঙ্গবাসীকে যিনি সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় প্রেমের অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া তুলিয়াছেন,—রামায়ণ, মহাভারত-পাঠের ফল লাভ যাঁহার পুস্তকাবলী পাঠে হইয়া থাকে,—যাঁহার সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" বঙ্গভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসিক পত্র,—ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য বঙ্গবাসী-গণকে মাতৃভাষায় লেখনী ধারণ করিতে যিনি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—অধিক কি, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রের মহারথী কুলের অধিকাংশ যাঁহার স্বহস্ত প্রস্তুত সাহিত্য-শিষ্য—চতুরস্রমুখী যাঁহার প্রতিভা,—সেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষকে কে শ্রদ্ধা না করেন? বঙ্কিমবাবু এ পর্য্যন্ত,দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী,কৃষ্ণকান্তের উইল, উপকথা, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম—এই বার খানি উপন্যাস—এবং কমলাকান্তের দপ্তর,লোকরহস্য, বিজ্ঞান-রহস্য, বিবিধ-সমালোচন, সাম্য, কবিতা-পুস্তক, প্রবন্ধ-পুস্তক, মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত,* দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী ও কবিত্ব, কৃষ্ণচরিত্র প্রথমভাগ ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব—এই বার খানি বিবিধ বিষয়ক পুস্তক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন, ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গদর্শন" ও বর্ত্তমান "নবজীবন" ও "প্রচারে," প্রকাশিত তাঁহার অনেক প্রবন্ধ আজিও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। সে গুলি একত্র সন্নিবিষ্ট হইলে এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। মাতৃভাষায় তিনি যেরূপ আত্ম জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, আর কয় জন বাঙ্গালীকে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়? বয়স একটু অধিক হইলে, বঙ্গবাসীগণ শারীরিক, মানসিক—সর্ব্ব প্রকার শ্রম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। ইহাই বাঙ্গালী প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রকৃতির বাঙ্গালী নহেন। এই প্রাচীন বয়সে ভগ্ন দেহ ও ক্ষুণ্ণ চিত্ত লইয়া তিনি গুরুতর

* মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিতে বঙ্কিম বাবু নিজের নাম দেন নাই। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার পুস্তকাবলীর বিজ্ঞাপন বাহির করেন, তাঁহারা ইহা বঙ্কিম বাবু কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এজলাসী কার্য্য যেমন অবিমিশ্র সুখ্যাতি ও গৌরবের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তেমনই গভীর জ্ঞান, বিজ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত আছেন। এ বয়সেও যৌবনের উৎসাহ তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্ট হয়। এই অল্প কাল মধ্যে বঙ্গভাষা উন্নতির পথে যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, বঙ্কিম বাবুই তাহার মূল। আর কোন জীবিত বাঙ্গালী লেখক মাতৃভাষাকে এরূপ সমৃদ্ধিশালিনী করিতে পারেন নাই। তাঁহার এক এক খানি গ্রন্থ এক একটী মহামূল্য রত্ন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি বঙ্কিম বাবুর কোন পুস্তক পাঠ করেন নাই? "কমলাকান্তের দপ্তর" বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব উপাদেয় পদার্থ। ইহাতে যে কি বিচিত্র কবিত্ব-শক্তি, কিরূপ জলন্ত স্বদেশানুরাগ এবং কিরূপ অসাধারণ বর্ণনা-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার ভারত ভূমির প্রতি ভালবাসা দেখিয়া চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। তাঁহার "এস এস বঁধু" গীতের ব্যাখ্যায় "এটনার" উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার "বিবিধ সমালোচনায়" কয়েক খানি গ্রন্থ ও কতিপয় চরিত্রের সমালোচনা আছে। বঙ্কিম বাবুর সমালোচনা করিবার শক্তি যে অসাধারণ, তাহা এই গ্রন্থ পাঠে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার "প্রবন্ধ-পুস্তক" কতকগুলি গভীর আমোদ ও শিক্ষাপূর্ণ প্রবন্ধরে সমষ্টি। তাঁহার প্রণীত জীবন চরিতের বিষয় যথা স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহাদের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। "কবিতা পুস্তকে" কতিপয় পদ্য ও তিনটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। পদ্যাংশ সকল তাদৃশ মনোহর হয় নাই। তাঁহার অনেক গুলি পদ্য টানাবোনা। যেন বলপূর্ব্বক সে গুলিকে কবিতার ছাঁচে ফেলা হইয়াছে। গদ্য রচনা যার পর নাই মধুর হইয়াছে। "সাম্য" গ্রন্থে ইউরোপীয় সাম্য-তত্ত্ব অতি সরল ও বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। "কৃষ্ণ চরিত্র" ও "ধর্ম্ম-তত্ত্ব" সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। এ গুলি ধর্ম্ম সম্পৃক্ত গ্রন্থ। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই দুই পুস্তক যিনিই মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে, বঙ্কিম বাবুর স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা কি অসাধারণ। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার প্রবৃত্তি কিরূপ বলবতী! তর্ক করিবার শক্তি কেমন অদ্ভুত! শাস্ত্রালোচনা কত গভীর! এবং বিষয় যতই কেন দুরূহ হউক না, তাহা সরল ভাষায়, বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবার শক্তি কিরূপ অপূর্ব্ব! বঙ্কিম বাবুর অধিকাংশ চরিত্র—আদর্শ চরিত্র। সেরূপ চরিত্র সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, সে গুলির অস্তিত্বে ও আবির্ভাবে সমাজ উন্নত হয়,—মানবজাতি ধন্য হয়,—পৃথিবী স্বর্গের শোভা ধারণ করে। তাঁহার উপন্যাস সকলের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করা, এস্থলে একরূপ অসম্ভব। তাঁহার উপন্যাস-কুসুমের সৌরভ ভাগিরথী-তীর অতিক্রম করিয়া, টেম্স ও রাইন নদীর তটভাগ পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে!

বঙ্কিম বাবুর 'লোক-রহস্য' বঙ্গ সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব, উপাদেয় সামগ্রী। রহস্যপূর্ণ রচনাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইংরাজীতে এই দুই বিভাগকে Broad humor এবং

Quiet Humor বলে। বঙ্গভাষায় ইহাদিগকে ব্যক্ত-রহস্য ও সঙ্কেত-রহস্য বলা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর লেখক নিজে উচ্চহাসির লহরী তুলিয়া অপরকে হাসাইয়া থাকেন। অন্য শ্রেণী স্বয়ং উচ্চহাসি হাসেন,—মুখ ফিরাইয়া টিপি টিপি হাসিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রূ-কুঞ্চন, অধরোষ্ঠের বক্র-ভাব ও মুখ-মণ্ডলের অপূর্ব্ব ভঙ্গী দেখিয়া আর সকলে হাসিতে একেবারে লুটাইয়া পড়েন। ডনকুইক্‌সট্ এবং হুডিব্রাসের গ্রন্থ Broad Humor পূর্ণ। বেন্ জন্‌সন্, থ্যাকারে প্রভৃতির গ্রন্থে Quiet Humor এর যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গালী লেখক-গণের মধ্যেও উপরোক্ত দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয়। "আলালের ঘরের দুলাল" "হুতোম পেঁচার নক্সা" ও "পাঁচুঠাকুরের" অনেক গুলি প্রস্তাব ব্যক্ত-রহস্যে পরিপূর্ণ। আবার "লোকরহস্য" "মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত" "ভারত উদ্ধার" এবং "পাঁচু ঠাকুরের" কতকগুলি রচনায় সঙ্কেত-রহস্যের এক শেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। Broad humor বা ব্যক্ত-রহস্য অপেক্ষা Quiet humor বা সঙ্কেত-রহস্যের ফল যে রসনার তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যের অনুকূল, তাহা আর কষ্ট পাইয়া পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। সমাজের দোষ দেখাইয়া, সেই দোষকে যথাযোগ্য তিরস্কার করিবার ক্ষমতা বঙ্কিম বাবুর অপরিসীম। তাঁহার বিদ্রূপ-বাণ অতিশয় তীক্ষ্ণ। ইহা লক্ষ্য পদার্থের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্কিম বাবুর এই ব্রহ্মাস্ত্র সর্ব্বত্র উপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। দুই এক স্থলে তিনি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় শর-সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "গর্দ্দভ" আমাদের সাক্ষী। বঙ্কিমবাবুর সদৃশ লোকের পক্ষে ইহা যার পর নাই কলঙ্ক ও নিন্দার কথা। এই প্রবন্ধে তাঁহার বিকৃত রুচির পরিচয় পাইয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। যিনি স্বদেশ ও স্বজাতিকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, তাঁহার লেখনী হইতে "গর্দ্দভ" বাহির হইয়াছে বলিয়া এই অপ্রীতিকর কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার প্রতি আমাদের যে অচলা শ্রদ্ধা আছে, এই প্রবন্ধে অবশ্য তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। তাঁহার পর, বঙ্কিম বাবুর ভাষা। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা তাহার সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি। বঙ্গ সাহিত্যে এক্ষণে তাঁহারই ভাষার প্রয়োগ চলিতেছে। ইহা তাঁহার আর একটী গৌরবের কারণ। আমরা ইতিপূর্ব্বে সঞ্জীব বাবুর ভাষা সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর ভাষা সম্বন্ধেও তাহা সর্ব্বথা প্রযুজ্য। অধি-কিন্তু তাঁহার ভাষায় যেরূপ আবেগ ও গভীরতা আছে, সঞ্জীব বাবুর ভাষায় তাহা নাই। তাহার প্রথম সময়ের পুস্তকের প্রথম দুই এক সংস্করণে, কোন কোন স্থলে ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ প্রয়োগ দৃষ্ট হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলির সংশোধন হইয়াছে, দেখিয়া সুখী হইলাম। বর্ত্তমান কালের রচনায় এ সকল দোষ তিনি সাবধানতার সহিত পরিহার করিয়া থাকেন। সকল কথার উপর ধর্ম্ম কথা; সকল তত্ত্বের অপেক্ষা "ধর্ম্ম-তত্ত্ব" গুরুতর। বঙ্কিম বাবু সেই গভীর তত্ত্ব সকল এরূপ ব্যাকরণ-শুদ্ধ সরল ভাষায় ও সুললিত ভাবে বুঝাইয়াছেন যে, পাঠ করিলে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইয়া

যাইতে হয়। বঙ্কিম বাবুর লেখনী ধারণের পূর্ব্বে বঙ্গভাষা, প্রান্তর মধ্যে-বাহিতা, সল্প-তোয়া, ক্ষীণাঙ্গী তটিনীর ন্যায় আপন মনে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইত। কদাচিৎ তাহার মৃদু নিনাদ শ্রুতি গোচর হইত;—ক্বচিৎ তাহার হৃদয়ে ক্ষুদ্র লহরী লীল বিকাশ পাইত। কিন্তু কি শুভক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন! এ কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যে তিনি এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। এই মহদ্ব্যাপারে আর দুই জন মহাপুরুষও অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। এস্থলে তাহাদের নামোল্লেখ না করিলে আমাদিগকে যার পর নাই অকৃতজ্ঞতা রূপ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। তাঁহারা উভয়েই এক্ষণে পুণ্যফলে স্বর্গগত হইয়াছেন। আমরা মহাত্মা মধুসূদন দত্ত ও কেশবচন্দ্র সেনের কথা বলিতেছি। এক-জন অভিনব ছন্দের প্রবর্ত্তনা ও বিবিধ রসের সমাবেশ দ্বারা দুঃখিনী মাতৃভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন; অপর জন জলদ-গম্ভীর-স্বরে আকাশ এবং পৃথিবী কম্পিত করিয়া, মহা সত্যের মহা সঙ্গীত স্বদেশের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত শুনাইয়া গিয়াছেন। সময়ান্তরে এ সকল বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

সাহিত্য-রাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষণে কোন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা বোধ হয় কষ্ট পাইয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। সকল দিক দেখিয়া বিবেচনা করিতে হইলে, তিনি সেই আসনের সর্ব্বথা অধিকারী কিনা, পাঠকগণের উপর তাহার বিচার-ভার সংন্যস্ত রহিল। সদানুষ্ঠান দ্বারা যিনি জীবিতাবস্থায় বিমল যশোপার্জ্জন করিয়া যাইতে পারেন, তিনি সৌভাগ্যবান। যাঁহার সেই যশঃ-সৌরভ অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমোদিত থাকে, তাঁহার সৌভাগ্যের অবধি নাই। বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম যে অনন্ত কাল স্থায়ী থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে এমন এক শ্রেণীর জীব বিদ্যমান আছে, যাহারা তাহাদের সম-সাময়িক ব্যক্তির ন্যায়ানুগত প্রশংসা ও সুখ্যাতি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না। দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয়ও বটে, বাঙ্গালা-সাহিত্যে আজি কালী এই শ্রেণীর লোকেরই সংখ্যা অধিক। যিনি যে পরিমাণ যশ পাইবার অধিকারী, তাঁহাকে যদি তাহা দেওয়া যায়, অমনি এই হতভাগ্য জীবেরা এরূপ কাতর কণ্ঠে কলরব করিতে থাকে যে, শুনিলে মমতা জন্মে। তখন তাহাদের এই হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও বিকৃত-রুচির জন্য কিছু মাত্র ক্রোধের উদয় হয় না,—দুঃখই উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহারা যারপর নাই কৃপা-পাত্র সন্দেহ নাই। কবি-বর হেমচন্দ্র মেঘনাদবধের ভূমিকা স্বরূপ কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে মধুসূদনের বিলক্ষণ গুণগান করা হইয়াছে। যেরূপ প্রশংসা করা হইয়াছে শ্রীমধুসূদন সর্ব্বাংশে তাহা পাইবার উপ-যুক্ত। কিন্তু হেম বাবুর এই ব্যবহার উক্ত অপূর্ব্ব জীবদিগের নিকট ভাল লাগিল না। এই দলের কেহ কেহ হেমচন্দ্রকে মধুসূদনের স্তাবক-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া স্ব স্ব পরিহাস-পটুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্যের লেখক-গণের মধ্যে যিনি যেরূপ প্রশংসা পাইবার যোগ্য, আমারা তাঁহাকে সেইরূপ প্রশংসা

দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। আমি বুঝিতে পারিতেছি, এই শ্রেনীর কেহ কেহ আমাদের উপর বিকট ভ্রূ-ভঙ্গি করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের প্রতি তাঁহাদের কুটিল কটাক্ষের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ না করেন। এই প্রবন্ধের যে সহস্র ত্রুটি ও অপূর্ণতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। যিনি সরল ভাবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই দোষ গুলি সংশোধন করিয়া দিবেন, তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

যে বিষয় লইয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব বিরচিত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া ইতি পূর্ব্বে কয়েকজন যোগ্যতর মহাশয় কয়েকখানি অতি উপাদেয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ক্ষেত্রে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞবর, পণ্ডিতাগ্রণ্য সুলেখকগণ লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন, সেই স্থলে আমার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী-ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আমার পক্ষে শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় এই যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহা, আমারও উদ্দেশ্য তাহাই ;—সর্ব্বসাধারণকে মাতৃভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করাই আমাদের সকলের অভিপ্রায়। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অন্ধকার হরণ করে বলিয়া, ক্ষুদ্র হীনভাস খদ্যোত কি জ্বলিবে না? নিজ নিজ কার্য্য প্রত্যেকেই যথা-সাধ্য করিবে। ইহাতে উপহসিত হইবার কথা নাই। এই সামান্য প্রবন্ধ-পাঠে এক ব্যক্তিরও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, আমার আশাতীত পুরস্কার হইল, মনে করিব।

"ইংরাজ শাসনে বঙ্গ-সাহিত্যের" প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের বিষয় আলোচনা এই স্থলে শেষ করিলাম। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উপর আমাদের অভিপ্রায় প্রস্তাবান্তরে বিবৃত হইবে।

শ্রীহেমনাথ মিত্র।

কর্ত্তা ব্যতিরেকে জগতের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবে ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৪ প্রশ্ন। জগৎ-সৃষ্টির বিষয়ে কোন্ কোন্ পদার্থের পরমাণু আবশ্যক? সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাণু সকল কোথায় ছিল এবং মিশ্রিত বা বিশুদ্ধ অবস্থায় ছিল? মিশ্রিত অবস্থায় থাকিলে সকল পদার্থ একরূপ হইল না কেন, বিশুদ্ধ থাকিলে পৃথক পৃথক হইল না কেন?

উ। যদি জগৎ শব্দের অর্থ কেবল নির্জীব পদার্থের পৃথিবী আদি হয়, তবে একটী মাত্র পদার্থে জগৎ সৃষ্ট হইতে পারিত। কারণ কেবল লৌহ বা স্বর্ণের পৃথিবী ও সূর্য্য হইলেও কোনও আপত্তি করিবার লোক থাকিত না। কিন্তু যদি তাহাতে জীবগণ সম্বলিত পৃথিবী আদিই বুঝা যায়, তবে অম্লজান, জলজান, ফস্ফরাস প্রভৃতি যে সকল ভৌতিক

পদার্থ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিদেহে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সমুদায়ই জগৎ-সৃষ্টির পক্ষে আবশ্যক।

পাঠক মনে করিতে পারেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাণু সকল কোথায় ছিল, এই কথার উত্তর দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ মাত্র। কারণ সর্ব্বজ্ঞ না হইলে কেহই এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। বাস্তবিক এরূপ বিষয়, বিজ্ঞান-রাজ্যেরও বহির্ভূত। যাহা ধরিতে ছুইতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান তাহারই ব্যাখ্যা করিবে, কিন্তু যাহার আগা বা গোড়া কিছুই পাওয়া যায় না, বিজ্ঞান তাহার কিছুই করিতে পারে না। তবে কার্য্য কারণ সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলে, অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সম্ভাবনীয় অবস্থা বর্ণন করিতে পারে। আমরাও এতদ্রূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। জগতের কোথাও পরমাণুর উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। তদনুসারে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, যে পরমাণুতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরমাণু সৃষ্ট বস্তু নহে। সুতরাং তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতেই বিদ্যমান ছিল। সূর্য্যাদি যখন অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তও করিতেছি যে, যে পরমাণুও সূর্য্যাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে অনন্ত আকাশেরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ত্তমান ছিল। তবে তাহা মিশ্রিত কি বিশুদ্ধ ছিল, ইহা আমরা বলিতে পারি না। যদি উপমান ক্রমে ইহার উত্তর দেওয়া অসঙ্গত না হয়, তবে আমাদের উত্তর এইঃ—জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের মতে সৃষ্টির কার্য্য অদ্যাপিও সমাপ্ত হয় নাই। অনন্ত আকাশের কোথায় ও বা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা, কোথায়ও বা সৃষ্টির কার্য্য চলিতেছে এবং কোথায়ও বা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যথা নীহারিকা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা, সূর্য্য ও নক্ষত্র সৃষ্টির কুমার, শনি এবং বৃহস্পতি কিশোর, পৃথিবী এবং শুক্র পরিণত, মঙ্গল বৃদ্ধ এবং চন্দ্র মৃত। যে সকল নীহারিকা অতি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারাও নক্ষত্রপুঞ্জে বিভক্ত হয় না, অথচ আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা যাহাদের পদার্থ কতক বায়বীয় ও কতক দৃঢ় কিম্বা সম্পূর্ণ বায়বীয় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, সেই সমুদয় অদ্যাপিও পিণ্ডাকার ধারণ করে নাই। উহাদের পদার্থ সকল আকর্ষণ প্রভাবে একত্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না। সুতরাং তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। এই অবস্থায় পরমাণু সকল পরস্পর মিশ্রিত থাকিলেও কোন কোন নীহারিকা মধ্যে কোন কোন ভৌতিক পদার্থের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। সূর্য্যও নক্ষত্রগণ পিণ্ডাকার ধারণ করিলেও উহাদের পদার্থ প্রায় বায়বীয়ই আছে। জীব জন্তু বাসের উপযোগী হওয়ার পূর্ব্বাবস্থা যে দৃঢ়তা, তাহাও উহারা প্রাপ্ত হয় নাই। এ জন্য সূর্য্যাদি সৃষ্টির কুমার অবস্থায় অবস্থিত। বৃহস্পতি ও শনির পিণ্ড দৃঢ় হইয়া জীব জন্তুর দাঁড়াইবার স্থান হইয়াছে বটে, কিন্তু উহারা অদ্যাপি এত উত্তপ্ত রহিয়াছে যে, তাহাতে জীবনই থাকিতে পারে না। এজন্য উহারা সৃষ্টির কিশোর অবস্থায় অবস্থিত। পৃথিবী যে সকল জীব জন্তুর আবাসভূতা হইয়াছে, এমত নহে, তাহাতে মনুষ্যের উৎপত্তি হওয়াতে বহুযুগের সঞ্চিত

সম্পত্তি দ্রুত বিনষ্ট হইতেছে। সুতরাং ইদানীং পৃথিবীর ধন সম্পত্তির সঞ্চয় অপেক্ষা ক্ষয়ই অধিক। এজন্য উহা এখন পরিণত অবস্থায় আসিয়াছে। *

অতএব উপমান ক্রমে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, পৃথিবী প্রথমে নীহারিকা বৎ ছিল। সময়ক্রমে পদার্থ সকল একত্রিত হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ করে এবং অপর তাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে শীতল হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। পৃথিবীর পঞ্জর দৃষ্টেও এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে হয়। পৃথিবীর পদার্থ সকল যে অতি প্রথমে নীহারি কাবৎ ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা যে তরল ছিল, ইহা পৃথিবীর বর্ত্তমান আকার হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যভাগে স্ফীত হইয়া উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। ইহাই পৃথিবীর পিণ্ড পূর্ব্বে তরল থাকিবার প্রমাণ। আর পৃথিবীর পদার্থ সকল যে প্রখররূপে উত্তপ্ত ছিল, তাহারও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূগর্ভ অদ্যাপিও উত্তপ্ত আছে।

পার্থিব পদার্থ সকল সৃষ্টির পূর্ব্বে মিশ্রিত কি বিশুদ্ধ ছিল, এই কথার মীমাংসার উপর পৃথিবীর দ্রব্য সমস্তের বর্ত্তমান অবস্থা নির্ভর করে না। তৎসমুদয় নিম্ন লিখিত প্রণালীক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তের সহিত ভূতত্ত্ব বিদ্যার তত্ত্ব সমস্তও ঐক্য হইতেছে। পৃথিবী যখন নীহারিকা এবং সূর্য্যাদির ন্যায় বায়বীয় ছিল, তখন উহার সমস্ত পদার্থই যে ভূবায়ুর ন্যায় ভৌতিক প্রকারে মিশ্রিত ছিল, ইহা পদার্থবিদ্যার এক স্থির-সিদ্ধান্ত। এখন এই অবস্থা হইতে ভূ-পঞ্জর ও জল বায়ুর উৎপত্তির প্রক্রিয়া আলোচনা করা যাউক। মনে কর, পৃথিবী এখন সূর্য্যের ন্যায় বায়বীয় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই বায়বীয় পিণ্ড তাপ বিকীরণ করিতে থাকিবে, আর আভ্যন্তরীণ পদার্থ ক্রমে ঘন হইয়া প্রথমে তরল ও অবশেষে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইবে। যদি কোন স্থানের দৃঢ় অবস্থা অতি ধীরে সম্পন্ন হয়, তবে দানা-জনন-প্রক্রিয়া অনুসারে স্ফটিক সদৃশ পদার্থের উৎপত্তি হইবে। আবার মনে কর, কতিপয় পদার্থ তরল আকারে আছে। তখন যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভারী, তাহা সর্ব্বাগ্রে এবং অন্যান্য পদার্থ গুরুত্বানুসারে অগ্র পশ্চাৎ ঐ দৃঢ় পিণ্ডের উপর সংযত হইবে। এক রূপেই বারুণ স্তর সমস্ত উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এখন মনে কর, অন্যান্য দ্রব্যের সহিত জলজান ও অম্লজান ভৌতিক প্রকারে মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর আবর্ত্তন নিবন্ধন দৃঢ় পঞ্জরের সহিত বায়ুর সংঘর্ষণ হইয়া তাড়িত উৎপন্ন হইয়াছে। সেই তাড়িত প্রভাবে জলজান ও অম্লজান রাসায়নিক রূপে মিশ্রিত হইয়া জল হইবে। এইরূপে পৃথিবীর দৃঢ়-পঞ্জর এবং এবং জলরাশি উৎপন্ন হইলে যাহা বায়বীয় আকারে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই বাস্তবিক ভূ-বায়ু।

৫ম প্র। বীজ অগ্রে না বৃক্ষাদি অগ্রে? যদি বীজ অগ্রে হয়, তবে বীজ, বৃক্ষাদি ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না কেন? স্ত্রী পুরুষ ভেদ সৃষ্টি হইল কিরূপে? শারীর যন্ত্রা-

* মঙ্গলের বৃদ্ধ এবং চন্দ্রের মৃত অবস্থার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়।

দির পার্থক্যে মনোবৃত্তির পার্থক্য কেন হইল?

আমাদের মতে বীজের উৎপত্তিই অগ্রে। পরে বৃক্ষাদির। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীর উৎপত্তি যখন পুং ও স্ত্রী বীজের সংযোগে হয়, তখন বৃক্ষের উৎপত্তি অগ্রে হয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মনে কর, কোন আম্র বৃক্ষের মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যদি সেই সকল ফুলে পুং-পরাগ পতিত না হয়, তবে বৃক্ষ বর্ত্তমানেও বীজ উৎপন্ন হইবে না। আর যদি পুংপরাগ পতিত হয়, তবে তাহা হইতে যে বীজ উৎপন্ন হইবে, সেই বীজ যে কেবল উক্ত বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না। পুং-পরাগ, বৃক্ষান্তর হইতেও পতিত হইয়া থাকিতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপাদক বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র গুণ বিশিষ্ট। পরন্তু উক্ত বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তাহা উক্ত বীজের গুণানুসারেই হইবে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, বীজই অগ্রে এবং বৃক্ষ পরে উৎপন্ন হয়। এখন প্রাণি-রাজ্য হইতে এমত একটী উদাহরণ লওয়া যাউক, যাহা হইতে আমাদের এই উক্তি পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। অশ্বতরই অগ্রে, না যে বীজ হইতে অশ্বতরের উৎপত্তি হয়, সেই বীজ অগ্রে? এই প্রশ্নের উত্তরে বোধ করি সকলেই এক বাক্যে বলিবেন, যে বীজই অগ্রে? তাহা হইলে অন্য প্রাণি ও উদ্ভিদাদি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিতে আপত্তি কি?

প্রশ্নকর্ত্তা পরক্ষণেই আপত্তি করিতেছেন যে, যদি বীজ অগ্রে হয়, তবে তাহা বৃক্ষাদি ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না কেন? ইহা বাস্তবিক স্বতন্ত্র প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ডারউইনের বিবর্ত্তন-বাদের আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা এস্থলে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিতে পারি না। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে, কোনও বৃক্ষ এবং প্রাণী বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়া হঠাৎ উৎপন্ন হয় নাই। উহাদের সকলেরই আদি অবস্থা জীবন-ধাতু। সেই জীবন-ধাতুই বাস্তবিক বীজ। যাহা হইতে উৎপন্ন জীবের ক্রমে বিকাশ ও পরিবর্ত্তন হইয়া বর্ত্তমান আকার জন্মিয়াছে। অতএব ইদানীং বীজ ছাড়া এবং বৃক্ষ ছাড়া বীজ দৃষ্ট না হইলেও বীজ যে অগ্রে হইয়াছে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।

অনেক জীবের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। সমস্তই ন-পুংসক। এরূপ জীবের উৎপত্তি দহ-বিচ্ছেদ দ্বারা হয়। যথা, পুরুভুজ। আর এক প্রকার জীব আছে। যাহার স্ত্রী ও পুরুষ একই আধারে আছে। এরূপ স্ত্রী পুংস মনুষ্যতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অতি বিরল। শ্রেষ্ট প্রাণিতে স্ত্রী ও পুরুষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু উহাদের স্ত্রী পুরুষ ভেদ হইবার কোন সাধারণ নিয়ম নাই। মধুমক্ষিমার যে সমস্ত অণ্ড পুংবীজে নিষিক্ত হয়, সেই সমুদায় স্ত্রী বা ক্লীব কীট এবং যাহা পুংবীজে নিষিক্ত হয় না, তাহা পুং-কীট। আর এক প্রকার কীট আছে, যাহার অণ্ড পুংবীজে নিষিক্ত না হইলেই স্ত্রী কীট হয়। মনুষ্যের মধ্যে কিরূপে স্ত্রী পুরুষ ভেদ হয়, তাহা অদ্যাপিও নিরূপিত হয় নাই। পুরুষের শুক্রস্থিত কতিপয় স্পার্ম্মেটোজুন এবং স্ত্রীর অণ্ডাভ্যন্তরীণ জননী বিন্দুর সংযোগ হইয়া ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। যদি এই

সংযোগে স্পার্ম্মেটোজুন সংখ্যা সমধিক হইয়া পুংবীজের জোর অধিক হয়, তবে ভ্রূণ পুরুষ এবং স্পার্ম্মেটোজুন সংখ্যা কম হইয়া স্ত্রীবীজের জোর অধিক হয়, তবে ভ্রূণ স্ত্রী হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার প্রবল কারণ আছে। পরন্তু এই স্ত্রী পুরুষ ভেদ বাস্তবিক যন্ত্রের ভাব ও অভাব জনিত হয় না। যে সকল যন্ত্র স্ত্রীর আছে, তাহা পুরুষের এবং যাহা পুরুষের আছে তাহা স্ত্রীরও আছে। তবে সেই সমস্ত যন্ত্রের বিকাশের ইতর বিশেষ অনুসারে স্ত্রী পুরুষ ভেদ হইয়া থাকে। যথা, স্তন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের আছে, তবে তাহা স্ত্রীতে বিকশিত হয় এবং পুরুষে বিকশিত হয় না। স্ত্রীর জরায়ু ও অণ্ডাশয় যথাক্রমে পুরুষের প্রোষ্টেট গ্রন্থি এবং অণ্ড। পুরুষের শিশ্ন স্ত্রীতে বিকশিত না হইয়া যোনিদ্বারে এক উচ্চ ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত। স্ত্রী পুংস মনুষ্যে সেই ইন্দ্রিয়ই বর্দ্ধিত হইয়া কিছু দীর্ঘ হইয়া থাকে। স্ত্রীর যোনি পুরুষে মুষ্ক দ্বারা বন্ধ হইয়া যায়।

শরীরের যন্ত্রাদির পার্থক্যে মনোবৃত্তির পার্থক্য হয় না। কেবল মস্তিষ্কের পার্থক্যে তাহার ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানমতে মস্তিষ্কই মনোবৃত্তির আধার। আবার ইহাও অনেক দূর প্রমাণিত হইয়াছে যে, মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক কার্য্য করিয়া থাকে। যথা, বাক্‌শক্তি ব্রোকার ভাঁজের উপর নির্ভর করে। যদি মস্তিষ্কের উক্ত অংশের দোষ ঘটে, তবে বাক্‌শক্তি রহিত হয়। রোগী তখন সমস্ত কথাই বুঝিতে পারে কিন্তু কোনও কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। এখন, যদি কেহ বলেন যে, মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশেই বা কেন ভিন্ন ভিন্ন মানসিক কার্য্য করে? তাহা হইলে এরূপ প্রশ্নও হইতে পারে যে, কর্ণ দ্বারাই বা কেন শ্রবণ, জিহ্বা দ্বারাই বা কেন আস্বাদন ইত্যাদি হয়? বাস্তবিক এরূপ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান রাজ্যের বহির্ভূত। বিজ্ঞান কোনও কেনরই উত্তর দিতে পারে না। তবে কেবল কিরূপের ও কাহা কর্তৃকের উত্তর দিতে পারে।

৬প্র। অম্লজানের দাহ প্রবণতা আছে কিন্তু অগ্নিসংযোগ না হইলে দগ্ধ হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যখন অম্লজান দগ্ধ হয়, এই দাহিকা শক্তি অগ্নির না অম্লজানের? যদি অগ্নির হয়, তবে কখনই অম্লজান দগ্ধ হইতে পারে না। যদি অম্লজানের গুণ হয়, তবে অগ্নি সংযোগের আবশ্যকতা কি? যদিই স্বীকার করি, তবে অম্লজান পরমাণুর কোনও পরিবর্ত্তন হয় কি না? এই বিষয়ে উপমা কি অনুমান কিরূপে হয়?

উ। অগ্নির দ্বারা দৃশ্য বস্তুর অন্তর্দ্ধান হওয়াকেই লোকে দহন বলে। কিন্তু অম্লজান দৃশ্য বস্তু নহে। সুতরাং তাহা যে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়, এমত বলা যাইতে পারে না। এজন্য তাহা দাহ্য বস্তু বলিয়াও গণ্য নহে। রসায়ন বিদ্যা মতে অম্লজানকে দহন-সহায় বলে। কাষ্ঠের উপাদান জলজান এবং অঙ্গারই দাহ্য বলিয়া অভিহিত।

আধুনিক বিজ্ঞানমতে অগ্নি কোনও বস্তু নহে। যখন কাষ্ঠের জলজান ও অঙ্গারের সহিত ভূবায়ুর অম্ল সময়ে রাসায়নিক মিশ্রণ হয়, তখন প্রখর তাপ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকের বায়ু শুভ্র হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই অগ্নিশিখা, এবং কাষ্ঠের অঙ্গারের বহির্ভাগ

লালবর্ণ ধারণ করে যে, ইহাই জলন্ত অঙ্গার। আর দাহিকাশক্তি নামে কোনও বস্তু নাই। স্থূল ভাষায় বলিতে গেলে জলজান ও অঙ্গারের সহিত অম্লজানের রাসায়নিক রূপে মিশ্রিত হইবার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু প্রখর তাপ না হইলে সেই সম্বন্ধ ক্রিয়াশীল হয় না। সেই প্রখর তাপজলজান ও অঙ্গারের সহিত অম্লজানের মিশ্রণ হইতেই জন্মে। এজন্য এক পরিমাণে মিশ্রণশীল পদার্থকে অন্য পরিমাণ পদার্থের মিশ্রণ প্রবর্ত্তনা করিতে দেখা যায়। ইহাকেই সাধারণ ভাষায় অগ্নিদ্বারা কাষ্ঠ দগ্ধ করা বলে।

অতএব দাহিকা শক্তি নামে কোন পদার্থ নাই এবং অম্লজান বা অগ্নিতে কাষ্ঠ দগ্ধ করে না। তবে দহন কালে এইমাত্র ক্রিয়া হয় যে, তাপ কার্য্যে ইন্ধনকে ভূবায়ুর অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হইতে প্রবর্ত্তনা করে। সেই প্রবর্ত্তনা অনুসারে উহারা আপনা হইতেই পরস্পর মিশ্রিত হইয়া জলীয় বাষ্প ও আঙ্গরিক অম্লে পরিণত হয়। সেই উৎপন্ন বাষ্পাদি বায়বীয় হওয়াতে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাতেই কাষ্ঠ দগ্ধ হয় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

অম্লজান যে জলজানের সহিত রাসায়নিকরূপে মিশ্রিত হইলে গুণান্তর প্রাপ্ত হয় না, ইহা এক নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। কারণ জলবিশিষ্ট করিলে পুনরায় আবিষ্কৃত অম্লজান ও জলজানে, প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে আপত্তি হইতে পারে যে, যদি অম্লজান দহন-সহায় এবং জলজান দাহ্য হয়, তাহা হইলে উহাদের মিশ্রণ জল দহন-সহায় ও দাহ্য হয় না কেন? ইহার উত্তর এই;— অম্লজান ও জলজানের পরস্পর মিশ্রণেরই নাম দহন। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সেই মিশ্রণ সমাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহারা মিশ্রিত হইতেই অর্থাৎ উহাদের মধ্যে দহনের কার্য্যই চলিতে থাকে। কিন্তু যখন উহাদের মিশ্রণ সমাপ্ত হইয়া যায়, তখন আর এমত পদার্থ বাকী থাকে না যে, আরও মিশ্রণ চলিতে পারে। সুতরাং সেই মিশ্রণ সমাপ্ত জল দহন-সহায়ও নহে এবং দাহ্যও নহে। পরন্তু যদি অন্য কোন পদার্থ মধ্যবর্ত্তী হইয়া কোন দ্বিতীয় মিশ্রণের সংস্থান করে, তবে আবার দহনের কার্য্য চলিতে আরম্ভ হয়। যথা, অম্লজান, ও জলজানের মিশ্রণ সমাপ্ত হওয়াতে জলে আর দহনের কার্য্য দেখা যায় না। কিন্তু যদি জলে পেটোসিয়ম নামক ধাতু নিঃক্ষেপ করা যায়, তবে জলের অম্লজান, জলজানের সংযোগ পরিত্যাগ করিয়া পেটোসিয়মের সহিত মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। তখন আবার জলে দহনের কার্য্য চলিতে দেখা যায়।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

বর্ণভেদ।

কায়স্থ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যে পুরাণকার কায়স্থদিগকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর প্রভৃতি বিশেষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তিনিও ইহাদিগকে লিপিকারক পদ হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। প্রামাণ্য ইতিহাস ও শাসন পত্রাদির সাহায্যে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই জাতি সেই

প্রাচীন কাল অবধি প্রধান মন্ত্রী হইতে সামান্য মোহরের পর্য্যন্ত সমস্ত রাজকীয় পদগুলি অধিকার করিয়া আসিতেছেন। সমাজে রাজকর্ম্মচারীর যে সম্মান ও অধিকার চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহা কায়স্থদিগের ছিল ও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে বলিয়া আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি। ইহাই কায়স্থদিগের জাতীয় সম্মান।

ঐতিহাসিক সময়ের ভারতের সর্ব্বপ্রধান সম্রাট নন্দ। পুরাণে এই নন্দরাজার বর্ণনা আছে। বৃহৎকথা ও পুরুষপরীক্ষা প্রভৃতি কথাগ্রন্থে এই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ণেল মেকিঞ্জি দাক্ষিণাপথে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার এক খানি নন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাসমূলক। প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিশাখদত্ত নামক জনৈক রাজপুত্র নন্দবংশের উচ্ছেদ বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া মুদ্রারাক্ষস নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই নন্দরাজার বিক্রম কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিশ্ববিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডেরেরও হৃৎকম্প হইয়াছিল। গ্রীক ইতিহাসলেখক "সিকিউলস" বলিয়াছেন, এই নরপতি সংগ্রাম ক্ষেত্রে বিংশতি সহস্র অশ্ব, চারি সহস্র গজ, দুই সহস্র রথ, ও দুই লক্ষ পদাতি উপস্থিত করিতে পারিতেন।* এহেন পরাক্রমশালী নরপতির প্রধান মন্ত্রী একজন কায়স্থ ছিলেন; তাহার নাম শকটার। নন্দরাজ সামান্য অপরাধে কায়স্থ মন্ত্রীর প্রতি গুরু দণ্ড বিধান করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্রী ব্রাহ্মণকুলজাত রাক্ষসকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়া আপনার সর্ব্বনাশের পন্থা নির্ম্মাণ করিলেন। কোন কোন লেখক কুটীল মন্ত্রীগণের চূড়ামণি চাণক্যকে নন্দ বংশের বিনাশকর্ত্তা বলিয়া লিখিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে চাণক্য কায়স্থ-সচিবের হস্তস্থিত ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। যাহার বিক্রমকাহিনী শ্রবণে আলেকজেণ্ডারের ন্যায় বিশ্ববিজয়ী-বীরও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, সেই নন্দরাজ কায়স্থকুল চূড়ামণি সচিব-সিংহ শকটারকে সামান্য অপরাধে উত্তেজিত করিয়া পুত্রগণসহ নিধন প্রাপ্ত হইলেন।* শকটারের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজন্যবর্গ পূজিত মগধের রাজাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন।

মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ শূদ্রদিগের জন্য বিচারাসনের দ্বার চিরকালের তরে রুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণ যেরূপ ভারত-বিজয়ী ইংরাজ অপরাধীর বিচার দেশীয়দিগের করিবার অধিকার দেন নাই, পূর্ব্বকালে আর্য্য অপরাধীর বিচার সেইরূপ অনার্য্য শূদ্র করিতে পারিত না। মৃচ্ছকটীক নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই

* Alexander had learned from Phegaeus that beyond the Indus was a vast desert of twelve day's Journey, and at the farthest borders thereof ran Ganges. Beyondthis river dwell thy *Nabresians* and Gandaritoc whose King's name was *Zandrams*, who had an army of 20000 horse, 200'000 foot, 2000 chariots and 4000 elephants. The King could not believe this to be true, and sent for Porus, and inquired of him whether it wes so or not. He told him all was certainly true.

* পুরুষ পরীক্ষা। লৌকিক বিদ্যা কথা।

সময় বিচারকদিগের দুইজন সহযোগী (আধুনিক জুরী) থাকিত, তাহার একজন বৈশ্য ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কায়স্থ। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যদি কায়স্থগণ সমাজে অনার্য্য—শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে আমরা সেই সময়ে একজন ব্রাহ্মণ অপরাধীর বিচার করিবার জন্য একজন কায়স্থকে বিচারাসনে দেখিতে পাইতাম না।

কঙ্কণ ব্রাহ্মণ প্রধান দেশ। ইহার অধিপতি শ্রীমৎ অপরাদিত্যদেবের শাসন পত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, তাহার প্রধান মন্ত্রী একজন কায়স্থ ছিলেন।

কাশ্মীরের কায়স্থ মন্ত্রীদিগের প্রতি কহ্লন পণ্ডিত কিরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

"ঠাকুর" উপাধি আর্য্য সমাজে অতি গৌরবাত্মক। অদ্যাপি এই উপাধিটী কায়স্থদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, যথা "বসু ঠাকুর" "ঘোষ ঠাকুর" ইত্যাদি। কায়স্থদ্রোহীগণ ইহা পাঠ করিয়া অবশ্যই বলিবেন যে, কায়স্থগণ আপনাকে আপনি "ঠাকুর" বলিতে পারেন, তাহাতে সাধারণের কি আসিয়া যায়, আমরা তদুত্তরে তাঁহাদিগকে বলিতে পারি যে, চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় প্রাচীন ক্ষত্রিয় নরপতিগণ কায়স্থদিগকে যে উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, "লালমোহন" "ক্ষীরমোহন প্রভৃতি বিদ্যাদিগ্‌গজগণ কিরূপে তাহাদিগের সেই উপাধি কাড়িয়া লইবেন। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, কান্যকুব্জপতি রাটোড় রাজাদিগের ৪।৫ খানা তাম্রশাসনে আমরা "কায়স্থঠাকুর" শব্দ স্পষ্টাক্ষরে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল শাসনপত্রের বয়ক্রম প্রায় নয় শত বৎসর।

মধ্যভারতের "কায়স্থঠাকুর" গণ এক সময়ে বিশেষ খ্যাতাপন্ন ছিলেন। কালিঞ্জর, মহোবা প্রভৃতি দেশের রাজাগণ প্রধানত ইহাদিগকেই মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। খোদিত প্রস্তর লিপি ও তাম্র শাসন পত্রাদি দ্বারা এই কায়স্থ ঠাকুরগণ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। যে জাতি সেই প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ঠাকুর উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ব্যতীত নিকৃষ্ট কিরূপে বলা যাইতে পারে।

৮৩২ বৎসর গত হইল কালিঞ্জরাধিপতি চন্দ্রবংশীয় কীর্ত্তিবর্ম্ম দেব জনৈক ব্রাহ্মণকে এক খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সেই গ্রামে তাহার কুটুম্ব (ক্ষত্রিয়) ও কায়স্থ প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় লোক বাস করিত। রাজা শাসন পত্রের ঘোষণাস্থলে লিখিয়াছেন যে, কুটুম্ব ও কায়স্থ প্রভৃতি "মহাত্মা" গণের প্রতি আমার আদেশ প্রচার করা যাইতেছে। যদি কায়স্থ জাতি সেই সময় নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি "মহাত্মা শব্দ সংযুক্ত হইত না। প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজা হইতে যে ভূমিদান প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে "মহত্তরাণ" বলিত।

প্রাচীন আর্য্য রাজন্যবর্গের গুণানুবাদ স্থলে তাহাদিগকে "ব্রাহ্মণপ্রতিপালক" বিশেষণে বিশোভিত করা হইত। কিন্তু গোয়ালিয়রের অধিপতি মহারাজাধিরাজ ভুবনপালদেব আপন শাসনপত্রে আপনাকে "কায়স্থ বংশ বিপিনাম্বুধর প্রস্রষ্ঠা" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই শাসনপত্র কিঞ্চিদূন আটশত বৎসরের প্রাচীন। ইহা কি কায়স্থ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নহে ?

হিন্দু শাসনকালে রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর পরেই "মহাসন্ধিবিগ্রহী" বিশেষ সম্মানিত পদ ছিল। পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ ইহার অনুবাদ স্থলে লিখিয়াছেন "Minister of peace and war" তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপি পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই সন্ধি বিগ্রহের কর্ত্তার পদটী কায়স্থদিগের একচাটিয়া ছিল। তাহার একটী সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তত করিয়া আমরা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রমাণ স্বরূপ কেবল কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি।

ভারতের প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্গ যাহার সিংহাসন সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, যিনি পারস্যের "যায়ন যাহি" নরপতি হইতে করগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার জনক শকজাতিকে দমন করিয়া শকাব্দ প্রচলিত করত অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়াগিয়াছেন, সেই মহারাজাধিরাজ, ধর্ম্মরাজ, রাজাধিরাজ, অপ্রতিরথ পরাক্রম সমুদ্রগুপ্ত দেবের মহাসন্ধিবিগ্রহী একজন কায়স্থ ছিলেন, তাহার নাম হরিসেন।

এই ভুবনবিখ্যাত গুপ্তবংশীয় পরবর্ত্তী সম্রাট মহারাজাধিরাজ মহাদেব গুপ্তের তাম্রশাসনে তাহার মহাসন্ধিবিগ্রহীর পরিচয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—মহাসন্ধিবিগ্রহী রাণক শ্রীমল্লদত্ত পরিশুদ্ধ কায়স্থ।"

পাঠকগণের মধ্যে যাহারা বঙ্গীয় কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থ সমূহ দর্শন করিয়াছেন, তাহারা অবগত আছেন যে, কায়স্থদিগের মধ্যে বল্লাল ২৭টি বংশকে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে এই সকল বংশে যে যে ব্যক্তি প্রধান ছিলেন, তাঁহাদের নামও উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে আমরা দত্তবংশীয় নারায়ণের নাম দেখিতে পাই। এই নারায়ণ দত্ত মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন দেবের সময়ে বাঙ্গালার মহাসন্ধিবিগ্রহী ছিলেন।

তাম্রশাসন কিম্বা প্রস্তর লিপির যে কোন স্থানে আমরা কোন কায়স্থের বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই "নির্ম্মল কায়স্থকুলজাত", "কায়স্থবংশ হংস", "পরিশুদ্ধ কায়স্থ," "করণ ঠাকুর" ইত্যাদি বিশেষণ দর্শন করিয়াছি।

কায়স্থ জাতির ইতিহাস আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই অনুভব হইতেছে যে, হিন্দু শাসনকালে ইহাঁরা ভাগাভাগীতে ব্রাহ্মণদিগের সহিত একাসনে বসিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। সেই সময়েই ব্রাহ্মণগণ সকলেই তাঁহাদের প্রতি নিতান্ত অসদয় ছিলেন না। উত্তরকালে যখন মুসলমানেরা আসিয়া ভারত অধিকার করিল, তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া রাজদরবার হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কায়স্থগণ যদি সেই নীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে যে কেবল তাঁহাদের দুর্দ্দশা হইত,এমত নহে,মুসলমানদিগের শাসন কার্য্যেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। কায়স্থগণ মুসলমানদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাজকার্য্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনাদের উন্নতির সোপান পরিষ্কার করিলেন। তদ্দর্শনে কোন কোন ব্রাহ্মণ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন। ধন ও প্রতিভার সমক্ষে এই সকল কুৎসা কিছুমাত্র কার্য্যকরি হইতে পারে না। সেই ব্রাহ্মণগণই পুনর্ব্বার নানা কারণে বিবিধ গ্রন্থ সেই কায়স্থজাতির যথোচিত গুণানুবাদ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ব্রাহ্মণকুলের চূড়ামণি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় যজ্ঞকালে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ের আসন আদান প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ শিবচন্দ্র স্বীয় পিতার প্রতিনিধি স্বরূপ জনৈক কায়স্থের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহার ভবনে গমন পূর্ব্বক তৎপ্রদত্ত অন্নগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ কেম্বল সাহেব তাহার Ethnology of India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের শ্রেণীবিভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিতে হইলে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের নিম্নেই কায়স্থ। কিন্তু প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এক শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন। "They are, I believe quite equal to the Bramins," (p. 119.)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

কায়স্থ—পরিশিষ্ট।

নব্যভারতের পৃষ্ঠে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক দ্বারা বাঙ্গালা দেশীয় কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের বিবরণ মূলক একখানি গ্রন্থ প্রচার করিবেন বলিয়া একখানি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ইহা লেখা হইয়াছে যে, কোন পাঠক গ্রন্থকারকে এ সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা নব্যভারত সম্পাদক মহাশয়ের যোগে জানাইতে পারিবেন। তদনুসারে বাবু রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন;—

"১।—আদিশূরের আহ্বানমতে যে (ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, ও দত্ত) বাঙ্গালায় আগমন করেন, তৎকালে তাঁহারা ব্যতীত বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত পদ্ধতির অন্য লোক এদেশে ছিল কিনা, আমরা যে সকল ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্তাদিকে ইতস্ততঃ নীচ ব্যবসায়াবলম্বী দেখিতে পাই, তাহারা সেই পূর্ব্বকার দেশীয় বসু প্রভৃতির অথবা এই নবাগত দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতির সন্তান?

"২।—এদেশে সাণ্ডিল্য ঘোষ আছেন। সুতরাং তাহারা যে মকরন্দের বংশধর নহে, তাহা ঠিক, ইহাদের গোত্র ও প্রবর বিভিন্ন। কিন্তু বসু গুহ প্রভৃতির যাহাদিগকে নিকৃষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাই, তাহাদের গোত্র প্রবরাদিতে পার্থক্য না থাকার কারণ কি?

৩।—বাঙ্গাল ও মৌলিক আখ্যানের ব্যাখ্যা ও বৃত্তান্ত কি? ভরসা করি, কৈলাস বাবুর পুস্তকে আমার এ বিষয়ের যথোচিত মীমাংসা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইব। বোধ হয় কৈলাস বাবু বাগবাজারের কায়স্থ-কারিকা অবলম্বন করিয়া (তাহার গ্রন্থ) লিখিবেন না।"

রসিক বাবু যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা অবশ্যই তাহার যথাসাধ্য উত্তর প্রদান ও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। মনুষ্য ভ্রম প্রমাদের দাস, এজন্য আমরা বিজ্ঞ পাঠকদিগের অভিপ্রায় জানিতে অভিলাষ করিয়াছি। পাঠকমণ্ডলি মধ্যে কায়স্থদিগের সম্বন্ধে যে কেহ কোন প্রশ্ন, উত্তর কিম্বা বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইবেন, তাহাই আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ ও পাঠ করিব।

আমরা কায়স্থ-কারিকা দর্শন করিয়াছি, তাহাতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

কোন কোন মহাত্মা উক্ত গ্রন্থের মূল্য জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ কত ফর্মায় শেষ হইবে, তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই, সুতরাং ইহার মূল্যের পরিমাণ স্থির করিয়া বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ১৲ এক টাকার অধিক মূল্য করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। যাঁহারা এই গ্রন্থের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে আমরা নিতান্ত অনুগৃহীত হইব এবং অগ্রিম স্বাক্ষরকারী বলিয়া মূল্যের পরিমাণ তাঁহাদের জন্য কিঞ্চিৎ ন্যূন করা হইবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

জাতীয় একতা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ভারতীয় জাতিবর্গ প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অধীন। ব্রাহ্ম, শীক ও পার্সী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মের লোকসমূহ যে উপরোক্ত তিন ধর্ম্মের কোন একটীর অন্তর্গত, তাহা বলা অসঙ্গত নহে। সুতরাং হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পরস্পরাকৃষ্ট ও একভাবাপন্ন করিতে পারিলে একতা সম্বন্ধে অনেক করা হয়। আমরা এ প্রস্তাবে হিন্দু মুসলমানের একভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

অনেকে হয়ত এ কথা শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন এবং বলিবেন, হিন্দু কি মুসলমানের সহিত এক ভাবাপন্ন হইতে পারে? হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মিলন কি সম্ভবপর? হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মিলন সম্ভাবিত কি না, তাহা আমাদের অপেক্ষা আমাদের উত্তর পুরুষেরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু আমরাও ইহা বলিতে পারি যে, যদি কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মিশ্রণ কার্য্য অনবরত চলিয়া থাকে, তবে তাহা ভারতবর্ষে। ভারতের লোক হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অতি কুণ্ঠিত বটে, কিন্তু তাহার ধর্ম্ম তত অমিশ্র পদার্থ নহে। বরং হিন্দুধর্ম্ম এমন মিশ্র ভাবাপন্ন যে, ইহাতে সকল ধর্ম্মের মূলসূত্র গুলি পাওয়া যায়। ইহাতে নিরীশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ, অবতারবাদ, মহাপুরুষবাদ, দেবতাবাদ, উপকারবাদ, কর্ত্তব্যবাদ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার মত হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফলে হিন্দুধর্ম্মকে সকল ধর্ম্মের সারসংগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম দূরাগত ধর্ম্মের দ্বারায় প্রলুব্ধ হয় না। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বল। এই বলে সে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

হিন্দুধর্ম্মের মিশ্রভাবের প্রধান কারণ হিন্দুজাতি মিশ্র জাতি। হিন্দুর শ্বেত, গৌর ও কৃষ্ণ ও অতিকৃষ্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের দ্বারায় তাহার জাতীয় মিশ্রভাব প্রমাণিত হইতেছে। যাঁহারা মানুষের আকৃতি ও ভাষার সমালোচনা করিয়া ভারতীয় জনসংখ্যার বিচার করিয়াছেন, তাহারাও হিন্দুজাতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি মিশ্রণে উৎপন্ন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। জাতিভেদ প্রথাও, ভারতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির আগমন কিম্বা আর্য্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতরণ, এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে। মহাভারত পাঠে জানা যায়, দাক্ষিণাত্যে হুন, চীন ও উত্তর ম্লেচ্ছ নামে কতিপয় জনপদ ছিল।* উক্ত জনপদ সকল যে উক্ত জাতি সমূহের উপনিবেশানুসারে অভিহিত হইয়াছে, ইহা অক্লেশে বুঝা যায়। আসেরীয়, মৈশরিক, ও গ্রীকদিগের সংশ্রব আমরা অবগত আছি। এই প্রকারে মুসলমানদিগের পূর্ব্বে যে সকল বিদেশীয় জাতি ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণ কোথায়? বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, তাহারা হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এবং হিন্দুধর্ম্ম তাহাদিগকে নিজ সন্তানের ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছে। সত্য বটে, এই সকল পূর্ব্ব-প্রবেশক বিদেশীর সংখ্যা মুসলমানদিগের বর্ত্তমান সংখ্যার ন্যায় অধিক না হইতে পারে, কিন্তু সেই সংখ্যা অত্যল্প হইলেও (অত্যল্প কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে) তাহা হিন্দুর অন্তর্গত হওয়ায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, হিন্দুর মধ্যে অহিন্দুদিগকে গ্রহণ করার রীতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। আর্য্যেরা তাহাদের আর্য্য নাম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু নামে অভিহিত হওয়ার কারণও, হিন্দুস্থানের সর্ব্বসাধারণ জাতির সহিত মিশ্রিত হওয়া ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আমরা হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞদিগকে এই বিষয় আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। যদি তাঁহারা দেখেন, অহিন্দুদিগকে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত করা পূর্ব্ব প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধ নহে, তবে আমাদের প্রস্তাব এই যে, মুসলমানদিগকে পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে স্থান দিতে যত্ন করুন। যদি এ দেশে জাতীয় একতা অভিলষিত হইয়া থাকে, তবে তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপরোক্ত উপায় ভিন্ন কোন বিশিষ্ট উপায় আছে কি না সন্দেহ।

উপরোক্ত বিষয়ে আমাদের মনের ভাব সম্যকরূপে ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্কাশন বিষয়ে দুটী একটী কথা বলিতে চাই। ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন যে, হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। কথিত আছে, বঙ্গে উক্ত ধর্ম্ম এরূপ সর্ব্বময় হইয়াছে যে, হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে আদিশূরকে অন্যত্র হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। ইহার কারণও অতি সহজে প্রকাশিত হইতে পারে। বেহারের রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের প্রধান অধিনায়ক। ফল, ভারতে বৌদ্ধ সংখ্যা ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতে এত কৃতকার্য্য হইয়াছিল যে, পশ্চিমে রুসিয়ার সীমা, পূর্ব্বে প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ ও উত্তরে চীনতাতার এই সমুদয় স্থানের লোক উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের লোক কি পরিমাণে বৌদ্ধ হইয়াছিল, তাহা এই ঘটনায় অক্লেশে বুঝা যায়।

সকলেই জানেন, এই সকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ অহিন্দু। কেবল অহিন্দু এমত নহে, হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালের কোন জনসংখ্যা পাওয়া যায় না, যদি ধরা যায়, তদানীন্তন জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা

---

* প্রতাপের মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৯ অধ্যায় শান্তিপর্ব্বে চীন ও হুন জাতির উপনিবেশ বার্ত্তা লিখিত আছে।

৪০ জন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, * এবং বর্ত্তমান সময়ে শতকরা ৩ জনের অধিক বৌদ্ধ ভারতে নাই, তাহা হইলে অবশিষ্ট বৌদ্ধগণ কোথায় গেল? পরবর্ত্তীকালে কোন কোন বৌদ্ধ মুসলমান ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও অবশিষ্ট অধিক সংখ্যক বৌদ্ধগণ ইতিপূর্ব্বে যে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, হিন্দু স্বধর্ম্মভ্রষ্ট সন্তানকে গ্রহণ করিতে যে আপত্তি করে, তাহা অত্যন্ত মৌখিক। বর্ত্তমান সময়েও হিন্দুর ঘরেও অভক্ষ্য ভক্ষণের এবং তৎসংসর্গিদিগের সংখ্যা অবারিত বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ প্রমাণ দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

আমাদের দেশের মুসলমান সংখ্যার মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু সন্তান। তাহাদের শিরায় অদ্যাপিও হিন্দুরক্ত প্রবাহিত হইতেছে। মুসলমানেরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করে যে, স্থন্নী সকল হিন্দু। ভারতে আবার স্থন্নীই অধিক। আমাদের প্রস্তাব এই, যে সকল মুসলমান হিন্দুর সন্তান, তাহাদিগকে হিন্দু করার কোন উপায় নাই কি? ৬০০ বৎসরের পরে অহিন্দু বৌদ্ধগণ হিন্দু হইল কি প্রকারে? বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব খ্রীষ্ট জন্মিবার ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব ৮০০ বৎসর পরে। এই ১৩০০ বৎসর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল। যদি মাঝামাঝি সময় ধরিয়া বৌদ্ধ জন সংখ্যায় বৃদ্ধি ধরা যায়, তবে ৬০০ বৎসরের অর্থাৎ ৩০ পুরুষের হিন্দুধর্ম্মভ্রষ্ট বৌদ্ধগণ পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে আনীত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।*

এই প্রকারে যে হিন্দু সন্তান মুসলমান হইয়াছে, তাহাদিগকেই কি পুনর্ব্বার হিন্দু করা যায় না? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হিন্দুদিগকেই সমাজে লওয়া যায় না, তাহাতে আবার মুসলমানদিগকে হিন্দু করিতে হইবে! কথাটা আপাততঃ বিসদৃশই বোধ হয়, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তত বিসদৃশ নহে। তাহারা যে হিন্দুধর্ম্মে—সেই মহাসমুদ্রে পহুঁছিতেছে না, তাহার কারণ, বাধা বুকে ঠেকিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিলে যে তাহারাই আসিবে, এমত নহে, অন্য অনেক দিনের জাতিভ্রষ্ট হিন্দু, যাহাদিগকে আমরা মুসলমান আখ্যা দিয়াছি, তাহাদিগকেও সঙ্গে করিয়া আনিবে। ইংলণ্ড-প্রত্যাগতদিগকে কেহ গির্জ্জায় বা মসজিদে যাইতে দেখে নাই; তাহারা হিন্দুই আছে; তবে কেহ কেহ তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করেন না, এই মাত্র।

যদি ইংলণ্ড-প্রত্যাগতদিগের কথাই উঠিল, তবে আরো দুই কথা বলি। তাঁহাদিগকে যে হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে না, তাহা কেবল সমাজের দোষে, এমত নহে; তাহাদিগেরও দোষ আছে। তাহারা যে সমাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, এরূপ বোধ হয় না।

* বর্ত্তমান সময়ে তিব্বতাদি দেশে যে সকল বৌদ্ধ আছে, পৃথিবীর জনসংখ্যার সহিত তাহাদের সংখ্যার অনুপাত শতকরা ৪০।

* কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর "শঙ্করাচার্য্য" নামক পুস্তিকায় মুসলমানের অন্ন শঙ্করাচার্য্য ভোজন করিয়াছেন, এইরূপ কথা লেখা আছে। ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠেও, কি প্রকারে দলে দলে অহিন্দুগণ হিন্দু হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। উক্ত পুস্তকে বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলা হইয়াছে। আমরা বৌদ্ধদিগকে সন্দেহবাদী মনে করি।

যাঁহার ইচ্ছা আছে, তাঁহাকে সমাজ বাধা দেয় নাই। বাবু অমৃতলাল রায়, হোপের সম্পাদক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে ও ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। আমরা অবগত আছি, মালবার প্রদেশেও একজন প্রত্যাগত হিন্দু পুনর্ব্বার হিন্দুত্বে স্থান পাইয়াছেন। ইহাঁরা বাস্তবিক ভারতের প্রকৃত হিতৈষী। ইহাঁরাই,জাতি যে কোন্ দিকে চলিবে,তাহার পথ-প্রদর্শক। ইহাঁদের পুনরাগমন দৃষ্টে বুঝা যায়, যাহার ইচ্ছা তাহার হিন্দু হইতে বাধা নাই। এই গুণকে পূর্ব্ব প্রস্তাবে হিন্দুধর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা গুণ বলিয়াছি— ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ। এই গুণের ক্রিয়া বর্ত্তমান সময়ে বিকৃতভাবে চলিতেছে, ইহাকে প্রকৃত অবস্থায় চলাইতে পারিলে হিন্দুধর্ম্ম আর হেয় ধর্ম্ম থাকে না এবং ইহা দ্বারা বিয়োজন ক্রিয়া অপেক্ষা সংযোজন ক্রিয়া অধিক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে আমি ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত আছি। তাঁহার ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ হিতৈষী, দক্ষ ও চরিত্রবান ব্যক্তি আর কখন দেখি নাই। অতীত আর্য্যজাতির জন্য তাঁহার যেরূপ প্রাণ কাঁদে, তাহাতে তাঁহাকে আমি পরম হিন্দু ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। কিন্তু তিনি বলেন, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি না। এই প্রায়শ্চিত্ত অস্বীকার বশতঃ তিনি ও তাঁহার সঙ্গিগণ হিন্দুধর্ম্মে পুনরাধিকার প্রাপ্ত হইতেছেন না। এই পুনরাধিকার পাইতে হইলে, বীর্য্যবান ব্যক্তির ন্যায় কাজ করিতে হয়! অমৃত বাবু যে প্রকারের মানসিক বল দেখাইয়াছেন, ইহাঁরা সেইরূপ মানসিক বল দেখাইতে অস্বীকৃত হইলেও, ইহাঁদের পাস্থও পরিষ্কাররূপে দ্বারদেশে স্থিত। বেদ উদ্ধার করা রমেশ বাবুর জীবন-সংকল্প বলিয়া বোধ হইতেছে—তিনি কি বেদের প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মানুসরণ করিতে পারেন না? বৈদিক সময়ের প্রারম্ভে জাতিভেদ ছিল না। তখন সংস্কারবিধি স্থির হয় নাই। বাবু রামদাস সেন বলেন, তখন বিবাহ সংস্কারও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সংস্কারপ্রথা পরে হইয়াছে। যখন ব্রাহ্মণগণ যাজকতা পদ পৃথক করিয়া লইল, তখনও ব্রাহ্মণ হওয়ায় বংশগত প্রথা ছিল না। "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাং" ইত্যাদি বাক্য মহাভারতের উপাখ্যানভাগে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রমেশ বাবু যদি বাস্তবিকই বেদ উদ্ধার করিতে চান, তবে উহা কেবল বেদ অনুবাদ করিলে হইবে না। দেশে বৈদিক সময় উপস্থিত করিতে হইবে। ইহা প্রভূত মানসিক বলের সাপেক্ষ। জাতিভেদ প্রথা থাকুক, ইহার বংশগত ভাব দূরীভূত করিয়া তেজের সহিত আবার বৈদিক সময় উপস্থিত কর। যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ কর; যাহারা সৈনিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় কর,শিল্প বাণিজ্য যাহাদের অভিপ্রায়, তাহাদিগকে বৈশ্য এবং কেবল শারীরিক শ্রমজীবীরা শূদ্র থাকুক। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার বংশপরম্পরাভাব দূর কর। তাই বলিতেছি, রমেশবাবু ব্রাহ্মণের পদগ্রহণ করিয়া, সমুদায় ইংলণ্ড-প্রত্যাগতদিগের যাজকতা করেন না কেন? রমেশ বাবু উদাহরণ স্থল, এইমত লোক কি তাঁহাদের মধ্যে আরো পাওয়া যায় না? আমাদের বিশ্বাস এই, যদি কেহ আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃত অবস্থা বুঝেন, তবে তাহা

এই ইংলণ্ড প্রত্যাগত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহাদিগকে আমরা ব্রাহ্মণের পদ স্পষ্টিপূর্ব্বক বৈদিক কার্য্য করিতে অনুরোধ করি। সম্প্রতি তাঁহাদের প্রথম পুরুষ চলিতেছে—এইরূপ নিরবলম্বন অবস্থায় কি তাঁহাদের উত্তর পুরুষও চলিবে? ইহাঁরা বিজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, অর্থশালী—ইহাঁরা জীবনের নিয়ম অবলম্বনে অর্থাৎ সুচারুরূপে কাজ করিলাম, আর ধর্ম্ম কি, এই অবস্থায়ও থাকিতে পারিলেন, কিন্তু ইহাঁদের উত্তরপুরুষও কি এইরূপ সত্যনিষ্ঠ ও অভ্রান্তরূপে জীবন-নিয়ম পালন করিবে? তবেই ত ধর্ম্মের আবশ্যক। আমরা বলি, সেই ধর্ম্ম হিন্দু ভিন্ন অন্য হওয়া উচিত নহে। হিন্দুধর্ম্মের জন্য একজন লুথারের আবশ্যক। ইংলণ্ড-প্রত্যাগত হিন্দুরাই এই লুথারকে আনয়ন করিতে পারেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করুন, লুথার অনতিবিলম্বে উপস্থিত হইবেন, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রমেশ বাবুর বাঙ্গালা ভাষার বেদানুবাদ তাহারই অগ্রবর্ত্তিনী প্রদীপ-শিখা।

যে কথা বলিতেছিলাম। শঙ্করাচার্য্যের বক্তৃতায় কত অহিন্দু বৌদ্ধ আবার হিন্দু হইল। ভগবান অবতীর্ণ হইলেন। এই ভগবান আর কেহই নহে, সেই বুদ্ধদেব। যে বুদ্ধের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিতেছিল, হিন্দু আবার সেই বুদ্ধকেই অবতার বলিয়া স্বীকার করিল। পাঠক এইক্ষণ একটুক মনোযোগ করুন। বিধর্ম্মীর ধর্ম্ম-স্থাপয়িতা বুদ্ধদেব হিন্দুর এক প্রধান অবতার। এ অবতারের অর্থ সন্ধি। দুই দলে আপোষ হইয়া গেল। ধর্ম্ম-বিরোধ থামিল। বৌদ্ধেরা দেখিল, হিন্দুরা তাহাদের মহাপুরুষ শাক্যসিংহকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেছে। তাহারা গয়াকে তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের মুক্তির নিদানীভূত স্থান বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, তখন আর বিবাদ থাকে কি? ইহাই শঙ্করাচার্য্যের কার্য্য। শঙ্করাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন, আমি বুদ্ধদেবের কার্য্য বিনষ্ট করিতে আসি নাই—তাঁহার যাহা অভাব ছিল, রক্ষা করিতে আসিয়াছি।* শঙ্করাচার্য্য সন্ধিকর্ত্তা, কিন্তু এই সন্ধিকর্ত্তা ভারতীয় সকল ধর্ম্মসংস্কারক অপেক্ষা কৃতি। তিনি হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাসমুদ্র বৌদ্ধধর্ম্মরূপ মহাসমুদ্রের সহিত এক প্রণালী কাটিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। আমরাও একজন শঙ্করাচার্য্য চাই। তিনি মুসলমান ধর্ম্মরূপ মহাসমুদ্র হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাসমুদ্রের সহিত এক প্রণালী কাটিয়া মিলাইয়া দিবেন। উভয়ের জীবন উভয়ে যাতায়াত করিবে। উভয়ই থাকিবে, কিন্তু একপ্রাণ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যদি ভারতে সৌভাগ্যসূর্য্য উদয় হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তবে এতাদৃশ কোন মহাত্মা অবশ্যই জন্মগ্রহণ করিবেন।

বাবু গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এই নব্যভারতের স্তম্ভে, হিন্দু মুসলমানের কতকগুলি আচার ব্যবহারের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সকল পাঠকেরই সেই গুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। তদুপরি আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, মুসলমানের রক্ত ও হিন্দুর রক্ত অভিন্ন। তাহাদের ধর্ম্ম ও আমাদের ধর্ম্ম বড় বিসদৃশ নহে। কেবল একটুক তলিয়া বুঝিলেই হয়। তাহারা মহাপুরুষবাদী, আমরা কি মহাপুরুষবাদী নই? যদি তাহাদিগকে

* Vide Dr Hunter's Indian people; এবং শঙ্করাচার্য্য।

একেশ্বরবাদী বল, আমরা কি একেশ্বরবাদী নই? আমরা ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজা করি, তাহারা যদিও মাটী দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ না করুক, বাক্যের দ্বারা সেইরূপ গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর নির্ম্মাণ না করিয়া কি উপাসনা করিতে পারে? আমরাও সুকৃতি দুষ্কৃতি ফলভোগ স্বীকার করি, তাহারা বেহস্ত দো যোগ স্বীকার করে। আমরা উপসানা,উপবাস ও দান ধর্ম্মকার্য্যের অঙ্গরূপ ধরি। তাহারা নমাজ (উপাসনা) রোজা (উপবাস) জাথাৎ (দান) ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ধরে। আমরা অবতার সম্বন্ধে যেরূপ অতীত-পার্থিব অনেক ব্যাপার ধর্ম্ম-পুস্তকে পাঠ করিয়া থাকি, কোরাণেও সেইরূপ অতীত-পার্থিব বিস্তর কথা আছে। যাঁহারা সেখ আবদর রহিমের মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথার প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। এই প্রকারে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত, মুসলমান ধর্ম্মের যতদূর সাদৃশ্য আছে, এরূপ অন্য ধর্ম্মের সহিত আছে কি না সন্দেহ। তথাচ লৌকিক বিশ্বাস এই যে, মুসলমানদিগের সহিত আমাদের সাদৃশ্যই নাই। হায়! হিন্দুজাতি যেরূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রও সেইরূপ বিকৃতভাবে বুঝিতেছে।

কিন্তু হিন্দুজাতির অকৃত্রিম মনোগতি অবধারণ কর। দেখিবে, তাহা মুসলমানের সহিত মিলিবার জন্য ধাবিত। কথাটা একটু স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। যদি একজন সে-কেলে রকমের হিন্দুকে জিজ্ঞাসা কর, এই যে মুসলমানগণ এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার উপায় কি? হিন্দুজাতি কি লোপ হইবে? তিনি উত্তর করিবেন, না, হিন্দু-জাতি লোপ হইতে পারে না। ভগবানের কল্কী অবতার অতি নিকটবর্ত্তী। কল্কী অবতারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদায় ম্লেচ্ছ বিনিষ্ট করিবেন।

প্রশ্ন।—কি প্রকারে এত ম্লেচ্ছ বিনষ্ট হইবে? অনেক ম্লেচ্ছ ত ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবে না—সুন্দরবনের মধ্যে ধান্য রোপণ করিবে, তাহাকেও কি ভগবান বধ করিবেন?

উত্তর।—"মক্কায় মক্কেশ্বর নামক যে শিব আছেন, তাহার শিরে বিল্বপত্র প্রদান করিতে পারিলেই সমুদয় ম্লেচ্ছ আপনা হইতে বধ হইয়া যাইবে; কিন্তু প্রকৃত হিন্দু লোকে এইরূপ বিল্বপত্র দেওয়া চাই। ইহা ভগবানের ভিন্ন অন্যের কার্য্য নহে। কল্কী অবতারে ভগবান স্বয়ং এই বিল্বপত্র দিবেন এবং সমুদায় ম্লেচ্ছ তৎক্ষণাৎ শমন সদনে প্রেরিত হইবে।"

পাঠক! এই আমাদের হিন্দু জাতির পুরুষ পরম্পরাগত বিশ্বাস। ইহা অবহেলার যোগ্য নহে। এই বিশ্বাসের ভিতরেই হিন্দু ও মুসলমানকে একভাবাপন্ন করিবার মন্ত্র নিহিত আছে। সেই মন্ত্র সকল হিন্দুই গ্রহণ করিয়াছে,কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিতে পারে নাই। সেই মন্ত্রপ্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। আবার উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে হিন্দু-ধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা পায়। সেই শাস্ত্র এই:—

ধর্ম্মত্বমেকত্বমেব।

ধর্ম্ম ও একতা একই কথা। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম এক। মহম্মদ কেবল মুসলমানের অবতার নহেন, আমাদেরও অবতার। তাঁহার অনেক বাক্যাবলী

আমরা বুদ্ধের বাক্যের ন্যায় গ্রহণ করিব। মহম্মদ মহাদেব—শিব। মহৎ বিষয়ে মত্ততা যাহার, এই অর্থে মহম্মদ। তিনি মক্কেশ্বর শিব। তাঁহার সহিত আমাদের শক্তি বিদ্যমান. আছে। গয়ায় পিণ্ড দানের ন্যায় হিন্দুর মক্কায় পিণ্ড দেওয়া আবশ্যক—তাহা না হইলে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ—সেই অতুল্য হিন্দুজাতি—উদ্ধার হইবে না—চির পতিত অবস্থায় থাকিবে। এই জন্য আমাদের জাতীয় সূক্ষ্ম অনুধাবন শক্তি মক্কেশ্বর শিবের মাথায় বিল্ব পত্রদানের কথা বিশ্বাস করিতেছে।

ঘোরপেঁচ ছাড়িয়া দিলে, উপরোক্ত কথার মর্ম্ম এইঃ—ভগবান কল্কী অবতারে মহম্মদকে আমাদের মহাপুরুষের তালিকায় তুলিয়া লইতে বলিবেন। আর বলিবেন, মহম্মদ শঙ্কর, তোমরা উহার পূজা কর, মক্কা তোমাদের তীর্থস্থান হইল। এই একতা-সংস্থাপনই কল্কী অবতারের কার্য্য। ইহাই ধর্ম্ম।

হয়ত এ স্থলে এই কথা উপস্থিত হইতে পারে যে, ভগবান অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছিলেন,—

বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং সম্ভবামি যুগে যুগে।

ভগবান খড়্গ হাতে করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ না করিয়া সেই ম্লেচ্ছের সঙ্গে মিত্রতা করিবেন? এ কথার উত্তর এক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। তবে দৃষ্টান্ত স্থলে পুনর্ব্বারও বলিতে পারি যে, বুদ্ধ অবতারে কি ভগবান সকল বুদ্ধের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিলেন? বুদ্ধ, অহিংসা পরমোধর্ম্ম, এই কথার প্রচারক। এ অবতারে ভগবান বুদ্ধের সহিত অভেদাত্মা—এ স্থলে ত "বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং" বধ অর্থে সার্থক হয় নাই। কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধ বিনষ্ট হইয়াছে, কেনা স্বীকার করে? একতা বিধানেই সেই বধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া ভগবানের প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হইয়াছে। তবে অভিধানিকের ইচ্ছানুসারে পূর্ণ না হইতে পারে। কল্কী অবতারেও হিন্দু মুসলমানের একতা বিধান দ্বারা ম্লেচ্ছ বধ সম্পন্ন হইবে। অতএব যাহাতে এই একতা হইতে পারে, ইহার কেহ অন্তরায় হইও না। মুসলমানেরাও ইহা স্মরণ করিও, মহম্মদ মৃত্যুকালে একতাই ধর্ম্ম, এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদিগের অন্যান্য অবতারবাদও যে কেবল একতাবাদ, ইহা প্রতিপন্ন করা কঠিন নহে। আমরা পুনর্ব্বারও এ প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিব।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

বাসন্তী-প্রভাতে।

১

আয় রে রূপসি, প্রেয়সি আমার!
সে প্রিয়-বসন্ত আসিছে আবার।
গাছে গাছে দেখ্ ফুটিতেছে ফুল,
আয় ফুল-মাঝে, সৌরভ-আকুল!
ফুলে ফুলে দেখ্ চুমিতেছে অলি,
আয় ফুল-মধু, ফুলেতে উছলি!

২

সে প্রিয়-বসন্ত আসিছে আবার,
আয় রে প্রেয়সি, রূপসি আমার!
ডালে ডালে দেখ্ বসিতেছে পাখী,
আয় রে মূর্চ্ছনা, সপ্ত-সুরে ডাকি!
পড়িছে তটিনী এলায়ে হরষে,
কুসুমিত কূল, দাঁড়া রে পারশে!

৩

স'রে গেছে শীত, সরিছে কুয়াসা,
আয় সুখ-সাধ, আয় ভালবাসা!
আয় রে কবিতা, আয় স্মৃতি-দুর,
এ প্রভাত আজ বড়ই মধুর!
এ মধুর প্রাতে—তোর রূপ-রাশি
দেখে যা, কেমন মিশে গেছে আসি!

৪

দেখে যা, কেমন আকাশের পটে
কত হাসি তোর উলটে পালটে!
দেখে যা, কেমন বিহগের গানে,
কত কথা তোর ঘোরে অভিমানে!
দেখে যা, কেমন তটিনীর কূলে,
কত চলা তোর চলে হেলে-দুলে!

৫

দেখে যা, কেমন তরুর ছায়ায়,
কত কেশ তোর ভূমেতে লুটায়!
দেখে যা, কেমন নলিনীর কোলে,
কত আঁখি তোর পড়ে ঢ'লে ঢ'লে!
দেখে যা, কেমন সমীর-নিশ্বাসে,
হৃদি-স্পর্শ তোর, হৃদে আসে-আসে!

৬

আয় রে মাধুরি, চাঁদিনী-স্বপন,
গত-জনমের বিহ্বল চুম্বন!
শত শত ফুল ফুটে ওঠে গায়,
আয় ফুল-ময়ি, সাজাই তোমায়!
শত শত গান ভাসিছে পরাণে,
আয় গানময়ি, ঢেকে রাখি গানে!

৭

ঘুচিলে আঁধার, শুকালে শিশির,
কেন ছুটে আসে মলয়-সমীর?
বহিলে মলয়, কেন ফুল হাসে?—
কেন শত হাসি আসে-পাশে ভাসে?—
ফুটিলে কুসুম কেন ডাকে পাখী?
কেন বামে চায় পিপাসিত আঁখি?

৮

মাধুরীর পিছে শতেক মাধুরী,
চোরা-মন যায় শতবার চুরি!
তরুরে লতিকা বাঁধে শত ফেরে,
সাঁজের তারারে শত তারা ঘেরে,
শত শ্বাস ঢাকা বাঁশীর নিশ্বাসে,
শতেক মিলন বিরহের পাশে!

৯

নায়কের পাশে নায়িকা দাঁড়ায়,
কপোলের পাশে অশ্রু শোভা পায়,
নয়নের পাশে সরমের হাস,
অধরের পাশে বিজড়িত ভাষ,
হৃদয়ের পাশে আকুল কল্পনা,—
আয় প্রেম-পাশে রূপসী-ললনা!

১০

গাঁথিয়াছি মালা, আয় হৃদি-খানি,
লাজে পলায়ন, হেসে টানাটানি!
গাহিয়াছি গান, আয় মৃদু-হাস,
নয়নে, নয়ন, গোপনে নিশ্বাস!
পাতিয়াছি হৃদি, আয় মোহ-রাশি,
রাখ্ বুকে মুখ লুকাইতে হাসি!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

জাতীয় জীবন।

নদীর জল কল কল রবে সাগরের দিকে গমন করে, কে তাহার গতি রোধ করিতে পারে? বিমুক্ত বায়ু তাপ প্রভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া অনন্ত আকাশে উড্ডীন হয়, কে তাহার ঊর্দ্ধ গমনে প্রতিরোধ করে? সেই রূপ শিক্ষা- প্রভাবে জাতীয় জীবন সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া সহৃদয়তা ও সম্মিলনের প্রশস্ত ভূমিতে গমন করিবে, কাহার সাধ্য সেই অপ্রতিহত গতি রোধ করে? জাহ্নবীর খরতর স্রোতকে ধারণ করিবার জন্য মত্ত ঐরাবত চেষ্টা করিয়াছিল, কে না জানে যে, সেই প্রসন্ন সলিলার অবারিত গতি রোধ করা দূরে থাকুক, সেই মহাগজ আপনিই ভাসিয়া গিয়াছিল। আর আজি যে সেই পুণ্যভূমি গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর পবিত্র সম্মিলনের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রবল উন্নতির স্রোতে ভাসমান হইয়া সম্মিলিত হইল, এ গতি রোধ করা কাঁহারও সাধ্য নহে।

যাঁহারা আলোকের মধ্যে অন্ধকার দেখেন, শারদীয় পৌর্ণমাসী রজনীর নির্ম্মল আকাশে যাঁহারা শ্রাবণের ঘন ঘটা দর্শন করেন, তাঁহারা শত শত তামসিক চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিন, ক্ষতি নাই। কিন্তু যে একবার সহানুভূতির চক্ষে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে ভারতমাতার পবিত্র বক্ষে তাহার প্রিয় সন্তানগণকে ভাই ভাই এর ন্যায় একত্র বিহার করিতে দেখিয়াছেন, তিনি কখনও মনে করিতে পারেন না যে, ভারতমাতার দুঃখ দারিদ্র্য চিরস্থায়ী। কোথায় দূর পেশোয়ার, পঞ্চ নদ-বিধৌত বীর-প্রসবিনী পঞ্জাব, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমি, কোথায় শত শত বীরের বীরত্বের ইতিহাস পরিপূর্ণ নানা গৌরবে সমুজ্জ্বল রাজস্থান, কোথায় অনতি-প্রাচীন তেজোগর্ব্ব পরিপূর্ণ মহারাষ্ট্র ভূমি, কোথায় সমুদ্র তীরবর্ত্তী সমুজ্জ্বল মনীষীসম্পন্ন মান্দ্রাজ, কোথায় বীরত্বের রঙ্গভূমি প্রাচীন কীর্ত্তি পরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরী, সকল দেশ যেন সমবেত হইয়া, কে অধিকতর ভ্রাতৃত্ব, কে অধিক বন্ধুত্ব, কে অধিক মাতৃভক্তি, কে অধিক দেশভক্তি দেখাইতে পারে, তাহারাই যেন প্রতিযোগীতা করিতেছে। যেন সকলে একত্র হইয়া তারস্বরে নিদ্রিত ভারতমাতার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য সমস্বরে আহ্বান করিতেছে। ভারত-জননী কি চির নিদ্রায় নিদ্রিত যে, এত সন্তানের সমবেত ক্রন্দনেও জাগরিত হইবে না?

ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, এইরূপ জাতীয় একতা ভারতে কখনও ঘটিয়াছিল কি না? এ প্রজাসূয়-যজ্ঞের নিকট মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের উপমা নাই, কারণ সেই রাজসূয়-যজ্ঞে সমাগত নৃপতিগণের প্রবর্ত্তক ভয় ও উদ্দেশ্য ব্যক্তি বিশেষের গৌরববর্দ্ধন; আর এই অতুলনীয় প্রজাসূয়-যজ্ঞের প্রবর্ত্তক সহৃদয়তা, ও উদ্দেশ্য জননীর অশ্রুমোচন। সেই রাজসূয়-যজ্ঞের ফল ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধ, আর এই প্রজাসূয় যজ্ঞের ভাবী ফল শান্তি, সৌভ্রাত্র ও রাজভক্তি। ইহার

চিরন্তন লক্ষ্য জননী জন্মভূমির গৌরব বর্দ্ধন। এই যজ্ঞের লক্ষ্য, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থের বলিদান এবং বিদ্বেষ, অসূয়া, ঈর্ষ্যার তিরোধান।

ভারত চিরদিন গৃহবিবাদে অবসন্ন। চিরদিন ভারত-সন্তান ভারত-সন্তানের রক্তে নিজের তরবারি সিক্ত করিয়া দেশের কলঙ্ক-কালিমা বর্দ্ধিত করিয়াছে। আজি ইহা কি অপরিসীম গৌরবের কথা নহে যে, ভারত-সন্তান পুরাতন জাতি-বিরোধ, চিরাগত শত্রুতা ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রেম ও ভালবাসা-প্রসূণে পূজা করিতেছে? যে বর্গীর ভয়ে বাঙ্গালী উচ্চ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া জলময় নিম্নভূমিতে আশ্রয় লইত, আজি প্রেম ও ভ্রাতৃভাবের উচ্চ ভূমিতে উভয় উভয়কে আলিঙ্গন করিল। যে হিন্দু মুসলমান চিরদিন ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক বিরোধে অন্ধ থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিত, আজি এই প্রেম ও সম্মিলনের রাজ্যে সেই হিন্দু মুসলমান ভাই, ভাই। ঈশ্বর যাহা করেন; কে তাহা লঙ্ঘন করিবে এবং তাঁহার মঙ্গলময় নিয়মে যাহা সংসাধিত হয়, কে পূর্ব্বে তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারে?

আচার্য্য কেশবচন্দ্র, আজি এই আমোদের দিনে তোমার জন্য হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। একবার সেই স্বর্গীয় উচ্চ প্রেম এবং সম্মিলনের ভূমি হইতে চাহিয়া দেখ, তোমার নববিধান পূর্ণ হইবার বিলম্ব নাই। আজি রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্সী, জৈন, বৌদ্ধ, পরস্পরকে ভাই ভাই বলিল, রাজনীতি জগতে নববিধান পূর্ণ হইল। ধর্ম্ম জগতে তোমার আনন্দময়ী মাতার করুণায় অবশ্যই সে দিন আসিবে, যে দিন সকল জাতি ভিন্ন স্বার্থ, ভিন্ন সাম্প্রদায়িকতা, ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মিলনের পবিত্র ভূমিতে আসিয়া একত্রিত হইবে। ভ্রাতৃবিরোধের জন্য চিরদিন তোমার হৃদয় কান্দিত, আজি এই জন্যই এই ভ্রাতৃ-সম্মিলনের দিনে তাই তোমাকে ভুলিতে পারি না। আবার কি তুমি তোমার আনন্দময়ী জননীর নিকট এই হিংসা বিদ্বেষের আকরভূমি এই পাপ জগতের পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করিবে না? আবার কি সকল সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিদ্বেষ ভুলিবার জন্য জননী আনন্দময়ীর নিকট প্রার্থনা করিবে না? তোমার বাক্য একদিন ফলিবে, একদিন এই জগৎ পবিত্র ভ্রাতৃভাবের রাজ্যে মিলিত হইবে। সে দিনের আর বিলম্ব নাই।

ধন্য ইংলণ্ড, স্বাধীনতার রঙ্গভূমি, ধন্য ইংলণ্ডেশ্বরী, রাজ্ঞীকুল রাজলক্ষ্মী, আজি তোমাদের কৃপায় ভারত যাহা দেখিল, কোন দিন কল্পনার চক্ষেও ভারত তাহা ভাবে নাই, ভারতবাসীর রাজভক্তি চির দিন অবিচলিত, আজিও সেই রাজভক্তি তাহাকে এই সম্মিলনের ভূমিতে একত্রিত করিল। আজি সেই রাজভক্তি ইংলণ্ড ও ভারতকে একতার দৃঢ় শৃঙ্খলে চির বদ্ধ রাখিবার জন্য ভারতবাসীকে একত্রিত করিল। জননি, একবার তোমার সুশাসনে ভারতবাসীকে সভ্যতা, পবিত্রতা ও মনুষ্যত্বে দীক্ষিত কর, চিরদিন ভারত তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিবে।

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাসগুপ্ত।

জাতীয় মহাসমিতি—উহার কার্য্য।

এই তিন বৎসরে জাতীয় সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছে—এই তিন বৎসরের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আলোকময় বোধ হয়—জাতীয় সমিতির কার্য্য যেন এদেশের উন্নতির এক নূতন যুগ আনিয়াছে,—এতদিন যে দেশের রাজনৈতিক জীবন নিতান্ত হীনাবস্থায় পরিণত ছিল, সে দেশের যে যে স্থানে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়াছে, সেই সেই স্থানে এই সমিতির কার্য্যের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। একথা বলিলে কখনই অত্যুক্তি হইবেনা যে ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তরে—হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত শিক্ষিত প্রদেশ এই জাতীয় মহাসমিতির বিরাট আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া সজীবতার পরিচয় দিতেছে। ভারতের প্রত্যেক প্রধান প্রধান স্থানের রাজনীতি-বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং সুশিক্ষিত, সহৃদয় ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই উহাতে গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক উহার কার্য্যে যোগ দান করিয়াছেন। এই অত্যল্প কালের মধ্যে ভারতের শত শত প্রদেশ হইতে কোটি কোটি লোকের প্রতিনিধি-স্থানীয় শত শত সুশিক্ষিত, সুদক্ষ ও উচ্চপদস্থ লোক সমিতিতে মিলিত হইয়া রাজনৈতিক একতার পথ বিস্তার পূর্ব্বক স্বদেশের হিতকর বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এক স্থানে হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত লোক, আপন আপন সমাজগত বিভিন্নতা ও মতভেদ ভুলিয়া, ইতিপূর্ব্বে কোন কালে কোন একটি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য একত্র সম্মিলিত হইয়াছেন কি না, জানি না। কোথায় বঙ্গদেশ, আর কোথায় বোম্বাই, কোথায় পঞ্চনদ ভূমি, আর কোথায় মান্দ্রাজ, কোথায় উড়িষ্যা, আর কোথায় এলাহাবাদ, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, মথুরা, বেনারস, দিল্লী, মিরাট ও রাজপুতনা প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলস্থ প্রধান প্রধান প্রদেশ সকল—এই সুদূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান সুসন্তানগণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও প্রাণে প্রাণে মিলিয়া পরস্পরকে হৃদয় ভরিয়া আলিঙ্গন দানে একমনে স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে একত্র সম্মিলিত হন নাই। চারি বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী, বেহারীর কথা ভাবিতেন না; বেহারী, উড়িয়ার সহিত মিলিতেন না; পরাক্রমশালী পাঞ্জাবী দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে ভীরু বলিয়া উপেক্ষা করিতেন; বাঙ্গালী, পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণকে অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাপন্ন মনে করিতেন; পার্সী, মান্দ্রাজী মারহাট্টি ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীর কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন না; কিন্তু এই চারি বৎসরের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি দীর্ঘকালের উদাসীনতা ও অনাস্থার ভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এই অল্পকালের মধ্যে সকলেই পরস্পরের হৃদয়-জাত গভীর শ্রদ্ধা, প্রীতি, অনুরাগ ও

ভালবাসা লাভ করিয়া পবিত্র জন্মভূমির চরণতলে আপন আপন জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—জাতীয় সমিতি ভারতে এই এক অপূর্ব্ব রাজনৈতিক একতা স্থাপন ও অভিনব জাতীয় জীবনের সূত্রপাত করিয়াছেন! ধন্য বৃটেনিয়া! ধন্য স্বাধীনতা-প্রিয় সুসভ্য ও সহৃদয় বৃটন! ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তোমাদের গৌরব স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে! এই জাতীয় মহা সমিতি ভারতে ইংরেজ রাজত্বের উৎকৃষ্টতম ফল। ইংরাজী শিক্ষার অব্যর্থ মহিমা এবং ইংরেজ রাজত্বের সুসাশনে বহুবিধ সুবিধা ও সুযোগ প্রভাবে এই সমিতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ইহার সুকার্য্য ও সুফল ভারতে দিন দিন যতই বিস্তৃত হইবে, সভ্য জগতের দেশ দেশান্তরে ততই বৃটিশ গৌরব পরিব্যাপ্ত হইবে।

দেশের রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার ও সুখ-শান্তি বর্দ্ধনের জন্য জাতীয় সমিতি যে সকল বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছেন এবং এই কয় বৎসর পুনঃ পুনঃ যে সকল বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন, এক্ষণে তাহার কিছু কিছু পরিচয় দান করিব।

(ক) দেশের কোটি কোটি লোকের ধনাভাব ও দুঃখ নিবারণের জন্য দেশীয় ও প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা গুলি পরিবর্ত্তিত, সুসংস্কৃত এবং উহাতে প্রতিনিধি সভ্য-নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তনে উহার বিস্তার সাধন।

(খ) সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের বয়ঃক্রম ১৯ বৎসরের পরিবর্ত্তে ২৩ বৎসর নির্দ্দিষ্ট করণ এবং উক্ত পরীক্ষা এক সময়ে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

(গ) বিচার বিভাগে জুরির বিচার-প্রথা প্রচলনের ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইন সমূহের যে সকল বিধানে এদেশের বিস্তর অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে, তাহা সংশোধন।

(ঘ) বিচার-বিভাগ হইতে পুলিস-বিভাগ পৃথক করণ।

(ঙ) অস্ত্র আইন পরিবর্ত্তন ও সংশোধন।

(চ) দেশীয় প্রধান প্রধান বংশীয় রাজভক্ত উচ্চপদস্থ পরিবারবর্গের সন্তানগণকে সৈনিক বিভাগে প্রবেশের অনুমতি দান, এবং তাহাদের সামরিক বিদ্যা লাভের জন্য উপযুক্ত ইউরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের কোন এক প্রধান নগরে একটী সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ সুদক্ষ ছাত্রগণকে গভর্ণমেন্টের সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম দানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

(ছ) বিপদের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য দেশীয় শ্রমদক্ষ শিক্ষিত লোকদিগকে উপযুক্ত ইয়ুরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারীর শিক্ষার অধীনে ভলন্টিয়র সৈন্যরূপে শিক্ষিত হইবার ব্যবস্থা দান।

(জ) কৃষি ও শিল্প শিক্ষার উৎসাহ দান ও উপায় বিধানে, এবং দেশীয় শ্রমজাত দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ ও আস্থা প্রদর্শনে দেশের ধনাভাব নিবারণ।

এই সকল বিষয়গুলি এত গুরুতর এবং এদেশের পক্ষে এত শুভকর যে, আমি কিছুক্ষণের জন্য এক একটি বিষয় সম্বন্ধে আমার মনের অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই রাজকার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য

এক একটি পার্লামেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক সভা আছে। উহাতে রাজকর্ম্মচারী ও প্রজা এক মতাবলম্বী হইয়া রাজ্যের হিতকর ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের প্রত্যেক উপনিবেশে ঐরূপ মন্ত্রণা-সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ সকল সভায় দেশের প্রজাবর্গ আপন আপন বিশ্বাসভাজন সুদক্ষ লোকদিগকে দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা গভর্ণমেন্টের নিয়োজিত সভ্যগণের সহিত একমতাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে ব্যবস্থা ও বিধান প্রচলিত করিবার জন্য এ দেশীয় গভর্ণমেন্টের নিয়োজিত ব্যবস্থাপক সভা আছে। উহাতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং উহাতে এ দেশীয় প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ কোন সুযোগ্য লোকের প্রবেশাধিকার নাই। গভর্ণমেন্টের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ এবং গভর্ণমেন্ট-নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা উহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। আমরা সকল বিষয়েই গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহের ভিখারী। যে সকল বিধান ও ব্যবস্থায় দেশের অদৃষ্ট পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই—আমাদের ভাল মন্দ এ দেশীয় বিধান-কর্ত্তাগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। এ দেশের প্রধান প্রধান আইন ও ব্যবস্থা সচরাচর গভর্ণর জেনরল কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে, কোন কোন অত্যাবশ্যক বিষয়ে তিনি ইংলণ্ডের ষ্টেট্ সেক্রেটারী সাহেবের মত লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। ঐ সকল আইন ও ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি যখন ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত হয়, তখন সমবেত সভ্যগণের মধ্যে কিছু কিছু তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তৎকালে দেশের কোটি কোটি লোকের প্রকৃত অবস্থা ও অভাব জানাইবার লোক না থাকাতে ঐ সকল পাণ্ডুলিপির যথার্থ সমালোচনা হয় না; সুতরাং অধিকাংশ সভ্যের মত অনুসারে যখন উহা বিধিবদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহাতে বিস্তর দোষ থাকিয়া যায়। গভর্ণমেন্টের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত নহেন এরূপ কোন কোন ইয়ুরোপীয় এবং দেশীয় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ঐ সকল ব্যবস্থাপক সভায় নিযুক্ত থাকিলেও গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের দ্বারা দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারেন না; কারণ ঐ সকল লোকের মধ্যে কেহই এ দেশের কোটি কোটি নর নারীর প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত নহেন। পক্ষান্তরে ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীগণ এ দেশের প্রজা সাধারণের প্রকৃত অবস্থা, তাহাদের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার ও অভাব আদি কখনই সম্যক্ রূপে অবগত নহেন এবং জানিতেও চেষ্টা করেন না। তাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে যাহা কিছু সঙ্গত বলিয়া স্থির করেন, গভর্ণমেন্ট-নিয়োজিত দেশীয় সভ্যগণের অধিকাংশই অনেক সময়ে বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই তাহার অনুমোদন করিয়া থাকেন। দুই এক সময় প্রজাসাধারণের অবস্থাজ্ঞ দুই একজন স্বাধীন চেতা সভ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া বিষয় বিশেষে বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী হইলেও তাঁহাদের মত অধিক সংখ্যক সভ্যের সমবেত প্রতিকূল মতের নিকট পরাভূত হয়, সুতরাং তাঁহাদের বাক্য অনুসারে কোন

কার্য্যই সাধিত হয় না। যে সকল ব্যবস্থা বিধানে দেশের কোটি কোটি প্রজাবর্গের সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তাহাতে দেশের প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ সুশিক্ষিত প্রতিনিধিগণের অভিমত গৃহীত হইলে কত সুখের বিষয় হইত। যাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানেন, প্রজা সাধারণের সুখ-দুঃখে যাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে — তাহাদের দুরবস্থা দূর হইলে যাঁহারা যথার্থ সুখী হন, তেমন সুবিজ্ঞ লোক প্রজাবর্গ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় নিয়োজিত হইলে দেশের কতই মঙ্গল হইত। জাতীয় সমিতির অন্তরের প্রধানতম বাসনা এই যে, গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেশের ব্যবস্থাপক সভা গুলিকে অর্দ্ধেক পরিমাণ সভ্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচন প্রথানুসারে মনোনীত ও নিযুক্ত করেন। যত দিন এই প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইবে, ততদিন এ দেশের শাসনপ্রণালী কখনই সুসংস্কৃত হইবে না—গভর্ণমেণ্টের আয় ও ব্যয় নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ হইয়া দেশের অভাবরাশি দূর করিবে না। নানা কারণে দিন দিন গভর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে—এই ঘোর অনাটন কালে দরিদ্র প্রজার মুখের প্রতি চাহিয়া কে সুব্যবস্থা দান করিবে? অন্যায় যুদ্ধে ব্রহ্মদেশ বৃটিশ রাজ্য-ভুক্ত হইল—হতভাগ্য থিবো দেশ হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইল,—ব্রহ্ম দেশের সহস্র সহস্র লোক শৃগাল কুকুরের ন্যায় গুলি ও বেওনেট বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল—স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে কঠোর পরাধীনতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল স্বদেশানুরাগী লোক প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কত শত মনুষ্য ধৃত ও ফাঁসিকাষ্টে বিলম্বিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, অনেকে দুর্ব্বহ শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া ভীষণ কারাগারে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, এবং অনেকে হিংস্র জন্তুগণের ন্যায় ইতস্ততঃ তাড়িত হইতেছে। আজি সভ্য জগতে তাহাদের কলঙ্কের সীমা নাই—তাহারা চোর ডাকাত ও অন্য শতবিধ ঘৃণিত নামে অভিহিত হইতেছে! যাহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে আজি তাহারাই চোর ও দস্যু প্রভৃতি কলঙ্কিত নামে চিত্রিত হইতেছে! তদি অপর কোন সুসভ্য গভর্ণমেণ্টের সহিত ব্রহ্মদেশবাসীগণ এইরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া জয় লাভ করিত, তাহা হইলে অমর ইতিহাসে তাহাদের নাম, 'চোর ও দস্যু'র পরিবর্ত্তে 'স্বদেশ প্রেমিক বীর' এই গৌরবজনক নামে লিখিত হইত! আমরা স্বীকার করি, থিবো রাজ-কলঙ্ক, নর-পিশাচ—তাহার বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর দোষারোপ হইয়াছে, তৎসমস্তই আমরা সত্য বলিয়া মানিলাম, কিন্তু তাহার চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে রাজ্য-চ্যুত করিয়া তাহার স্থলে অপর একজন সুযোগ্য ও সুদক্ষ ব্রহ্মবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করিলে ভারত গভর্ণমেণ্টের কি ক্ষতি হইত, বুঝিতে পারি না। মহাশয়গণ, এই ব্রহ্ম দেশ আক্রমণ, পরাজয়, ও অধিকার পূর্ব্বক তথায় বিদ্রোহ নিবারণ, শান্তি স্থাপন ও সুশাসন প্রবর্ত্তন করিতে ভারত গভর্ণমেণ্টের ধন ভাণ্ডার একরূপ শূন্য হইয়া গিয়াছে। অর্থের অনাটন দূর করিবার জন্য গভর্ণ-

মেণ্ট সমস্ত দেশ মধ্যে ইনকম্ ট্যাক্স ধার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অল্প দিন হইল আবার এদেশে লবণ কর ও পিট্রোলিয়ম ডিউটি ধার্য্য হইয়াছে। এই লবণ কর বিধিবদ্ধ হইবার সময় যদি সাধারণ প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ কোন কোন সভ্য ব্যবস্থাপক সভায় থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝাইয়া দিতে পারিতেন যে, উহা দ্বারা প্রজাবর্গের কিরূপ কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। ব্যবস্থাপক সভার প্রধান প্রধান ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারী মেম্বরগণ প্রজাসাধারণের কোন অবস্থা প্রকৃতরূপে অবগত নহেন—তাঁহারা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার কমিসনর ও কলেক্টর সাহেবগণের রাজস্ব সম্বন্ধীয় বার্ষিক বিবরণ পাঠে স্থির করেন যে, প্রজাগণের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে—তাহারা সকলেই কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং নূতন কর দানে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইবে না। দরিদ্র প্রজাগন সময়ে সময়ে সখ করিয়া দুই একটি লাল ও নীল প্রভৃতি বর্ণের ছাতি, কাল বার্ণিষ জুতা, ও রঙ্গিন কাপড় ব্যবহার করে সত্য, কিন্তু যিনি তাহাদের ঘরের খবর জানেন, তিনি অবশ্যই বলিবেন যে, ইহাদের মধ্যে অনেক হতভাগ্য প্রজা দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না। যে সকল ধনশালী দেশীয় লোক ব্যবস্থাপক সভায় নিয়োজিত হন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় সহরের লোক—তাঁহারা রাজপ্রসাদ সদৃশ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় বাস করেন, মনোহর উদ্যান ও সুপ্রশস্ত, কোলাহল পূর্ণ রাজপথে বহুমূল্য অশ্ব-যানে ভ্রমণ করেন এবং সর্ব্বক্ষণ, পরম রমণীয় সুখ ও ভোগ বিলাসের সুশীতল ছায়ায় অনন্ত তৃপ্তি উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সুদূর মফঃস্বলবাসী কোটি কোটি কৌপিনধারী শ্রমজীবী লোকের দুরবস্থার বিষয় একদিনের জন্য চিন্তা করিয়া থাকেন কি? লবণ কর স্থাপনকালে একজন ধনশালী দেশীয় সভ্য এই বলিয়া উহার অনুমোদন করিয়াছিলেন যে, উহা হইতে প্রজা সাধারণের কোন কষ্ট হইবে না। তিনি যদি জানিতেন যে, এ দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজা ব্যঞ্জন ও তরকারী অভাবে শুদ্ধ লবণ ও সামান্য টকের সাহায্যে রাশি রাশি অন্ন উদরস্থ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই অন্যায় কর স্থাপনের কখনই অনুমোদন করিতেন না। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে দেশের যথার্থ অবস্থা পরিজ্ঞাত এবং প্রজাগণের প্রতিনিধি স্থানীয় সুশিক্ষিত, সমদর্শী ও স্বাধীনচেতা সভ্য না থাকায় এইরূপ কত অন্যায় আইন ও কর বিধিবদ্ধ হইয়া দেশের দুঃখ ও অভাব বৃদ্ধি করিতেছে। যাহাতে এই দূষিত প্রথা পরিবর্ত্তিত হয়, এবং নূতন প্রণালীতে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত ও উহাতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হয়, জাতীয় সমিতি তজ্জন্য অন্তরের সহিত যত্নবান হইয়াছেন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সুনিয়ম বিধান জন্য এ দেশে প্রায় বার বৎসর হইতে নিয়মিতরূপে আন্দোলন চলিতেছে। অল্প দিন হইল লর্ড ডফরিণের যত্নে এ দেশে যে সার্ভিস কমিসন নিযুক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যস্থ অনেক সহৃদয় সভ্য একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, উহার সংস্কার অত্যাবশ্যক। উক্ত কমিসনের নিকট এ দেশের

শিক্ষিত সম্প্রদায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখনও গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন; এ জন্য এতৎ সম্বন্ধে এক্ষণে অধিক কথা বলিতে চাহি না। আশা করি, ভবিষ্যতে উহা শুভফল প্রদান করিবে।

এ দেশীয় আদালত সমূহে জুরির বিচার প্রথা প্রচলিত হইলে ফৌজদারী বিভাগের যে কত গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহা সংক্ষেপতঃ বলিয়া শেষ করা যায় না। সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, যে সকল সভ্য-দেশে ঐ প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় আসামীর পক্ষে কোন অবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই—পক্ষান্তরে উহা বিচার কার্য্যে সুবর্ণময় ফল প্রসব করিয়া থাকে। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এ দেশের ফৌজদারী আদালত সমূহে উক্ত শুভকর বিচার প্রথা প্রচলিত হইলে, উহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

বিচার-বিভাগ হইতে পুলিস-বিভাগ পৃথক করিবার জন্য দীর্ঘকাল হইতে আন্দোলন চলিতেছে। এই দুইটী বিভাগ একত্র সংসৃষ্ট থাকাতে সময়ে সময়ে প্রজাবর্গের বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। আমি অনেক কৃষকের মুখে এই প্রথার অনেক নিন্দাবাদ শুনিয়াছি। অনেক উদার-হৃদয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এই দুইটি বিভাগ পৃথকরূপে স্থাপিত করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারাই আবার এ কথাও বলেন যে, আপাততঃ এই দুই বিভাগ পৃথক করা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে অনেক ব্যয় বাড়িবে। এক্ষণে একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা দুই বিভাগের কার্য্য চলিতেছে—যিনি কলেক্টর, তিনিই ম্যাজিষ্ট্রেট, কিন্তু এই দুই বিভাগের কার্য্য পৃথক করিতে হইলে পৃথক পৃথক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং তাঁহাদের জন্য পৃথক পৃথক কার্য্যালয় সংস্থাপন আবশ্যক হইবে; সুতরাং তখন প্রায় দুই গুণ খরচ বাড়িবে। এজন্য উহা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। আমরা বিনীত ভাবে বলি, অন্য দিকের অন্যায় অপব্যয় কমাইয়া, এই বিভাগে যদি কিছু অধিক খরচ হয়, তাহাও করা কর্ত্তব্য। সে দিন বর্ম্মাযুদ্ধে কত টাকা ব্যয় হইল, কৃষ্ণপর্ব্বত যুদ্ধে (Black mountain expedition) কত টাকা ব্যায় হইয়া গিয়াছে এবং তিব্বতযুদ্ধে ইতিমধ্যে কত টাকাই অনর্থক ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে উহার জন্য আরও কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, সে দিন "ইংলিসম্যান" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট সিকিম যুদ্ধের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ১৫,০০০,০০০ দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। মহাশয়গণ, যখন একটি প্রধান সংবাদ পত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমরাই বা উহা কিরূপে অবিশ্বাস করি। একটী তুচ্ছ যুদ্ধে এত অর্থ ব্যয় হইবে, একথা মনে হইলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। এক দিকে ভারতীয় রাজকোষে অর্থের প্রবল অনাটন, অপর দিকে এইরূপ এক একটী অন্যায় যুদ্ধে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইবে! দেশের হিতের জন্য যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে প্রজাবর্গের অনন্ত দুঃখ ও অসুবিধা দূর হইবে—কোটি কোটি প্রজা বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক

গভর্ণমেণ্টের স্তুতিবাদ ও গুণ গান করিবে, তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অন্যায় যুদ্ধের আয়োজনে সহস্র সহস্র প্রাণীবিনাশ ও দেশের ধনাভাব বৃদ্ধি করা সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অযশস্কর।

অস্ত্র-আইন সমভাবে প্রচলিত থাকাতে এ দেশের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে। কুক্ষণে, কুদিনে, মুদ্রাযন্ত্র-শাসনী আইন ও অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। উদার-হৃদয় রিপণের গৌরবময় রাজত্বকালে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু অস্ত্র আইনের কঠোরতা আজিও নিবারিত হইল না। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এই দুই আইন যে কোন সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের কলঙ্কস্বরূপ। এই দুই আইন প্রচলিত থাকিলে রাজা ও প্রজার অসদ্ভাব বৃদ্ধি হয়—রাজ কর্ম্মচারী প্রজাগণকে অবিশ্বাস করেন, প্রজাবর্গ তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ভালবাসা দিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় দেশের কোন স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। শিক্ষিত রাজভক্ত ভারতবাসীগণের পরম সৌভাগ্য বলে মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু অস্ত্র আইন সমভাবে বিদ্যমান থাকাতে ভারতবাসী একখানি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ও একটি বন্দুক অভাবে চোর ডাকাতের হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে অসমর্থ—ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র কৃষক ও কৃষি কার্য্যের প্রধান অবলম্বন সহস্র সহস্র গো, মেষ, মহিষ ও ছাগল প্রভৃতি সহস্র সহস্র গৃহ-পালিত জন্তু বন্য পশুদিগের আক্রমণ হইতে নিরাপদ নহে। গত দশবৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানীয় শস্য ক্ষেত্রে, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, চিতা ও বন্য বরাহ প্রভৃতি শত শত হিংস্র জন্তুর আক্রমণে কত সহস্র কৃষক ও গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতির প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। এই কঠোর আইন সত্বর সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা সুসভ্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। জাতীয় সমিতি তজ্জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিতেছেন।

সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চপদস্থ রাজভক্ত ভারতবাসীর সন্তানগণকে সৈনিক বিভাগে প্রবেশাধিকার দান পূর্ব্বক তাহাদিগকে যথারীতি সামরিক কৌশল ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিলে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বলিষ্ঠ ও শ্রম দক্ষ লোক বাছিয়া এক একটি ভলাণ্টিয়র সেনা দলের সৃষ্টি ও উপযুক্ত ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর তত্বাবধানে তাহাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিলে ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের যে কত মহৎ উপকার সাধিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমির প্রতি অনেক বিদেশীয় পরাক্রমশালী রাজা দীর্ঘকাল হইতে লোভ-তৃষিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছে—সুযোগ ও সুবিধা পাইলে অনেকেই ভারত সাম্রাজ্য বৃটিশ অধিকার-বিচ্যুত করিয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করিতে প্রস্তুত। আমাদের গভর্ণমেণ্ট তাহা সহজেই বুঝিতে সক্ষম। এসিয়াখণ্ডে রুসিয়ার রাজ্য বিস্তার, বিশেষতঃ অল্পদিন হইল, আফগানিস্থানের সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশাধিকার সম্বন্ধে রুসিয়ার কৌশল, চতুরতা ও বল দৃষ্টে ইংলণ্ড স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রবল রুসিয়ার তৃষিত চক্ষু সর্ব্বক্ষণ ভারতের প্রতি নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। রুসিয়া ক্রমশঃ কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক ভারতবর্ষের দিকেই অগ্রসর

হইতেছে। রুসিয়ার গতিরোধ এবং রুসিয়া ও ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ড সারপিটর লম্‌সডেনকে কতিপয় সশস্ত্র অনুচরবর্গের সহিত ভারতের সীমান্ত প্রদেশে প্রেরণ করেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইবামাত্র রুসিয়ার সৈনিক কর্ম্মচারীগণের সহিত তাঁহার মতভেদ হয়। সারপিটর কাবুলের আমিরকে পরামর্শদানে রুসিয়ার বিপক্ষে উত্তেজিত করেন। উহার অব্যর্থ ফল স্বরূপ কাবুলের সেনার সহিত রুসিয়ার সেনার ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে কাবুল সেনার পরাজয় ও পাঁচদে রুসিয়ার অধিকার ভুক্ত হয়। এই শোচনীয় পাঁচদে-ব্যাপারে ইংলণ্ড রুসিয়ার সংকল্প ও বল বিক্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। পাঁচদে রুসিয়ার অধিকার ভুক্ত হইলেই ইংলণ্ড সতর্ক হইলেন, এবং অনর্থক বিবাদ বৃদ্ধি না করিয়া অনতিবিলম্বে সন্ধি সংস্থাপনে উভয় দেশের অধিকার ভুক্ত রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ পুরঃসর সীমান্তপ্রদেশ সুরক্ষিত করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। সার পিটর লম্‌সডেনের দৌত্য কার্য্যের পর হইতে রুস-ভীতি-বিহ্বল গবর্ণমেণ্ট ভারতের সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষণের জন্য কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয়ে ধনভাণ্ডার শূন্য করিয়া ফেলিলেন। সৈনিক বিভাগের ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষার্থ এ দেশে ৬৫,০০০ ইয়ুরোপীয় সৈন্য ও ১৩০,০০০ দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত আছে। এই সৈনিক বিভাগের জন্য এ দেশ হইতে প্রতি বৎসর ১৮ কোটী টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। স্যার পিটরের দৌত্যকার্য্যের পর এই চারি বৎসর মধ্যে আফগান-সীমা সুরক্ষণের জন্য তথায় রেল রাস্তা স্থাপন, দুর্গ নির্ম্মাণ ও অধিক পরিমাণে সেনা স্থাপন করিতে গবর্ণমেণ্ট কোটী কোটী মুদ্রা জলের মত ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রায় ২৫,০০০,০০০ দুই কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৯০,০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রায় ১৭,০০০,০০০ এক কোটী সত্তর লক্ষ পাউণ্ড ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছে, অবশিষ্ট ৮০০০,০০০ পাউণ্ড ইংলণ্ড দান করিয়াছেন। এত কৌশল বিস্তার এবং এত অর্থ ব্যয় করিয়াও আজি গবর্ণমেণ্ট রুসিয়ার আক্রমণ-ভয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেন না—আজিও ভারতের উত্তর সীমা সুরক্ষিত হইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইল না। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে চিরদিনের জন্য ভারতরাজ্য বিদেশীয় শত্রুগণের আক্রমণ হইতে নিরাপদ করিতে পারেন এবং সেনা বিভাগের অযথা ব্যয় কমাইয়া দেশের বিবিধ হিতানুষ্ঠানে রত হইতে পারেন, তজ্জন্য এ দেশের কোটী কোটী প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতীয় জাতীয় সমিতি গবর্ণমেণ্টের নিকট বিনীতভাবে এই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা করিতেছেন যে, এ দেশীয় সুযোগ্য ও সুদক্ষ লোকদিগকে সৈনিক বিভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের কোন এক প্রধান নগরে একটী সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এ দেশীয় সহস্র সহস্র শিক্ষিত রাজভক্ত লোককে উপযুক্ত সৈনিক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ভলণ্টিয়ার সেনা শ্রেণীভুক্ত

করিয়া দেশের যথার্থ বল বৃদ্ধি করেন। এই সকল রাজভক্ত সেনা এ দেশের বিপদকালে শত্রুর হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের গৌরব বিস্তার জন্য হাসিতে হাসিতে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিবে। প্রজা-হিতৈষী গভর্ণমেণ্টের নিকট রাজভক্ত প্রজাবর্গের ইহা অপেক্ষা ন্যায় সঙ্গত প্রার্থনা আর কি হইতে পারে? মহাশয়গণ, মনে করিয়া দেখুন ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি রুসিয়া কোন দিন এদেশ আক্রমন করে, তখন আমাদের হিতৈষী গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রুসিয়ার বিপক্ষে এক মহাসমরের আয়োজন করিবেন। উচ্ছৃঙ্খল জ্ঞানহীন, লক্ষ লক্ষ কসাক সৈন্য কোটী কোটী ভারতবাসীর ধন প্রাণ ও মান লইয়া উন্মত্তের ন্যায় রুদ্র তালে নৃত্য করিবে—এদেশের লক্ষ লক্ষ পতিপ্রাণা গৃহলক্ষ্মী তাহাদের কঠোর হস্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবেন, আর আমরা ভীরু মেষপালের ন্যায় অবনত মস্তকে বিনা যুদ্ধে সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার, সেই জাতির মহা লাঞ্ছনা ও দুর্গতি চক্ষে দেখিব? আমরা যুদ্ধ-বিদ্যা জানিনা, আমরা দুর্ব্বল, আমরা অস্ত্র ধরিতে জানিনা, অস্ত্র ধরিবার অধিকার হইতেও আমরা বঞ্চিত, আমাদের অদৃষ্টের ঘোরতর দুর্দ্দিনে স্বদেশ রক্ষা করা দূরে থাকুক, আত্ম রক্ষার্থেও আমরা কোন চেষ্টা করিতে পারিব না—সে জন্যও সজল নয়নে গভর্ণমেণ্টের বাহু-বলের দিকে চাহিয়া থাকিব? হায় হায়, এ কথা ভাবিতেও দুঃখ ও ক্ষোভে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট যে আমাদের ন্যায় যথার্থ কৃতজ্ঞ রাজভক্ত জাতিকে অবিশ্বাস করেন, এ কথা মনে হইলেও হৃদয়ে গভীর বেদনা জন্মে। এ দেশের শিক্ষিত লোক সকল কি হৃদয়হীন, জ্ঞান-হীন, পশুতুল্য যে, তাহারা সুসভ্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে যে সকল উপকার ও অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহা ভুলিয়া তৎ প্রতিদানে নীচ অকৃতজ্ঞতা ও বিদ্রোহ প্রদর্শন করিবে? না, না, তাহা কখনই হইতে পারে না—তাহারা বিলক্ষণ জানে যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ন্যায় সুসভ্য গভর্ণ-মেণ্ট ও বৃটিশ জাতির ন্যায় উদার ও ন্যায়-বান জাতি জগতের আর কোথাও নাই। পক্ষান্তরে তাহারা ইহাও জানে যে, অসভ্য ও নিষ্ঠুর রুসিয়ার কুশাসনে তত্রত্য প্রজা-বর্গ নিতান্ত প্রপীড়িত ও একান্ত অসন্তুষ্ট—স্বদেশের শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন-জন্য তথায় দিন দিন নিহিলিষ্ট দলের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, দুর্ব্বৃত্ত কসাক সেনার অত্যাচারে বিদেশীয় কোন প্রজার ধন মান ও প্রাণ সম্ভ্রম নিরাপদ হইতে পারে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবাসী যত অধিক সুখ শান্তি ভোগ করিতেছে, পৃথি-বীর অন্য কোন জাতীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে সেরূপ সুখ শান্তির আশা নাই। তথাপি আমাদের গভর্ণমেণ্ট আমাদের রাজভক্তির প্রতি কেন যে সন্দেহ করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য এবং আমি বলিতে প্রস্তুত যে, আমাদের গভর্ণমেণ্টেরও একান্ত দুর্ভাগ্য যে, এই চির কৃতজ্ঞ ভারতবাসীগণকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে পাইলেন না। জানি না, গভর্ণমেণ্ট কত দিনে আমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন, এবং আমাদিগকে ন্যায্য

অধিকার দানে আমাদের বল ও ইংলণ্ডের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন!

কৃষি ও শিল্পশিক্ষার সুব্যবস্থা হইলে এবং এ দেশের শ্রম-জাত পদার্থের প্রতি সাধারণের অনুরাগ জন্মিলে দেশের ধনাভাব দূর হইবে। সর্ব্বোপরি উহা হইতে এই লাভ হইবে যে, উহা হইতে এ দেশে স্বাবলম্বন ও আত্ম-নির্ভর বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তোষামোদ-প্রিয়তা ও ভিক্ষাবৃত্তি অনেক পরিমাণে দূর হইবে, স্বাধীনতার প্রতি সাধারণের বিশেষ অনুরাগ জন্মিবে। উহার বিস্তারে দেশের চারিদিক ঐশ্বর্য্য প্রভাবে হাসিতে থাকিবে। ইতিমধ্যেই ইহার প্রতি গভর্ণমেণ্টের কিছু কিছু অনুরাগ আকৃষ্ট হইয়াছে—আশা করা যায়, জাতীয় মহাসমিতির যত্নে গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে প্রাণ খুলিয়া উৎসাহ ও সহায়তা দান করিবেন।

জাতীয় সমিতির এই চারি বৎসরের নিয়মিত আন্দোলন ও কার্য্যে বিস্তর সুফল জন্মিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে উহা গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনেক উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী উহার কার্য্যে সহায়তা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উহার প্রথম অধিবেশনে বোম্বের গবর্ণর লর্ড রিয়ে স্বয়ং উহার কার্য্যে গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উহার দ্বিতীয় অধিবেশন কালে আমাদের কূট রাজনীতিজ্ঞ দূরদর্শী গবর্ণর জেনরল লর্ড ডফরিণ বিভিন্ন স্থানীয় সুশিক্ষিত প্রতিনিধিগণকে স্বীয় বাসভবনে সাদরে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিষয়ের কথোপকথনে যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজত্বকালে শিক্ষিত ভারতবাসীর ন্যায্য অভিলাষ পূর্ণ হইলে তিনি সুখী হইবেন। অনন্তর ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে কলিকাতায় যে দরবার হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি প্রকাশ্যভাবে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, এ দেশে অবস্থিতিকাল মধ্যে তিনি শিক্ষিত ভারতবাসীগণের রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার করিতে পারিলে সন্তুষ্ট ও সুখী হইবেন। সেই সুসময়ে তাঁহার মুখ হইতে যে সকল বহুমূল্য বাক্য নির্গত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা আপনাদের নিকট উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই সমস্ত কথাগুলি এই ;—

"Glad and happy should I be, if during my sojourn among them, (the people of India) circumstances permitted me to extend, and to place upon a wider and more logical footing, the political status which was so wisely given, a generation ago, by that great statesman, Lord Halifax, to such Indian gentlemen as by their influence, their acquirements and the confidence they inspired in their fellow-countrymen, were marked out as useful adjuncts to our Legislative councils."

আমরা একজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজের নিকট শুনিয়াছি যে, লর্ড ডফরিণ এ দেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার জন্য স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার রাজত্ব শেষ হইয়া আসিল—আর অল্পদিন পরেই তিনি লর্ড ল্যান্সডাউনের হস্তে

রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক হোমে গমন করিবেন। তাঁহার মন্তব্য যদি কোন সুফল প্রসব করে, তবে তিনি তাহা উপভোগ করিতে পারিবেন না—লর্ড ল্যান্সডাউনই সে ফলভোগে সমর্থ হইবেন! অতি অল্প দিন হইল লর্ড ডফরিণ ব্রহ্মদেশ পরাজয়, ব্রহ্মদেশবাসীর স্বাধীনতা হরণ এবং উক্ত দেশ বৃটিশ অধিকার ভুক্ত করিবার পুরস্কার স্বরূপ ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রী সভার অনুমোদনে ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট হইতে "মারকুইস্ অব আভা" (Marquis of Ava) এই গৌরবময় অভিনব উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব সম্মানে ভারতবাসী অসুখী নহে; কিন্তু তিনি যদি এ দেশ হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে এ দেশের কোন রূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিস্তারে প্রজাবর্গের সুখ শান্তি বর্দ্ধন পূর্ব্বক, স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে, মহাত্মা রিপণের ন্যায় "ভারতবন্ধু" নাম লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে এ দেশের কোটী কোটী নরনারীর আনন্দ ও সুখের সীমা থাকিত না। তাঁহার বিদায় দিনে সহস্র সহস্র গৃহ দ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপিত হইত; সহস্র সহস্র তোরণ, বিবিধ পত্র, পুষ্প লতিকা ও পতাকায় সুসজ্জিত হইত—রাজপথ হইতে কোটী কণ্ঠ নিঃসৃত মঙ্গলময় কোলাহল উত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করিত, শত শত গৃহ হইতে তাঁহার প্রতি পুষ্পবৃষ্টি হইত—লক্ষ লক্ষ পুরসুন্দরী শুভ শঙ্খনাদে তাঁহার অভিবাদন করিত! হায়, হায়, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় ভারতবাসী সে সুখে বঞ্চিত হইবে!! ভারতবাসীগণ তাহাদের জাতীয় উন্নতিকর মহাসমিতিতে তাঁহার সহানুভূতি পাইয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার সমস্ত ত্রুটী ভুলিয়া যাইবে।

জাতীয় সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে মান্দ্রাজের সুযোগ্য সহৃদয় গভর্ণর লর্ড কনেমরা উহার কার্য্যে আন্তরিক উৎসাহ প্রদান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সমিতির শেষ দিনে সমস্ত প্রতিনিধিগণকে স্বীয় প্রাসাদে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় সার-ষ্টুয়ার্ট্ বেলির কার্য্য দৃষ্টে আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই মহা সমিতির প্রতি তাঁহারও গভীর আস্থা ও বিশ্বাস আছে—তিনি এ দেশের এক জন যথার্থ হিতৈষী শাসনকর্ত্তা—তাঁহার সুশাসন গুণে বঙ্গদেশে এই সমিতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।

তৃতীয় অধিবেশনের পর ইহার কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ নেতার আন্তরিক যত্নে ভারতের প্রকৃত হিতকর আর একটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, এ দেশের শুভকর রাজনৈতিক কার্য্যাদি সুন্দর রূপে সহজে সম্পাদন করিবার জন্য অল্প দিন হইল ইংলণ্ডে একটি ভারতীয় রাজনৈতিক কার্য্যালয় (Indian political agency) সংস্থাপিত হইয়াছে। এ দেশের সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার মাননীয় উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধাস্পদ দাদাভাই নাওরোজী ও ভারতহিতৈষী আর্ড লে নর্টন প্রভৃতি মহাশয়গণের আন্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায় এই পরম শুভকর কার্য্যের মূল। মাননীয় উইলিয়ম ডিগ্‌বি ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই কার্য্যালয় স্থাপন উপলক্ষে সুদক্ষ ব্যারিষ্টার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছে—ইহার প্রথম চারি মাসের সমস্ত ব্যয় ভার তিনি স্বয়ং বহন করিয়াছেন, এবং তৃতীয় জাতীয় সমিতির কার্য্য বিবরণ নিজ ব্যয়ে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া উহার সহস্র সহস্র খণ্ড ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র-সম্পাদক ও সুশিক্ষিত, সহৃদয় এবং উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই তত্রত্য অনেকগুলি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে উহার অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এতভিন্ন তিনি এ দেশের দুঃখ ও অভাবরাশির প্রতি তত্রত্য ব্যক্তি সাধারণের সহানুভূতি ও সহায়তা আকর্ষণ উদ্দেশ্যে বিস্তর ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক, প্রভূত পরিশ্রম সহকারে ইংলণ্ডের নানা স্থানে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি সহজ বক্তৃতা করিয়াছেন। স্বদেশ-হিতব্রতে এইরূপে অকাতরে প্রচুর অর্থ ব্যয় ও প্রভূত পরিশ্রম করাকেই যথার্থ ত্যাগস্বীকার কহে। তাঁহাদের যত্নে প্রতিভাশালী, সুদক্ষ, নির্ভীক ও অবিচলিত অধ্যবসায়শীল ব্রাড্‌ল বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন করিবার ভার লইয়াছেন এবং অন্যান্য অনেক উচ্চপদস্থ সদাশয় ইংরাজ তাঁহাকে সহায়তা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই রাজনৈতিক কার্য্যালয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে উহা হইতে অমৃতময় ফল জন্মিবে। সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা প্রাতঃস্মরণীয় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও জেফারসন্ প্রভৃতি মহাত্মাগণের সৎ পরামর্শে পরিচালিত হইয়া ইংলণ্ডে এইরূপ একটী রাজনৈতিক কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন—উক্ত কার্য্যালয়ই নব আমেরিকার নব অভ্যুদয় ও ঐশ্বর্য্যের মূল। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের উল্লিখিত এজেন্সি ইংলণ্ডে কিছুকাল স্থায়ী হইলেই এ দেশের বহুবিধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার লাভ হইবে। পরদুঃখকাতর উদারনৈতিক ইংলণ্ডের প্রাণগত সহায়তা ভিন্ন দুর্ব্বল ও দরিদ্র ভারতের উত্থান ও উন্নতির সম্ভাবনা নাই—এই কার্য্যালয়ের প্রধান নেতাগণের যত্নে ইংলণ্ডের সুসন্তানগণ হতভাগ্য ভারতবাসীকে আন্তরিক সহায়তা দান করিবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ন্যায়ানুরাগ হইতেই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সৌভাগ্য শ্রী—ন্যায়বান ইংলণ্ড কখনই এ দেশের কোটী কোটী নরনারীর কাতরক্রন্দনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।

এ দিকে জাতীয় সমিতির শিরঃস্থানীয় মহাত্মা হিউম্ ও তাঁহার প্রধান সহযোগী সুদক্ষ ভীম স্বী ও পণ্ডিত অযোধ্যানাথ প্রভৃতি মহাশয়গণের অবিচলিত অধ্যবসায় ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে দিন দিন উহার মহান্ উদ্দেশ্য ও উপযোগীতা প্রচারিত হইতেছে এবং দিন দিন সহস্র সহস্র ভারতবাসী তাঁহাদের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন ও অন্তরের সহিত যোগ দান করিতেছেন। এই মহাসমিতির যথার্থ সৎকার্য্যরাশি যে দেখিতে পায় না, সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, এবং উহার ভবিষ্যৎ যে বিশেষ গৌরবময় হইবে, এ কথা যে অস্বীকার করে, সে নিতান্ত হৃদয়হীন! আমরা দিব্য জ্ঞানে বুঝিতে পারিতেছি যে, উহার যত্নে এ দেশের সুখশান্তি বৃদ্ধি এবং সভ্যসমাজে ইংলণ্ডের গৌরব পরিব্যাপ্ত হইবে।

মহাশয়গণ, এতক্ষণ আমি জাতীয় সমিতির উৎপত্তি,উদ্দেশ্য ও কার্য্যসমূহের উল্লেখ করিলাম, অতঃপর আমি নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে আপনাদের নিকট উহার কার্য্যক্ষেত্রের কণ্টক স্বরূপ কতিপয় বিঘ্ন ও বাধার উল্লেখ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। এ পর্য্যন্ত সুসভ্য জগতে কি সামাজিক, কি ধর্ম্মনৈতিক, কি রাজনৈতিক যখন যে কোন হিতকর ক্রিয়ের আন্দোলন ও অনুষ্ঠান হইয়াছে, তখনই এক এক দিক হইতে এক একটী প্রবল দল আসিয়া তাহার ঘোরতর বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে। সকল দেশের উন্নতির ইতিহাসে এইরূপ প্রতিকূল ঘটনার শত শত প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত ইতিহাস পাঠে ইহাও জানা যায় যে, এই বিপক্ষ দল যতই প্রবল ক্ষমতাশালী হইক না কেন, পরিশেষে তাঁহাদিগকে ম্লানমুখে অবনত মস্তকে ঘোরতর লজ্জাজনক পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রকৃতির গতিরোধ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। সৎকার্য্যের জয় হইবেই হইবে। জগদীশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে দুর্নীতি, দুষ্কার্য্য, অবিচার ও অত্যাচার চিরদিন সমভাবে স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। শত শত সহৃদয় মনুষ্যের প্রাণ যখন এই সকল দুর্গন্ধময় দুর্নীতি ও বিষময় দুষ্কার্য্যের জন্য কাঁদিয়া উঠে, তখন আর একদিক হইতে আর শত শত সহৃদয় মনুষ্যের হৃদয় ব্যথিত হইয়া এই ঘৃণিত বৈষম্য ও দুর্গতি দমনে বদ্ধপরিকর হয়। দিন দিন তাঁহাদের দল পরিপুষ্ট হইতে থাকে—পরিশেষে তাঁহাদেরই জয়লাভ হয়। প্রকৃত সৎকার্য্যের গতি কে কবে রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে?

জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য যাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যদি বিদেশীয় লোক হইতেন, তাহা হইলে আমরা অধিক পরিমাণে আশ্চর্য্য বা ব্যথিত হইতাম না—আমাদের গভীর বিস্ময় ও মনোবেদনার প্রধান কারণ এই যে, কতিপয় স্বার্থপর বিদেশীয় লোকের উৎসাহে কতিপয় স্বদেশ-দ্রোহী ক্ষমতাশালী মনুষ্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয় সমাজে স্ব স্ব চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্কের পরিচয় দিতেছেন। সেই স্বদেশ-দ্রোহী দলের প্রধান নেতা স্বনাম-প্রসিদ্ধ আলিগড়ের নবাব সৈয়দ আমেদ। পূর্ব্বে আমরা ইহাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, বিবেচক ও স্বদেশ-হিতৈষী বলিয়া জানিতাম। এত দিনের পর তাঁহার প্রকৃত চরিত্র জগতের সম্মুখে আবরণ-মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কুক্ষণে, কুদিনে তিনি আলিগড় কলেজের পণ্ডিত-কুল-তিলক বেক্ সাহেব ও তৎসম স্বভাবাপন্ন স্বার্থপর লোকের কুহকে ভুলিয়া তাঁহাদের কুপরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল, তাঁহাদের উত্তেজনায় তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে যে বিষময় বক্তৃতা করেন, তাহাতেই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ও সহৃদয়তা প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু সে দিনের বক্তৃতায় তিনি তাঁহার প্রতি মুক্তকণ্ঠে অযথা গালিবর্ষণ করিয়াছেন। আমরা বৃদ্ধ সৈয়দকে গালি দিব না, কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধির জন্য দুঃখিত হইব, এবং যাহাতে তিনি শুভমতি প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব।

ন্যায়-বিগর্হিত পথে পথে পরিচালিত ভ্রান্ত সৈয়দের কু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আবদুল লতিফ ও আমির-আলি-প্রমুখ

কলিকাতাস্থ মুসলমান সম্প্রদায় এই সমিতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদের অপকার্য্য সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাহিনা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানীয় সুশিক্ষিত ও সহৃদয় মুসলমানগণ জগতের নিকট তাঁহাদের দুষ্কার্য্যের পরিচয় দিতেছেন। অল্পদিন হইল খ্যাত নামা রাজা শিব প্রসাদের প্ররোচনায় বৃদ্ধ কাশী-রাজ ও ইহার বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইলবার্ট বিলের আন্দোলন কালে অল্পবুদ্ধি শিবপ্রসাদের চরিত্র জগতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, অতঃপর তিনি তাঁহার স্বদেশ-দ্রোহীতা ও তাহার পৃষ্ঠ পোষক বিবিধ অপকার্য্য প্রভাবে জাতীয় ইতিহাসে অমরতা লাভ করিতে চলিলেন! ধন্য রাজা শিব প্রসাদ! তুমিই ঠিক বুঝিয়াছ, জগতে কি রূপে অক্ষয় অমরতা লাভ করিতে হয়!

সংপ্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আর এক মহাত্মা জাতীয় সমিতির শত্রুরূপে দেখা দিয়াছেন—ইনি ভিঙ্গার রাজা। অল্পদিন হইল ইনি জাতীয় সমিতির বিপক্ষে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া অথবা কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা লিখাইয়া লইয়া তাহাতে সমিতির উদ্দেশ্যের বিস্তর অন্যায় নিন্দাবাদ করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর উহাতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, জাতীয় সমিতি এদেশের বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর মূলোচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র-শাসন-(Democracy) প্রবর্ত্তনে যত্নবান হইয়াছেন। এই পুস্তকখানি লইয়া ভারত-বিদ্বেষীগণ কতই প্রলাপ বকিতেছেন—তাঁহাদের সমাজে রাজা বাহাদুরের কিছু প্রতিপত্তিও হইয়াছে। আমরা কিন্তু তাঁহার মূর্খতা ও দুর্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। তিনি জাতীয় সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানিয়া, না বুঝিয়া যে উহার প্রতি শীঘ্র দোষারোপ পূর্ব্বক উহার কার্য্যে ঘোর বিঘ্ন জন্মাইতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা লজ্জাজনক বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সকল স্বার্থপর মহাত্মাগণের মুখ-পাত্র স্বরূপ এদেশের চির শত্রু ইংলিশম্যান, পায়োনিয়ার ও সিভিল-মিলিটারি গেজেট প্রভৃতি পত্রিকার দুর্ম্মতি-গ্রস্ত সম্পাদকগণ জাতীয় সমিতির পৃষ্ঠপোষক সুশিক্ষিত দলকে রাজ-বিদ্রোহী প্রতিপন্ন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতেছেন। অল্পদিন হইল "Sedition and its antidote" অর্থাৎ "রাজবিদ্রোহ ও তৎনিবারণের ঔষধ" শিরোনাম যুক্ত একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক শিক্ষিত ভারতবাসীগণকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন, এবং জাতীয় সমিতির উচ্ছেদ, সাধন ও দেশীয় সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে মুক্ত হৃদয়ে পরামর্শ দান করিয়াছেন। এই সকল দুষ্টাশয় লোকের উৎসাহে দেশের দুই এক স্থানে দুই একজন তোষামোদ-প্রিয় অসার পদ-গৌরব-লোলুপ ক্ষমতাশালী লোক বিশেষ বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনই উহার উদ্দেশ্য বিফল করিতে সমর্থ হইবেন না। এ পর্য্যন্ত যে সকল দেশীয় লোক উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই এবং অধিকাংশ লোক ভারত-বিদ্বেষী উচ্চপদস্থ বিদেশীয়-গণের উত্তেজনায় এরূপ অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়াছেন। আমি তাহাদের সৎ সাহস ও সত্যানুরাগের দোহাই দিয়া

জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা আপন আপন হৃদয়ে স্বস্ব হস্তার্পণ করিয়া প্রকৃত সত্য কথা কি তাহা প্রকাশ করুন, তাহা হইলে তাঁহাদের বাক্য হইতেই প্রমাণ হইবে, তাঁহাদের দুষ্কার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক বর্ণ সত্য কিনা। সম্প্রতি একজন উচ্চপদস্থ হয়দরাবাদ-বাসী মুসলমান জাতীয় সমিতির প্রতি তাঁহার আস্থা ও সহানুভূতি না থাকার প্রকৃত কারণ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন—তাহা শুনিলে আপনারা হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। তিনি বলেন—If any good comes of the agitation, I shall share it along with others in the country; where as if the Government should turn against it and its supporters, I shall be unheart. Opposition to the congress, you know, means, loyalty to the British Government, and you cannot too forcibly impress upon the rulers that you are full of the latter." আপনারা যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বিপক্ষদলের মধ্যে এইরূপ কুসংস্কার ও ক্ষুদ্র ভাবাপন্ন অনেক লোক বাহির হইয়া পড়িবেন।

আমরা ভ্রান্ত সৈয়দ আমেদ, বৃদ্ধ কাশি-রাজ, দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্ত শিব প্রসাদ, অদূরদর্শী ভিঙ্গ-রাজ প্রভৃতি মহাশয়গণকে অমান্য করিতে এবং গালি দিতে ইচ্ছা করি না—তাঁহারা স্ব স্ব দুর্ব্বুদ্ধি ও অবিবেচনা প্রভাবে স্বদেশের উন্নতির মূলে যে কি প্রবল কুঠারা-ঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন না। আর কিছুদিন পরেই তাঁহাদিগকে এই মৃত্যুর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—তাঁহাদের জীবনের অবশিষ্ট দিন হয়ত তাঁহারা বিশেষ গৌরবজনক রাজ-সম্মানে কাটাইতে পারিবেন;—কিন্তু হায়! কে এখন তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের প্রিয় বংশধরগণ চিরকালের জন্য তাঁহাদের দুষ্কৃতির বিষময় ফলভোগ করিবে? কর যোড়ে প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর এই সকল হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য ভ্রান্ত স্বদেশ-দ্রোহী ব্যক্তিগণকে শুভ-মতি প্রদান করুন—তাঁহার অনুগ্রহে ইহাদের হৃদয়ের অন্ধকার ও মনের ক্ষুদ্রভাব দূর হউক, —ইহাঁরা স্ব স্ব দুষ্কৃতির জন্য অনুতপ্ত-হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষী দলের সহিত মিলিত হইয়া প্রিয় জন্মভূমির কল্যাণসাধনে যত্নবান হউন।

মহাশয়গণ, আমি ইতিপূর্ব্বেই অনেক সময় অধিকার করিয়াছি। আমার দুই এক জন সহযোগী কিছু কিছু বলিতে প্রস্তুত আছেন, এজন্য আমি আর অধিকক্ষণ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিব না। উপসংহার কালে উক্ত মহাসমিতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ করিয়াই আমি উপবিষ্ট হইব। যাঁহারা এই মহাসমিতির প্রাণ-স্বরূপ, তাঁহারা যে কি মহান্ পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেই দিব্যজ্ঞানে বুঝিতে সমর্থ। দেশের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রীতি-মুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিতে-ছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ সাবধানে ও দক্ষতা এই মহাব্রত সাধন করিতে হইবে, আজি কালি কোন কোন ক্ষমতাশালী লোকদিগকে এই সমিতির শত্রুবেশে প্রকাশিত হইতে দেখা যাইতেছে—এই সকল ভ্রান্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন লোকদিগকে উহার যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের ভ্রম ও বিদ্বেষভাব দূর করিতে হইবে, সামান্য বিবেচনার ত্রুটিতে যেন শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি না হয়। আমাদের দেশের কোন কোন সংবাদপত্রে এই সকল

বিপক্ষদলের প্রতি সময়ে সময়ে ঘোর বিদ্রূপ ও কঠোর গালি বর্ষণ দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। অভদ্র ব্যবহার ও উদ্ধত স্বভাবের বশবর্ত্তী হইলে মহৎ উদ্দেশ্য সংশাধিত হয় না, নম্রভাব, সৌজন্য ও মিষ্ট কথায় জগতের অনেক মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-বীর মহাত্মা খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "যদি কেহ তোমার এক গণ্ডে আঘাত করে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে অপর গণ্ডস্থল ফিরাইয়া দিবে, এই উপদেশের কি জ্বলন্ত ভাব! এই রূপ কঠোর সহিষ্ণুতা ও আত্ম-নিগ্রহ প্রভাবে মহা সন্ন্যাসী খ্রীষ্ট মৃত্যুর জগতে কি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশে অমরতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ধর্ম্মানুরাগী মিসনরিগণ আমাদের চক্ষু সম্মুখে কত সময়ে তীব্র লাঞ্ছনা ও বহুবিধ বিঘ্ন বিপত্তি ভোগ করিয়াও অবিচলিত উৎসাহের সহিত যেরূপ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, তাহা মনে হইলে বিস্মিত হইতে হয়। জাতীয় মহাসমিতির নেতাগণের মহাত্মা খ্রীষ্টের জ্বলন্ত উপদেশ ও মিসনরিগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। শত সায়েদ আমেদ, শত শিব প্রসাদ ও শত ভিজ রাজ আমাদিগকে নিতান্ত পরুষ ভাষায় গালি দিলেও আমরা যেন ধৈর্য্যচ্যুত না হই। উহার প্রতিদানে আমরা তাঁহাদিগকে গালি দিব না, কিন্তু ধীরভাবে তাঁহাদের ভ্রম সংশোধনে যত্নবান হইব। যদি কখনও কোন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ঘোর বিপক্ষতাচরণ পূর্ব্বক উহার লক্ষ্য-পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলেও যেন আমাদের সহিষ্ণুতা অটল থাকে—আমরা যেন তাঁহাকে শ্রুতিকঠোর বাক্যে গালি দান বা অবমাননা না করি। তখন আমরা ধীরভাবে এই কথা বলিয়া তাহার সহানুভূতি আকর্ষণে যত্নবান হইব;—'আমাদের অভাব রাশি দূর করিবার জন্যই আমরা ইংলণ্ডের সহায়তা ভিক্ষা করিতেছি—ইংলণ্ডের সাহায্য ভিন্ন আমাদের উত্থানের আশা নাই—ইংলণ্ড অনুগ্রহ পূর্ব্বক সুশিক্ষা দানে এ দেশের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়াছেন—ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংলণ্ডের বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠে আমরা তাঁহার মহত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছি। ইংলণ্ডেশ্বরীর ইয়ুরোপীয় এবং অন্যান্য উপনিবেশের প্রজাগণ বিবিধ রাজনৈতিক স্বাধীনতার অমৃতাস্বাদ উপভোগে কত সুখী! ইংলণ্ডের কৃপায় আমরা আমাদের ন্যায্য রাজনৈতিক অধিকার বুঝিতে পারিয়াছি—তোমরা আর কতদিন আমাদিগকে সেই ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবে? আমরা ইংলণ্ডের আধিপত্য হইতে বিমুক্ত হইতে চাই না—আমরা তাঁহার সুশাসনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সম্পদ ভোগ করিতে চাই। এই জাতীয় মহাসমিতি ২৫ কোটী ভারতবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপে তাহারই জন্য লালায়িত। এই মহা সমিতি ভারতে ইংরেজ রাজত্বের উৎকৃষ্টতম ফল—ইংলণ্ড এ দেশে যে সকল মহৎকার্য্য করিয়াছেন, এ দেশে যে সুশিক্ষা ও সুশাসন বিস্তার করিয়াছেন, ইহা তৎসমুদায়ের সারভূত অত্যুজ্জ্বল ফল—উহা এ দেশের সুখ শান্তি ও ইংলণ্ডের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ইংলণ্ডের সহায়তা ভিক্ষা করিতেছে। তবে কেন

তোমরা উহার কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছ—তবে কেন তোমরা উহার অনুষ্ঠাতাদিগকে রাজবিদ্রোহী প্রমাণপূর্ব্বক উহার বিলোপ সাধন ও ভারতে অশান্তি ও অন্ধকার আনয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছ? তোমরা আজন্ম স্বাধীনতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছ—আমাদিগকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতে সাহায্য দান করিলে তোমাদের যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় হইবে। আজি চারি বৎসর হইল জাতীয় সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে—এখনও উহার বাল্যাবস্থা—এই বাল্যাবস্থায় উহার সমস্ত ত্রুটী মার্জ্জনীয়—তোমরা উহাকে সহায়তা দান করিলে উহার উদ্দেশ্য অচিরে সফল হইবে এবং তোমাদের সুযশ চারিদিকে ঘোষিত হইবে। আমরা বিপক্ষদলকে তীব্রভাষায় আক্রমণ না করিয়া এইরূপে তাহাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে যত্ন পাইলে আমাদের শত্রুসংখ্যা হ্রাস হইবে। জাতীয় সমিতির প্রাণস্বরূপ মহাশয়গণ এইরূপ ধীরভাবে পরস্পরের ভালবাসা ও সহানুভূতি অধিকারপূর্ব্বক নির্ভয়ে কার্য্যক্ষেত্রে ধাবিত হউন, জগদীশ্বর তাঁহাদের মস্তকে শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন—তাঁহার অনুগ্রহে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির বিজয় লাভ হইবে।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

আভাস।

সুখক সপন অব, কাঁহা গেল টুটই,
সুখনিশি ভেল অবসান।
এক এক করি, দিয়া সব নিভি গেল,
না রহল একো নিশান॥
বিহসি বিহসি সুখ, চান্দ যো উয়ল,
অবহুঁ সে কৈল পয়ান।
উজরই অন্তর, তুরত ডুবল জনু,
মেহকি বিজোরি সমান॥
বিজোরি চমক দেল, বজর গিরল নহি,
দহইতে দগধ পরাণ!
ভাগক লিখন, কুহর ময় কাকো
এহিতো জগকি বিধান॥
স্বপন-আবেশময়, সুরভি কুসুম চুনি,
গাঁথনুঁ হার দ্যুতিমান।
জাগত না পেখনুঁ, একো কুসুম কলি,
সুন্দর সুখক নিদান!!
মোহন মুরতি হৃদে, জাগয়ে অনুখণ,
প্রেমকি চারু নিধান।
দিবস গোঁয়ায়লু, বিসরলুঁ আপহি,
হেরই যাকো বয়ান॥
পেখলু সঘনহি, আশ বাঢ়ায়লুঁ,
তিরপিত না ভেল নয়ান।
অমিয়া তড়াগা, তুরিতে শুখায়ল,
না ভেল তাহে সিনান॥
পরাণ ভরিয়ে ময়, শুননে না পায়লুঁ,
মিটল সে বীণক তান।
হিয়াক আশ ঔ, পিয়াস ছুটল নহি,
টুটল না হৃদয় পাষাণ!!
রোই রোই তেঁই, তিতল ধরণীতল,
হারালুঁ আপনা গেয়ান।
যৈথন তৈথন, ইহ মোহি ভাবনা,
ইহ মঝু নিয়ত ধেয়ান॥
বিদগধ হিয়া, পর-বোধিতে ঐছন,
নাহিক কঁহু কছু আন।
দুখকি এ সোঙরণ, হিয়াক ছোসর ভেল
যাবত জীয়ব পরাণ॥

বন্দী।

"স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।"
রবীন্দ্রনাথ

ভুলায়ে রেখেছে মোরে
তোর নয়নের তারা,
ওই আঁখি পানে চেয়ে
পরাণ পাগল পারা;
বিশ্ব যায় ভেসে ওরে
কত বল রাখি ধরে?
কেমনে বা রাখি ধরে
আমি যে আপন হারা!
আকাশে যখন চাই
শশী তারা কিছু নাই,
শুধু জাগে ওই ওই
তোর নয়নের তারা!
এ বিশাল বিশ্ব হেন
ছোট হয়ে গেছে কেন?
আমারে ঘিরেছে যেন
এক স্বপনের কারা!
এ কারা ভাঙ্গিয়ে দেরে
নয়ন ফিরায়ে নেরে,
মুক্ত প্রাণ দোব তোরে
ইচ্ছা করে দিব ধরা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

মৃত্যু-মুখে।

অবশ শীতল দেহ
প'ড়ে আছে শয্যা পরে,
নিশ্চল ভাবেতে হায়
অযতনে অনাদরে।
সুনীল নয়ন তারা
নিষ্প্রভ, মলিন প্রায়,
মরণের ছায়া পশি
মুছিয়া আসিছে হায়!
অবশ অচল কর
অবশ বুকের পরে,
প্রাণখানি বুঝি হায়
রাখিছে চাপিয়া করে;
কম্পিত অধর মৃদু
কি যেন বলিতে চায়,
যাতনায় ফুটিতেছে না
শেষ কথা, তাও হায়!
সব সাধ রাখি হেথা,
স্নেহের বন্ধনী খুলে,
মিশি'ছে জীবন তার
নিশীথ আঁধার কোলে;
প্রভাত হইবে নিশি,
জগত ভাসিবে সুখে,
হাসিবে তেমনি ফুল
উষার কনক বুকে,
সুধুই একটী হাসি
বিলীন হইবে ভবে,
মনেও রবে না কার (ও)
কে ছিল কোথায়, কবে!
প্রভাতে তেমনি ক'রে
পাখীরা গাহিবে গান,
একটী শ্রবণে শুধু
পশিবে না সেই তান;
রবেনাকো চিহ্নমাত্র
অনন্ত ধরণী ধামে,
অভাবে লাগিবে ব্যথা
দুদিন স্বজন প্রাণে!
যে গেল, সে গেল সুধু
সকলি তেমনি রবে!
স্মৃতি তার, তাও হায়
দুদিনে বিলীন হবে।

শ্রীপ্রমীলা বসু।

ছায়াময়ী।

১

গলিত কাঞ্চন জনু
রূপের রুচির তনু,
নয়নে অমৃত মাখা বিজলি নিকলে,
দশনে কুন্দের রাশি
অধরে মধুর হাসি,
গভীর যৌবন এত নাহিক ভূতলে!

২

মাধুরীর নাহি ওর
পরিমলে তনু ভোর,
যেন কুসুমের শোভা কম কলেবরে,
নিতম্ব তটিতে ঘন,
খেলা করে অনুক্ষণ,
নীরদ-চিকুর বাঁধা বিজলির ঘরে;

৩

হৃদয় কমল মাঝে,
সরম মিলিত লাজে.
মরমে প্রেমের বিভা—শুকতারা ভায়,
চলনে কুসুম দোলা,
আপনি আপন ভোলা
প্রকৃতিরে ভালবেসে সদা সুখ পায়।

৪

এ নন্দনে বাস যার,
সফল তপস্যা তার,
গাঢ় ধ্যানে উঠে প্রাণে অমৃত উচ্ছাস;
অতনু বিঁধেনি বাণ,
পবিত্র এ তীর্থ স্থান,
সারল্য ছড়ায়ে দেয় সুরভি নিশ্বাস;

৫

কোথা জটি জটাধর?
মদনেরে ভস্ম কর,
কলঙ্কের চোকে যেন হেথা নাহি চায়,
এরূপ—মণির পারা,
ক্ষরে স্নিগ্ধতার ধারা,
মলয় পবন বাঁধা কল্পনা-কারায়।

৬

গিরি শিরে নবঘন,
ক'রে বালা দরশন,
হরষে বরষে সুখে নয়নের জল,
ময়না ধরিলে তান,
কাণ পেতে শোনে গান,
স্বরলয়ে চিন্তা দলে করে সুশীতল।

৭

মাধুর্য্যে গঠিত বীণা
একি! ভোরা!! স্বার্থহীনা?
প্রকৃতির ঘরে নব উমার প্রতিমা,
বনফুলে গাথি মালা,
কত সুখ পায় বালা,
প্রতি অঙ্গ ঈশ্বরের প্রকাশে মহিমা।

৮

মৃদুল চলনে চলে,
ফুল-হার দিয়া গলে,
প্রতিপদে শিরীষের বিকাশে যৌবন,
তাজগৃহে * মনোরম
বীণার ধৈবত সম,
রঙ্গমল্লী কথাগুলি মানসরঞ্জন।

৯

ফুলময়ি—এ হৃদয়ে,
কাম যাক ভস্ম হয়ে,
দেবীর মতন ভালবাসিব তোমায়,
শিব প্রাণ না পাইলে,
তু হেন কি নিধি মিলে,
এ নিধি জীবন্ত শক্তি তপের সহায়:

* তাজমহল।

১০

আদর্শ প্রেমের গেহ,
নিরখিতে চায় স্নেহ,
বিশ্বে তুমি কল্পনার মাত্র উপাদান,
চাঁদের পরাগ ছানি,
গঠিত তনুয়া খানি,
শিশিরের পরমাণু দিয়া গড়া প্রাণ।

১১

মহা বিরহেতে ভোর,
হয় দেহ হোক মোর,
আঁখি-রসনায় মধু করাইব পান;
ধরিয়া নিবৃত্তি অসি,
কামের কবরে বসি,
তুমি আমি দুইজনে গাব নব গান।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

শ্মশানে বালিকা।

নীরবে, শ্মশানভূমে, চিতার অনলধূমে,
কার দেহ দগ্ধ হ'য়ে যায়!
কে বালিকা অভাগিনী, ম্লানমুখী বিষাদিনী,
তীরে বসি ধীরে ধীরে চায়।
এলো থেলো কেশরাশ, শিথিল অঞ্চল পাশ,
নীলপদ্ম নয়ন যুগল—
দুখানি মেঘের মত, মাটী পানে অবনত,
অশ্রুভরে করে টল মল!
হৃদয়ের অশ্রুরাশি আঁখির দুয়ারে আসি,
বাহিরিতে পথ নাহি পায়,
অন্তরে উঠিছে ঢেউ, বাহিরে জানিবে কেউ
তাই বালা নীরবে লুকায়!
মনে সাধ, একবার ভাঙ্গিয়া হৃদয় দ্বার,
শোকভার ফেলে বাহিরিয়া,
কে যেন হৃদয়দেশে পশিয়া নিষ্ঠুর বেশে
বজ্র করে ধরিছে চাপিয়া!
কম্পিত পবন ভরে, অগ্নিশিখা ধূ ধূ করে,
নিম্নদেশে তটিনী বহিছে!
বালিকার কাণে কাণে, অস্ফুট বিলাপতানে
কেঁদে কেঁদে কি যেন কহিছে!
দগ্ধ শব গন্ধ ল'য়ে, বাতাস যেতেছে ব'য়ে
বালিকার ঘিরিয়া চৌধার;
ক্ষুব্ধ, লুব্ধ শিবাদল, করি ঘোর কোলাহল,
থেকে থেকে করিছে চীৎকার।
সে মহা বিকট স্বরে, শ্মশান কম্পিত করে,
কূলে কূলে প্রতিধ্বনি ছুটে,
ভেদিয়া তরঙ্গ স্তর, সে মহা ভীষণ স্বর,
পরপারে পড়িতেছে লুটে!
ক্রমে বেলা অবসান, দিবসের শেষ গান,
সাঙ্গ হ'য়ে এ'লো ধীরে ধীরে।
দু একটী আলোরেখা, এখনও যেতেছে দেখা,
ইতস্ততঃ উচ্চ তরুশিরে।
নিম্নে, তটিনীর জলে, খেয়া তরী ভেসে চলে
দিবসের শেষ পাড়ি ধরি;
ধাইছে বিহঙ্গ দল, করি উচ্চ কোলাহল,
নিজ নিজ নীড় লক্ষ্য করি।
আকুলি, বালিকা প্রাণ, পথিক গাহিল গান—
"এ জীবন খোয়ালি অভাগি—
থাক্ তুই অশ্রু ল'য়ে, শ্মশানে যোগিনী হ'য়ে
ঘরে ফিরে যাবিরে কি'লাগি!
সে গানে পূরিয়া যায়, তটিনী বিলাপ গায়,
তরু লতা স্তব্ধ ক্ষণকাল,
উর্দ্ধশ্বাসে বায়ু বহে, জগতে সংবাদ কহে,
"বালিকার ভাঙ্গিল কপাল!"
এ দৃশ্য দেখিয়া রবি, শোকে দগ্ধ তাম্রছবি,
সিন্ধুজলে নীরবে ডুবিল।
বিষাদে কাঁদিল ধরা, নদীতে ডুবিল ভরা,
চিতানল ক্রমশঃ নিবিল!

শ্রীযদুনাথ ঘটক

ঝান্সীর রাণী।

(সমালোচনা।)

ঐতিহাসিক উপন্যাস, শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত, কলিকাতা ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ২৲ দুই টাকা, মফঃস্বলে ডাক মাস্থল ৵০।

এই উপন্যাস খানি একটী বিশেষ উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে, সাধারণতঃ উপান্যাসাদি যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়া থাকে, চণ্ডীবাবু কেবলমাত্র সেইরূপ কাব্যরসের বিকাশ দেখাইবার নিমিত্ত, মানব চরিত্রের প্রতিলিপি তুলিয়া লোকের সম্মুখে ধরিবার নিমিত্ত, এ গ্রন্থখানি লেখেন নাই। তিনি ভূমিকায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "ইংরেজ লেখকগণ ঝান্সীর রাণী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইর চরিত্র অনর্থক কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, * * * * * * লক্ষ্মীবাইর চরিত্রের এই বৃথা কলঙ্ক নিরাকরণার্থ ঝান্সী-বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন পূর্ব্বক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি উপন্যাস আকারে লিখিত হইলেও ঐতিহাসিক সত্য অবিকৃত রহিয়াছে।"

মানুষ মানুষের যতপ্রকার ক্ষতি করিতে পারে, তন্মধ্যে সুনামের হানি করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ক্ষতি বলিয়া আমি মনে করি। ইংলণ্ডের অমর কবি সেক্সপিয়র বলিয়াছেন, "যে আমার টাকার থলি আমার নিকট হইতে অপহরণ করে, সে আমাকে কতক গুলি [illegible]ল্যহীন পদার্থ হইতে বঞ্চিত করে ম[illegible] [illegible]ন্তু আমার সুনাম হইতে যে আমাকে ব[illegible] করে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সর্ব্বস্ব হরণ করে।" বস্তুত চরিত্রই মানবের এক মাত্র নিজস্ব, ইহকালে পরকালে সর্ব্বত্রই তাহার নিজের, একমাত্র চরিত্র বলেই মর মানব অমর হইতে পারেন, এই অতুলনীয় সম্পত্তির অপকারকারীগণ যেরূপ জঘন্য এবং নীচ প্রকৃতি, পক্ষান্তরে আবার অকারণ কলঙ্কিত মহচ্চরিত্রের কলঙ্ক কালিমা অপনয়ন করা সেইরূপ মহদন্তঃকরণের কার্য্য। সুতরাং চণ্ডীবাবুর উদ্দেশ্য যে মহৎ, সে বি ষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকা পড়িয়া আমাদের মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইল, আমরা এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াও সে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারি নাই। গ্রন্থকর্ত্তা "ঐতিহাসিক সত্য" কাহাকে বলেন? কোন্ তারিখে কোথায় কি ঘটনা হইয়াছিল, কেবল তাহাই কি তাঁহার "ঐতিহাসিক সত্য," না প্রত্যেক ঘটনার সহিত যে যে ব্যক্তির যেরূপ সংশ্রব ছিল, যে প্রকার মনোগত ভাব হইতে, যিনি যে প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের যথাযথ বর্ণনাকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিব? আমরা ত ঐতিহাসিক সত্য বলিলে কেবল শেষেরটীই বুঝি। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ঐতিহাসিক সত্য এ দুইটী বাক্যের অর্থমধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। আমরা এ সম্বন্ধে যখন তাঁহার মত পরিষ্কাররূপে জানিতে পারিলাম না, তখন অগত্যা আমরা যাহা বুঝি, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে কথা বলিতে হইবে।

আর একটী কথা ; "ঐতিহাসিক সত্য" (আমরা যে অর্থে বুঝি) অবিকৃত রাখিয়া কি ভাল উপন্যাস লেখা যায় ? ইতিহাস-লেখক সম্পূর্ণরূপে সত্যের দাস। যেখানে যাহা ঘটিয়াছিল, যে ভাবে ঘটিয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে যে যে উপস্থিত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি যাহা বিশ্বস্তসূত্রে জানেন, সে সমুদয় তিনি যথাযথ বর্ণন করিবেন ; তৎপর প্রত্যেক ব্যক্তির মনোগত ভাব, এক ঘটনা হইতে অপর ঘটনার উৎপত্তি বা একের সহিত অন্যের যে সংশ্রব, তাহা সেই ঘটনা শ্রেণী হইতে নির্দ্ধারণ করিবেন। তিনি যদি একটী ঘটনার ও একটী স্বকপোলকল্পিত কারণ উদ্ভাবন করেন,কি এক ব্যক্তির প্রতি যদি অন্যকৃত কার্য্য আরোপ করেন, তবে আর ঐতিহাসিক সত্য অবিকৃত থাকে না। কাযেই ইতিহাসলেখককে রসাদি-নিরপেক্ষ হইয়া কেবল মাত্র সত্যেরই অনুবর্ত্তন করিতে হয়। কল্পনাশূন্য, অলঙ্কারশূন্য নীরস বিবরণী উপান্যাস নহে, আবার কল্পিত রসযুক্ত কোন বিষয়ই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই আমাদের বিশ্বাস যে, ঐতিহাসিক সত্য অবিকৃত রাখিয়া ভাল উপান্যাস লিখিতে পারা যায় না।

এখন দেখা যাউক, চণ্ডীবাবু যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য কত দূর পর্য্যন্ত সফল হইয়াছে। ঝান্সীর সিপাহীগণ যে দিন নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় নিরাশ্রয়া রমণীগণের এবং দুর্ব্বল শিশুদিগের রক্তে পুণ্যভূমি ভারত-বক্ষ পঙ্কিল করিল, সে দিন লক্ষ্মীবাই ঝান্সীতে ছিলেন, বিদ্রোহ-চরেরা পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্মীবাইর নিকট যাতায়াত করিতেছিল, এবং এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে লক্ষ্মীবাই ইংরেজদিগের অনুমতিগ্রহণান্তে প্রাসাদ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কয়েকজন নূতন সৈন্যও নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরক্ষণেই তিনি ইংরেজাপহৃত নিজ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, সেই নৃসংশ কাপুরুষ হত্যাকারীগণই তখন তাঁহার অনুচর হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তন করিতে লাগিল। তিনি একজন হত্যাকারীকেও নিজের রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিলেন না, বা এক জনকেও তাঁহার সম্মুখে আসিতে পর্য্যন্তও নিষেধ করিলেন না। সুতরাং ঝান্সীর রাণী হয় এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন,আর না হয়, এইরূপ নৃশংস কাপুরুষোচিত কার্য্য পরে অনুমোদন করিয়াছিলেন ; আশুদৃষ্টিতে এই দুই মীমাংসার এক মীমাংসাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীবাবু লক্ষ্মীবাইর চরিত্র হইতে কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত কি প্রমাণ দিয়াছেন ? লক্ষ্মীবাইর লিখিত কোন চিঠিপত্র,কি বিপক্ষ ইংরেজের রিপোর্ট হইতে তাহার নির্দ্দোষিতার কোন প্রমাণ, অথবা ঝান্সী-নিবাসী লক্ষ্মীবাইর সমকালীয় উপযুক্ত অবস্থাপন্ন কোন ব্যক্তির মৌখিক প্রমাণ ব্যতীত,কেবল কবির কল্পনা-প্রস্রবণ নিঃসৃত উষ্ণজলে এ কালিমা প্রক্ষালন করা যায় না। চণ্ডীবাবু, লক্ষ্মীবাইর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। তিনি যে চেষ্টা করিলে পারিতেন না, আমরা সে কথা বলিতেছি না, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থকারের বিশ্বাসই একমাত্র লক্ষ্মীবাইর স্বপক্ষ প্রমাণ। দুঃখের বিষয় যে, এইরূপ বিশ্বাস[illegible] যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি[illegible]রে

না, এবং কাহারও স্বীকারও করা উচিত নয়। কাযেই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল যে, গ্রন্থকর্ত্তা যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সাধনে তিনি সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক অংশ সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যায় না। কোন্ কথাটী ঐতিহাসিক কোন্ কথাটী ঔপন্যাসিক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কাল্পিতে কোন সনের কোন তারিখে যুদ্ধ হয়, কাণপুরের হত্যাকাণ্ড কোন দিন হয়, কোন যোদ্ধা কোথায় যুদ্ধ করে, এই বিষয়গুলিই যদি কেবল ঐতিহাসিক হয়, তবে ঐতিহাসিক সত্য এ গ্রন্থে বোধ হয় অবিকৃতই আছে! আর তাহার যোগীরাজের মুখের কথায় হলকারের প্রতি ইংরেজের আস্থা পুনরায় স্থাপিত হইল, লক্ষ্মীবাই কেবল অনুতপ্তা গঙ্গাবাইর উত্তেজনায় ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন, আর এই লোক-সংহারক সমর ব্যাপার সংঘটন করিবার নিমিত্ত গঙ্গাবাইর আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল লক্ষ্মীবাইর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যে মরিবেন, এইটীই তাঁহার ঐকান্তিক কামনা, এই সমুদয় "ঐতিহাসিক সত্য" না ঔপন্যাসিক সত্য, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এইরূপ সারবিহীন অসত্য ঘটনার বিবরণে তাঁহার পুস্তক পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে আমরা দুইটী মাত্র উদাহরণ দিলাম। যিনি ঐতিহাসিক সত্য অবিকৃত রাখিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে কোন ঘটনাসম্বন্ধে অযথা কারণের আরোপ করা উচিত নয়। গ্রন্থকর্ত্তা লক্ষ্মীবাইকে গঙ্গাবাইর হাতের পুতুল সাজাইতে যাইয়া, লক্ষ্মীবাইকে [illegible]বিহীন স্রোত-ভাসমানা একখানি ক্ষুদ্র তরণী করিয়াছেন। লক্ষ্মী ইংরেজ হস্ত হইতে নিজের রাজ্য উদ্ধার করার বাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে ঝান্সী যখন একান্ত অরাজক হইয়া পড়িল, তখন অবস্থায় বাধ্য হইয়া ঝান্সীর শাসন ভার তিনি হাতে লইলেন। যিনি বলিয়াছিলেন, "জান্ দেয়েঙ্গে লেকেন্ মেরি ঝান্সী নেহি দেয়েঙ্গে," সেই লক্ষ্মী বাইর কি এই চিত্র?

চণ্ডী বাবুর নানাধাহ্নুপান্ত একান্ত গো-বেচারা, ভাল মন্দ কিছুই বুঝে না, তারপর আবার নিতান্ত নীচপ্রকৃতি এবং চক্রী, নাজিম তুল্যার হাতের পুতুল মাত্র। যে নানা নেপালের সীমা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় নিজের কনিষ্ঠাঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া নেপাল প্রান্তে দাহ করিবার কালে বলিয়াছিলেন "পুণ্যভূমি ভারত, তোমাতে এই দেহের তবু কতকাংশ রাখিয়া গেলাম," সেই নানা, আর চণ্ডী বাবুর নানা, কখনও এক ব্যক্তি নহে।

এই নিমিত্তই আমরা বলিতেছিলাম যে, তাঁহার গ্রন্থের কোন কথা ঐতিহাসিক কোন কথা ঔপন্যাসিক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই, কাযেই আমাদের সে সম্বন্ধে কথা বলিতে বিরত থাকাই ভাল। এরূপ গ্রন্থের যে যে অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে ঐতিহাসিক হওয়া উচিত, তাঁহার গ্রন্থের সেই সেই অংশ ভ্রান্তি পরিপূর্ণ, তাহার আমরা গুটিকতক মাত্র উদাহরণ দিলাম। তবে যুদ্ধাদির মাস তারিখ এবং স্থান সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

এখন এই বিস্তৃত গ্রন্থের উপন্যাস ভাগ একবার পাঠকগণ আলোচনা করিয়া দেখুন।

উপান্যাস-লেখকের কয়েকটী গুরুতর দায়িত্ব আছে। প্রথমতঃ তিনি যে সময়ের কোন অবস্থা বর্ণন করিবেন, সেই সময়ে সেই সমাজে ঠিক যে অবস্থা ছিল, তাহা অবিকৃত রূপে বর্ণনা করিতে তিনি বাধ্য। কি কারণে সেইরূপ অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে, কিরূপে বা তাহা বিদূরিত হইবে, তৎসম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। দ্বিতীয়তঃ—গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের চরিত্রে সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত চরিত্রের সামঞ্জস্য ভঙ্গ করিবার অধিকার তাঁহার নাই। মোট কথা, সংসারে যেরূপ প্রকৃতির লোকের দ্বারা যেরূপ কার্য্য হইয়া থাকে বা হইবার সম্ভব, তিনিও সেইরূপ প্রকৃতির লোকের দ্বারা সেইরূপ কার্য্য করাইতে পারেন; সংসারে যেরূপ অবস্থাবলে মানুষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, গ্রন্থেও তিনি সেরূপ পরিবর্ত্তন দেখাইতে পারেন; কিন্তু কারণগুলি পরিস্কাররূপে গ্রন্থকর্ত্তার নিজের ভাষায়, না হয় গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কার্য্য কলাপে বিবৃত থাকা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ—রসহীন ভাবহীন কল্পনাশূন্য উপন্যাস সাহিত্য-ভাণ্ডারের ধূলিকণা মাত্র, স্থতরাং উপন্যাসেও উচ্চ কল্পনা এবং উচ্চ কবিতার সমাবেশ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু উপন্যাসান্তর্গত গদ্য কবিতায় সম্ভবপর বিষয় ব্যতীত অসম্ভব কোন ঘটনা কোন চিত্রে অবতারণা করা যাইতে পারে না। কবি তাঁহার কাব্য-মধ্যে ইন্দ্রসভার পরী আনিয়া ইডেন গার্ডেনে নাচাইতে পারেন, মানুষের আদখানা সাপের আদখানা একত্র করিয়া আঁকিতে পারেন, ঘোড়ার মাথায় ভেড়ার সিং বসাইতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি করিবার অধিকার নাই। মোটের উপর নূতন এবং হৃদয়গ্রাহী, মনোমুগ্ধকারী হইলেই তিনি অব্যাহতি পাইলেন; কিন্তু উপন্যাস-লেখকের কল্পনা এত স্বেচ্ছাচারিণী নহে, তাঁহার তুলি এত উন্মুক্ত হইতে পারে না, তাঁহাকে মানুষ মানুষের মত করিয়াই আঁকিতে হইবে, তবে সৌন্দর্য্য সমাবেশে তাঁহার কল্পনার প্রয়োজন। এ সংসারের বাগান পৃথিবীর লতা পাতায় সাজাইয়াই তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, স্বর্গের পারিজাত আনিয়া সাজাইলে চলিবে না, তবে বিন্যাস চাতুর্য্যে তাহার কল্পনার সাহায্য আবশ্যক। যাহা সম্ভবপর, তাহাই মাত্র উপন্যাস-লেখকের চিত্র করিবার অধিকার আছে, অসম্ভব কিছুই তিনি লিখিতে পারেন না। বঙ্গীয় উপন্যাস লেখকের রাজা বঙ্কিম বাবুর যত্নলালিতা সূর্য্যমুখীকে দেখিতে দেখিতে স্বর্গীয় দেবি বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু আবার পরক্ষণে বিশেষরূপ দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় যে, সম্মুখে মনুষ্য মূর্ত্তিই দণ্ডায়মানা! সূর্য্যমুখী এ সংসারে দুর্লভ বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। ৪র্থ—উপান্যাসলেখক তাঁহার কোন নায়ক বা উপনায়ক, নায়িকা অথবা উপনায়িকার মুখ হইতে কোন বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করাইলে, সেই মত যদি ভ্রান্ত হয়, তবে হয় তাহা নিজের কথায়, না হয় গ্রন্থোল্লিখিত কোন ব্যক্তির কথা দ্বারা সাধারণকে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া তাঁহার উচিত, নচেৎ সে মত গ্রন্থকর্ত্তার অনুমোদিত মত বলিয়াই লোকে মনে করে, এবং সে মত প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্বও গ্রন্থকর্ত্তাকে বহন করিতে হয়। স্থতরাং গ্রন্থকর্ত্তার নিজের প্রকাশিত মত যেরূপ বিশু[illegible] সেই রূপ

গ্রন্থোল্লিখিত কোন ব্যক্তির মুখ নিঃসৃত অনবিবাদিত মতও সেইরূপ বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এখন দেখা যাউক, গ্রন্থকর্ত্তা এই উপান্যাসে উল্লিখিত নিয়ম কয়েকটী কতদূর প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১ম। ১৮৫৭, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবাসী ইংরেজের, মুসলমানের এবং হিন্দুর সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা কতক কতক এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং এবং আহম্মদ খাঁর প্রমুখাৎ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ত্র্যম্বকস্বামীদ্বারা, এক বিংশতিতম অধ্যায়ে তাহার যোগীরাজের এবং সার হেন্‌রী লরেন্সের আলাপে সে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এই কয়েকটী স্থল পাঠ করিলে, দেখা যায়, যে তৎকালীয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থপরতাই সিপাহী বিদ্রোহের একমাত্র কারণ, ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা একটা ভাণ মাত্র। এই স্বার্থপরতা কি? তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, ইংরেজেরা সিপাহীদিগকে উচ্চ বেতন এবং উচ্চ পদ প্রদান করিতেন না, সুতরাং সিপাহিরা সর্ব্বদাই তন্নিমিত্ত ক্ষুণ্ণ থাকিত, এবং ইংরেজের হুকুমে কায করিতে তাহারা কষ্টানুভব করিত; তারপর ইংরেজ আবার দেশের অনেকগুলি প্রধান প্রধান লোককে সম্পত্তিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। এই সমুদয় কারণে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভারতবাসিদিগের অন্তরে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষানল তুষানলের ন্যায় ধীরে ধীরে জলিতেছিল, তাহাই ১৮৫৭খ্রীঃ একটী নিতান্ত অমূলক জনরবরূপ মন্দ মন্দ বায়ু সংস্পর্শে সর্ব্বব্যাপী হইয়া জলিয়া উঠিল। অকস্মাৎ জনরব উঠিল, ইংরেজেরা সিপাহীদিগের ধর্ম্মনাশ করিতেছেন। এই মিথ্যা জনরব শ্রবণে গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজা ধর্ম্মনাশের আশঙ্কার ভাণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের যে সকল নবাব এবং রাজাধিপতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অন্যায়াচরণ এবং দুর্ব্যবহার নিবন্ধন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ প্রদান করিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভারতে আবার দেশব্যাপী সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ, ভারতবাসী প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহ নহে, এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশব্যাপী বিদ্রোহানলও প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল না; ভারতবর্ষের কয়েকটীমাত্র স্থল সিপাহীদিগের ক্রীড়াভূমি ছিল। সিপাহীরাই মাত্র বিদ্রোহী হইয়াছিল, ভারতীয় প্রজাগণ কখনও বিদ্রোহী হয় নাই। চণ্ডীবাবুর লেখাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভারতবাসীগণ যখন পরদুঃখে কাতর এবং অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাই, কুমার সিংহ, বেগম জিনাৎমহল প্রভৃতি আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এটী ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ। লেখক যে সময়ের কথা লিখিতেছেন, সে সময়ে সাধারণ প্রজাবর্গ ইংরেজকে যার পর নাই শ্রদ্ধা করিত, ইংরেজ আসার পর এ দেশে ছোট বড় মধ্যে তুল্যাধিকার আইনত এবং কার্য্যত কতক পরিমাণে স্থাপিত হয়। নানাসাহেবের টাকা দেওয়া হয় নাই, লক্ষ্মীবাইর রাজত্ব ইংরেজ কাড়িয়া লইয়াছে লক্ষ্ণৌর

রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, এ সমুদয় . সাধারণ প্রজার মনে কিছুমাত্র .বদ্বেষ জন্মে নাই, সুতরাং তাহারা বিদ্রোহেও যোগ দান করে নাই। তবে সিপাহীদিগের অনেকগুলি দুঃখের এবং মনস্তাপের কারণ ছিল, কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের বাটা বন্ধকরা হইয়াছিল, তার পর তাহারা দক্ষ যোদ্ধা হইয়াও নবাগত অজাতশ্মশ্রু সম্পূর্ণরূপ অনভিজ্ঞ ইংরেজ যুবকের দ্বারা অনেক সময় অপমানিত হইত। পূর্ব্বে ইংরেজ যোদ্ধৃগণ সিপাহীকে চিনিতেন, সিপাহীও তাহার জাঁদরেল, কর্ণাল, কাপ্তান সাহেবকে চিনিত। অফিসরগণ সেনাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন, সিপাহি অফিসরকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। এই সম্বন্ধ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উঠিয়া যায়। ভারতবাসীর উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্র, ইহাতে ভাল জিনিস রোপণ কর, ভাল ফসল জন্মিবে, কিছু রোপণ না কর, কতকগুলি আবর্জ্জনা ঘাস খড় জন্মিয়া কালে শুকাইয়া পড়িবে। এইরূপে বিদ্রোহানলের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, যাহারা ইংরেজকর্তৃক সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদিগের স্বার্থময় ষড়যন্ত্রে ভুলিয়া সিপাহী উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবেই বিশ্বাস করিল যে, ইংরেজ তাহাদের ধর্ম্মলোপের চেষ্টা করিতেছে। সিপাহীর নিকট প্রাণাপেক্ষা ধর্ম্ম বেশী আদরের জিনিস, কাযেই সিপাহি প্রাণ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এইত আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি, সিপাহিদিগের মধ্যে দুই চারিজন যাহারা এখনও জীবিত আছে, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেও এই কথাই জানা যায়, তবে চণ্ডীবাবু কেন যে ১৮৫৭ সালের দেশময় বিদ্বেষানল, দেশময় বিদ্রোহবহ্নিব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। যদি দেশময় ব্যাপ্ত বিদ্বেষ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইত, তবে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহানল এত সহজে নির্ব্বাপিত হইত না।

২য়—মুসলমানদিগের তৎকালীয় অবস্থাদি সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা এক প্রকার কিছুই বলেন নাই, সুতরাং আমাদেরও সে বিষয়েরআলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

৩য়—হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা অনেক কথা বলিয়াছেন, যেমন, হিন্দুসমাজে বাল্য বিবাহের অনিষ্টকারিতা, বাল-বিধবার প্রতি অসহ্য অত্যাচার, কন্যার অমতে,অথবা বুদ্ধি জন্মিবার পূর্ব্বে অপরিচিত অজ্ঞাতস্বভাব পাত্রে ন্যস্ত করার দোষ, বিধবা বিবাহ না দেওয়ার অপকারিতা, কুলীন ব্রাহ্মণ কুমারীদিগের বর্ত্তমান প্রথানুসারে বিবাহের অনিষ্টকারিতা, হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারকগণের মূর্খতা এবং কাপুরুষতা। হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও কাপুরুষতা অল্লাধিক পরিমাণে সমুদয় বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। এতগুলি বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়, কাযেই আমরা অতি সংক্ষেপে এই বিষয়গুলির আলোচনা করিব। গ্রন্থকর্ত্তার মতে বাল্য বিবাহ বঙ্গদেশে কেবল প্রচলিত ছিল, এ কথাটি সম্পূর্ণ অলীক। বঙ্গেও যেরূপ প্রচলিত ছিল ও আছে, মহারাষ্ট্রেও ঠিক সেইরূপই প্রচলিত ছিল এবং আছে। তারপর বাল্য বিবাহ এবং সম্প্রদান প্রথার অন্যান্য দোষ ব্যতীত তাঁহার মতে একটি প্রধান দোষ এই যে, স্ত্রীর সহিত স্বামীর

প্রকৃত প্রণয় জন্মে না, কেবল সংস্কার বশতঃ স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি করে, এবং সর্ব্ব বিষয়ে আনুগত্য স্বীকার করে। প্রণয় জন্মা না জন্মা সম্বন্ধে বাল্য বিবাহ এবং যৌবন বিবাহের ফল তুল্যরূপ, তবে যৌবন বিবাহেই এ সংস্কারজাত শ্রদ্ধা ভক্তিও অনেকস্থলে থাকে না। আমরা বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু আমাদের সে বিদ্বেষ অন্য কারণ-সম্ভূত। গ্রন্থকার বাল বিধবাদিগের প্রতি অত্যাচার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা বিধবাকে একাহার করিতে হইবে বলিয়া, প্রাতঃকালে সে আহার করিতে বসে, এবং সমস্ত দিন সেই পাত্র সম্মুখে করিয়া একই আসনে উপবিষ্টা অথবা নিদ্রিতা থাকে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় কোন যুবতী বিধবা হইয়া যদি একাদশীর দিন সন্তান প্রসব করেন, তবে তিনি পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মরিয়া গেলেও জল পান না, গ্রন্থকর্ত্তা যে কোথায় এরূপ দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন, আমরা হিন্দুসমাজে কুত্রাপি এ দৃশ্য দেখি নাই বা কখনও শুনি নাই। হিন্দুরা খাদ্যাখাদ্য বিচার করেন, সকলের পক্বান্ন আহারে কুণ্ঠিত, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তার মতে এই সমুদায় ভেদ-জ্ঞান তাহাদের উন্নতির গুরুতর অন্তরায়, সামাজিক ভেদদ্বারা জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু খাদ্যাখাদ্য বিচারে কোন প্রকার দুর্ব্বলতার সম্ভাবনা নাই। একজন মুরগী না খাইয়া পাঁঠা খাইলে, সে যে কেন মুরগীখোর হইতে দুর্ব্বল হইবে, তাহার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। তারপর হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকদিগের মূর্খতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বক্তৃতা করিয়া কোন হিন্দু প্রচারক হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতেন না, সেই সময়ে কখন কখন কোন বিখ্যাত পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপস্থিত হইয়া মতদ্বেষীদিগের সহিত বিচার করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের বিচার, আর গ্রন্থকর্ত্তার শ্রীরামপ্রসন্নের বক্তৃতা, এক ধাতুতে গঠিত নয়। গ্রন্থকর্ত্তা বোধ হয় আধুনিক একটী চিত্র নিয়া তৎকালীয় হিন্দু সমাজের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা যদি অজ্ঞতা নিবন্ধন এরূপ "উদর পিণ্ডি বুধর ঘাড়ে" দিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কতক পরিমাণ ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু যদি কেবল ব্যঙ্গরসোদ্দীপনের অনুরোধে সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন, তবে তিনি যার পর নাই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।

চণ্ডী বাবু গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের চরিত্রে কতদূর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা একবার আলোচনা করা উচিত। ঝান্সীর প্রধানা রাণী লক্ষ্মীবাই, দ্বিতীয়া রাণী গঙ্গাবাই, আনন্দশ্রম স্বামী, ত্র্যম্বক স্বামী এবং তান্তিয়া তুপি এই কয়েক জনই এই গ্রন্থের নায়িকা, উপনায়িকা, নায়ক এবং উপনায়ক। তন্মধ্যে লক্ষ্মী বাই প্রকৃত বীর রমণী, তেজস্বিনী, স্বাধীনা, ততদূর শিক্ষিতা না হইলেও রণ-কৌশল-নিপুণা এবং বুদ্ধিমতী; দিবানিশি তাঁহার হৃদয় ইংরেজ কৃত অপমান স্মরণে ক্ষুব্ধ; তিনি মরিতে পারেন, কিন্তু ইংরেজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে পারেন না; তিনি ঘোর তেজস্বিনী এবং অভিমানিনী; তারপর আবার লক্ষ্মী অত্যন্ত

পতিভক্তিপরায়ণা, স্বামী তাঁহার দেবতা, স্বামীর দোষ গুণ আলোচনা পর্য্যন্ত করিতে তিনি কুণ্ঠিতা, তিনি সাধ্বী হিন্দু বিধবা; ঘোর বিপদে স্থিরচিত্তা, অটলা, অসংখ্য সৈনিকের নেত্রী, রণ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপ ভয়শূন্যা, মৃত্যু তাঁহার ক্রীড়া-সহচর। এরূপ একটী উচ্চবংশীয়া মহারাষ্ট্রীয়া বিধবা মহিলা, যদি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে আর একটী সমধর্ম্মাবলম্বী সমস্বভাব হিন্দুবীরপুরুষের সহিত একত্রে কয়েক দিন রণ ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, একত্রে বসিয়া যুদ্ধাদির মন্ত্রণা করেন, তবে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ ভাব উৎপন্ন হওয়া আপনি সম্ভবপর বলিয়া বোধ করেন? আপনি বলিবেন, পুরুষটী এই অসামান্যা ললনাকে দেবী বলিয়া পূজা করিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন, মহিলাটীও ঠিক তুল্য ভাবে পুরুষটীকে সম্মান এবং ভক্তি করিবেন, এই সম্ভবপর। কিন্তু এই গ্রন্থকর্ত্তা সেই সমরাঙ্গনেই লক্ষ্মী বাইকে ঘোর প্রেম-তরঙ্গে হাবু ডাবু খাওয়াইয়াছেন। এই হিন্দুবিধবা তাণ্ডিয়ার প্রেমে বিচলিতা হইলেন; একটী কুল কামিনী একজন সদ্গুণ সম্পন্ন পুরুষের মাহাত্ম্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে যেরূপ সম্মানের সহিত শ্রদ্ধা করে, এ আবার সে ভাবের ভালবাসা নয়, খাস নির্জ্জলা প্রেম! নায়কের প্রতি নায়িকার ভালবাসা। ৩৭২।৩৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন। এই ভালবাসার গল্পটী যখন ঐতিহাসিকসত্য নয়, তখন গ্রন্থকার ইহা ত্যাগ করিলে কোন প্রকার ঐতিহাসিক বিবরণের অপলাপ হইত না; তবে তিনি যে কি বিশেষ অভিপ্রায়ে তাঁহার আদরের ছবির গায়ে এ প্রেমের বার্ণিস টানিয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভালবাসার মানুষ যত দিন না পাওয়া যায়, ততদিন ভালবাসা উৎপন্ন হয় না। লক্ষ্মী আজ ভালবাসার মানুষ তাণ্ডিয়াকে পাইয়াছেন, তাই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। ভালবাসুন, তাহাতে মানা কি? কিন্তু যে ভালবাসা লোকের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়, যে ভালবাসাকে হৃদয়ে স্থান দিতে আত্মাভিমানকে, লোকলজ্জাকে ডাকিয়া দ্বারে প্রহরী রাখিতে হয়, নচেৎ ভালবাসার স্রোতে প্রাণ ভাসিয়া গিয়া জায়গা বেজায়গায় চড়ায় বাজিয়া মারা যায়, সে ভালবাসার প্রতি আমাদের এক বিন্দুও শ্রদ্ধা নাই। এরূপ ভালবাসা আমরা দিবারাত্রি অনেক স্থানে দেখিতে পাই সত্য, কিন্তু না দেখিতে পারিলেই সুখী হই। এ সুন্দর ছবি, হিন্দুর বড় ভালবাসার জিনিস, বড় যতনের ধন, বিধবা লক্ষ্মীবাইর প্রতিকৃতির গায়ে গ্রন্থকর্ত্তা এ প্রেমের বার্নিসটী না টানিলেই ভাল হইত। এ স্বভাবের সফেদার ফলান রং, স্বভাবের হাতের মার্জ্জনেই চকচকে, ইহার উপর বার্নিসের তুলি ধরিলেই কাল হইয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার এক টানেই লক্ষ্মী, পরম অলক্ষ্মী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

গঙ্গাবাই শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, বালিকাকাল হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত ধর্ম্ম গ্রন্থ, দর্শন, বিজ্ঞান এই সমুদয় পাঠ করিয়াছেন, তিনি মানব হৃদয়ের গূঢ়তত্ত্ব বলিতে পারেন, তবে সংসারের কিছুই জানেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ কাযকাম করাইবার নিমিত্ত পরের মেয়ে নিজের ঘরে নিয়া আইসে, তাহাকেই সমাজে বিবাহ বলে। তাঁহার ভ্রাতা যেদিন তাঁহার পিতামহীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার

পিতার অজ্ঞাতে ঝান্সীর রাজার সহিত তাঁহার অমতে তাহাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে,বিবাহের আরো কোন অভিপ্রায় আছে ; তখন ভয়ে তিনি সেই বিবাহকেই মঞ্জুর করিয়া, রাজার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সঙ্গিনী হইলেন। ছয় মাস পরে তাঁহার পিতৃ শিষ্যকে হঠাৎ আম বাগানের মধ্যে দেখিয়া তাঁহার দুর্ব্বল মনে এত সাহস হইল যে, তিনি রাজাকে স্পষ্ট বলিলেন যে, রাজার হাতের তরবারি দ্বারা তিনি রাজার মাথাই কাটিবেন, এবং সেই দিনই তাঁহার চৈতন্য হইল যে, তাঁহার অমতে ব্রাহ্মণে মন্ত্রপূত করিয়া তাঁহাকে যে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে, সেটা আদৌ বিবাহই নয়। তিনি সেই দিন হইতে রাজার সঙ্গ ছাড়িয়া দিলেন। কেবল জীবন্মৃতা হইয়া জীবিতা রহিলেন।' লক্ষ্মীবাইকে তিনি ভাল বাসিতেন, তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মরিতে পারিলে নিজকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করিতেন, অথচ ফাঁক পাইলেই মৃত স্বামীকে উপহাস করিয়া লক্ষ্মীবাইকে বিরক্ত করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। এ চরিত্রে কতদূর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গ্রন্থকর্ত্তা সক্ষম হইয়াছেন, তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

তারপর 'আমাদের শাস্ত্রীজি অশীতি বৎসর বয়স্ক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত হিন্দু শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি আহার করিতেছেন ৫ পাঁচটা মুরগীর রোষ্ট, মটন চপ, ফাউল-কারি এবং দুই শত খানা লুচি ! তাও আবার টেবিলে বসিয়া !' পাঠক মনে রাখিবেন, এটী ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। (১৬১পৃঃ)। কোন্ হোটেলে পাক, হইয়াছিল, সে কথাটার উল্লেখ নাই। শাস্ত্রীজির কন্যার মুখে শুনিলাম,তিনি বড় মাতৃভক্তিপরায়ণ। কিন্তু মাতা যখন তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার কন্যাকে লম্পটস্বভাব রাজার নিকট বিবাহ দিলেন, তখন তিনি "সর্ব্বনাশিনি, পাপীয়সি," প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে মাকে শীতল করিয়া তাহার দশ মাসের গর্ভক্লেশের মজুরি বাবদে ২০০০ টাকা দিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। সাবাস কর্ত্তব্য জ্ঞান !

যোগীরাজ বা যোগেশ, নানা দুঃখে সংসারী-বৈরাগী, কৌমার-ব্রহ্মচারী, তাঁহার বিশ্ববিস্তৃত প্রেম, এবং ভয়শূন্য, ফলাফল-চিন্তাশূন্য দৃঢ়কর্ত্তব্য জ্ঞান। তিনি বুদ্ধিমান, বিদ্বান, দেশহিতৈষী। গঙ্গাবাইকে বড় ভালবাসেন, সহোদরা ভগ্নীকে যেরূপ ভালবাসিতে হয়, সেইরূপ ভালবাসেন, এবং গঙ্গাবাইকে ঠিক সেইরূপ চক্ষেই দেখেন, তবে বিধবা গঙ্গাকে সুখী করিবার নিমিত্ত তিনি অগত্যা গঙ্গাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। কেবল প্রস্তুত নন, বোকা গঙ্গা অস্বীকার করিতেছে, তিনি তাঁহার সম্মতি জন্মাইবার নিমিত্ত চারি মাস ঝান্সীর বাড়ীতে বসিয়া আছেন। সে বাড়ীতে লক্ষ্মীবাই তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, বিশ্বস্তভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে দেয়, তিনি লক্ষ্মীবাইর অসাক্ষাতে গঙ্গার পিতার অজ্ঞাতে, গঙ্গাকে পিড়াপিড়ি করিতেছেন যে, বিবাহে সম্মতি দাও ! এইটাই নাকি আবার নিঃস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত ! উচ্চভাবের প্রসব !

তাণ্ডিয়ার চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না, তাণ্ডিয়া পেন্সিলে টানা ছবি, তাহাতে আবার "সেড্ও" পড়ে নাই, "লাইট্ও" পড়ে নাই।

এই ত গেল চরিত্রের সামঞ্জস্য, তারপর একবার সামান্য সামান্য ঘটনাবলীর বিন্যাসের দুই একটী উদাহরণ দেখুন ঃ—

ঝান্সীর রাণীর দরবারে সিপাহীরা উপস্থিত, রাণী সিপাহীদিগের পূজ্যা, তিনি যখন ঝান্সীর হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত সিপাহীদিগকে তিরস্কার করিতেছেন, তখন মুসলমানগণ আত্মদোষ প্রক্ষালনের নিমিত্ত রাণীকে বলিতেছে যে, তাহারা মেমদিগকে কলমা পড়াইয়া নিকা করিবে, এই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং তাহারা হত্যা করে নাই। সকল দোষ হিন্দুর ঘাড়ে পড়ে দেখিয়া গুলবক্স জমাদার গাঁজার ধুমা ছাড়িতে ছাড়িতে আসিয়া রাণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল যে, সে বালকগুলিকে বলি দিবে ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বে সম্বক শাস্ত্রীর ফাউলকারি খাওয়ার কথা বলিয়াছি, এখন খানাটা কোথায় বসিয়া হইতেছে, পাঠক একবার দেখুন, হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবতী রমণী নানাধান্ধুপন্তের মাতার স্থাপিত শিবমন্দিরে বসিয়া; শাস্ত্রীজির আবার সব খোলাখালা, নানার মা ত মা, নানার বাবা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে খাইয়াছেন!

এগুলি কি সাময়িক অবস্থানুসারে সম্ভবপর ঘটনা? আমরা স্থানাভাবে আজিমতুল্যার সহিত রাণী সম্বন্ধে নানা, এবং তাঁহার ভ্রাতার কথোপকথন এবং আরো সেইরূপ কয়েকটী অসংলগ্ন এবং অসম্ভব ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ এবং গ্রন্থকর্ত্তা তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই গ্রন্থকর্ত্তার কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা এক রূপ শেষ হইয়াছে, কয়েকটী চরিত্রের মধ্যে গঙ্গাবাই, শাস্ত্রী মহাশয় এবং যোগেশের চরিত্র অঙ্কিত করিতেই তাঁহার যাহা কিছু কল্পনার প্রয়োজন ছিল, তদ্বাদে আর সকলই পুরাতন, পূর্ব্ব চিত্রিত, কেবল লিথু তুলিয়া লইলেই হইল, কিন্তু এ তিনটী চরিত্র আঁকিতেই গ্রন্থকর্ত্তা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তবে এ কথা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, সকল চরিত্রেরই কোন কোন অংশ অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে।

চণ্ডীবাবুর এই গ্রন্থখানির আর একটী বিশেষ দোষ এই যে, সর্ব্বত্রই হিন্দু সমাজের প্রতি তিনি অনর্থক তীব্র উক্তি সকল প্রয়োগ করিয়াছেন। ২৮১ পৃঃ। হিন্দু প্রচারকের ভক্তি চন্দন এবং প্রেমবারি সম্বন্ধে যে সমুদয় ব্যঙ্গোক্তি করা হইয়াছে, তাহা একবার পাঠকবর্গ দেখুন,—হিন্দুপ্রচারক শ্রীরামপ্রসন্ন সেন কামানের শব্দে অবিশ্রান্ত মলমূত্র ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাকেই তাঁহার গ্রন্থোল্লিখিত পদস্থ দুই ব্যক্তি ভক্তি চন্দন এবং প্রেমবারি বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন, অথচ গ্রন্থকর্ত্তা নিজে তাহাদের এ অনুচিত ব্যঙ্গ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছেন না। কাজেই এ পরিহাসে গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ সম্মতি আছে। পবিত্র বিষয় লইয়া এরূপ কুৎসিৎভাবে পরিহাস করা সঙ্গত নহে। গ্রন্থকর্ত্তার ন্যায় লোকের পক্ষে এরূপ রুচির পক্ষপাতী হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় নাই।

গ্রন্থকর্ত্তা অনেক পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য যে মহৎ, সে সম্বন্ধে আর

কোন সন্দেহ নাই, গ্রন্থখানি নিতান্ত অপাঠ্য হয় নাই।

গ্রন্থকর্ত্তা আমার গুরুস্থানীয়, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করি, তবে গ্রন্থের দোষগুলি দেখান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই আমি গ্রন্থের দোষগুলি উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। গ্রন্থকর্ত্তা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

রাজবল্লভের জীবনচরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম;—"যদি মহাত্মা এণ্টনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে মহাত্মা জুলিয়াস্ সিজার আমাদের নিকট নরাধম বলিয়া পরিচিত হইতেন; সিরাজের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে। সিরাজের জন্য অসংখ্য ব্রুটাস্ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা সিরাজের রাজসিংহাসন, রাজমুকুট অপহরণ করিল—তাহাতেও তৃপ্তি নাই, পশুর ন্যায় সিরাজকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিল, তাহাতেও পাপাত্মাদিগের তৃপ্তি নাই, সিরাজের দেহ-খণ্ড গুলিকে হস্তীপদে বন্ধন করিয়া দিল, রাজাধিরাজ সেবিত শেষ বঙ্গেশ্বরের রত্নমুকুট-শোভিত মুণ্ড ধূলি বিলুণ্ঠিত করিয়া সেই হস্তী মুরশীদাবাদের পথে পথে ভ্রমণ করিল। ব্রুটাস্‌দিগের তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। হতভাগ্য সিরাজের দেহে মিথ্যা কলঙ্ক-কালি বিলেপন পূর্ব্বক ইতিহাস পটে তাঁহার এক বিকৃত ছবি চিত্রিত করিয়া অনন্ত কালের তরে সিরাজকে মানব সমাজের ঘৃণার পাত্র করিয়া রাখিয়াছে।"

আমরা বাল্যকালে যে সকল অকর্ম্মণ্য ইতিহাস বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিত আছে—"দুর্ব্বৃত্ত সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই নিবাইস পত্নীর সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ ও সহকারী শাসন কর্ত্তা রাজবল্লভের সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন।" যদি সেই সকল "ইতিহাস-লেখককে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এরূপ করার কারণ কি? তাহা হইলে অমনি তাহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। কারণ, সেই "কারণ" অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া লওয়া তাহাদের সাধ্যাতীত। ঈশ্বর যাহাদিগকে প্রতিভা দেন নাই, মাছি-চিত্র যাহাদের ব্যবসায়, ঐতিহাসিক লেখনী ধারণ করা তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। * * * যাহারা সিরাজের কলঙ্ক রটনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের এরূপ করিবার কোনরূপ স্বার্থ ও প্রয়োজন ছিল কি না, ইহা বিবেচনা করা স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ঐতিহাসিকের কার্য্য নহে। মেলিসন ও টরনস্ প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণ ইহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

পরের দোষ গান করিতে হইলে মানে মানে আপনাকে সেই অবস্থায় স্থাপন পূর্ব্বক বিচার করা উচিত। পাঠক তোমাকে দুইটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

প্রথম—যদি তুমি তোমার মাসীকে জনৈক ভৃত্যের সহিত কুক্রিয়াসক্ত দেখিতে পাও, তাহা হইলে তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিবে কি ?

দ্বিতীয়—যদি তোমার মহালের নায়েব সেই সম্পত্তির উপসত্ব আত্মসাৎ করিয়াও জমাওয়াশীলবাকী প্রভৃতি সমস্ত কাগজ নদীতে বিসর্জ্জন করিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে জেলে প্রেরণ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিবে কি না ?

যদি না পার, তবে সিরাজের নিন্দা করিও না।

সিরাজ তাঁহার ব্যভিচারিণী মাসীর দণ্ডবিধান না করিয়া বিরত হইতে পারেন নাই। বোধ হয় তজ্জন্য কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করিবে না। রাজবল্লভ যে কেবল নিবাইস পত্নীর উপপতি বলিয়া সিরাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, এমত নহে; তিনি ঢাকার রাজকীয় ধনাগার হইতে দুই কোটী টাকা অন্যায়রূপ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। নিবাইস মহম্মদের শাসন কালে ঢাকা "নেয়াবতীর" যে জমাবন্দী প্রস্তত হয়, তাহাতে সেই প্রদেশের রাজস্ব ৫৬ লক্ষ টাকা স্থির হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। নরাধম রাজবল্লভের চক্রান্তে সেই কাগজ নবাবের হস্তে আসিল না। নবাব যখন নিকাসী কাগজ ও রাজস্ব তলপ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইলেন না, তখনই তিনি রাজবল্লভের বাস ভবন অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। পামরের পুত্র পাপিষ্ঠ কৃষ্ণদাস সেই সময় সঞ্চিত ধন ও কাগজ পত্র লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করিল।"

আমাদের দেশে যে সকল ইতিহাস প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই রাজবল্লভের প্রতি সিরাজের অত্যাচারের কথা উল্লেখ হইয়াছে। একজন, ঐতিহাসিক-কুল-কলঙ্ক রঙ্গের উপর রঙ্গ চড়াইয়া বলিয়াছেন, সিরাজ রাজবল্লভের জাতিনাশ করিবার জন্য তাহার বাস ভবনে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন সিরাজ রাজবল্লভের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহা কোন ইতিহাসলেখক উল্লেখ করেন নাই। আমরা সেই অত্যাচারের "কারণ" অনুসন্ধান করত তাহা বান্ধব নামক সাময়িক পত্রে "রাজা রাজবল্লভ সেন" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতেই গ্রন্থকার আমাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। তাহাতেই তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—"কেহ কেহ বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত লিখিতে গিয়া প্রতিভাবলে নূতন নূতন "কারণ" আবিষ্কার পূর্ব্বক পুস্তকাকারে অথবা সাময়িক পত্রিকায় তৎসমুদায় প্রচার করিয়া আপনাকে প্রতিভান্বিত ও কারণজ্ঞ মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন।"

এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সিরাজের নিন্দায় পরিপূর্ণ। সিরাজের প্রতি অন্যান্য লেখকগণ যে সকল অনুচিত দোষারোপ করিয়াছেন, আমরা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া গ্রন্থকার আমাদের প্রতি তাহার "ভোতা কলমকে" শেলের ন্যায় প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন করুন, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু তিনি

অনেক মিথ্যা কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই আমাদের বিশেষ দুঃখের কারণ। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"আলিবর্দ্দির সুশাসনে প্রজামণ্ডলী সুখ সম্ভোগ করিয়া দুর্দ্দান্ত পামর অত্যাচারী সিরাজের নানা প্রকার অত্যাচারে উৎপীড়িত হওতঃ তৎপ্রতিকার উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টিত হইলেন। তখন এই প্রদেশীয় নেতা জমিদার শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব্বকালে রাজনগরের মহারাজ রাজবল্লভ, বরেন্দ্র নাটরের দানশীলা প্রসিদ্ধা মহারাণী ভবানী ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মুরশিদাবাদের প্রসিদ্ধ শেটবংশীয় ধনকুবের জগৎ শেট ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ প্রধান ছিলেন। সিরাজের অত্যাচার প্রধানতঃ এই সকলের উপর ক্রীড়া করিতে লাগিল।"

যাঁহারা দীর্ঘকাল বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ রূপে অবগত আছেন যে, হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে সিংহাসন চ্যুত করিবার জন্য মিরজাফর, মহারাজ দুর্লভরাম, জগৎ শেট ও ইয়ার লতুফর্খাই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কোন পল্লীতে ব্যাঘ্র প্রবেশ করিলে যেমন এক একটী শৃগাল "ফেউ" নাম ধারণ করত তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজবল্লভ, কৃষ্ণ চন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপরোক্ত নর শার্দ্দুলদিগের সহিত "ফেউ" রূপে মিলিত হইয়াছিলেন। এই নর শৃগাল রাজবল্লভ কেন বিশ্বাসঘাতকদিগের সহিত সংমিলিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বিশেষরূপে অন্যান্য প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অপরিণামদর্শিতার পরিচয় "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত" সমালোচনায় প্রকাশ করা হইয়াছে। এস্থলে সেই সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য ও প্রজা কিরূপ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করা সাধ্যাতীত। এজন্য আপাততঃ আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "রাজবল্লভ এইরূপে তৎকালীন প্রচলিত প্রথানুযায়ী উপঢৌকন গ্রহণ জন্য আজকাল উৎকোচগ্রাহী দৌরাত্ম্যকারী শব্দেও বিশেষিত হন।"

রাজবল্লভ যদি কেবল তদানীন্তন প্রথানুসারে উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাহার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ভাবে লেখনী সঞ্চালন করিতাম না। "তহবীল তছরূপ" ও "উপঢৌকন গ্রহণ" যে এক শব্দ নাই, ইহা গ্রন্থকারের "টাউন হলের থামসদৃশ" স্থুলবুদ্ধিতে অনুভূত হয় নাই বলিয়া আমরা নিতান্তই তাহার জন্য দুঃখিত হইয়াছি।

রাজবল্লভ কিরূপ অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা তাহার সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণ বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সেই সকল ইতিহাস হইতে সারসংগ্রহ করিয়া তৎপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ইতিহাসেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থকার কাকের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, সেই সকল বৃত্তান্ত গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্ত্তী ঘটনা গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"রাজা রাজবল্লভ এইরূপে সিরাজের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মির-জাফর রাজবল্লভকে উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ জানিতেন, এই জন্যই তাঁহাকে মন্ত্রীরপদে এবং তৎপুত্র রাজা কৃষ্ণদাসকে ঢাকার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।"

এই সকল সম্পূর্ণ মিথ্যা বর্ণনা, কোন ইতিহাসে নাই। বরং ইতিহাসে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পলাশীর যুদ্ধাবসানে যখন মিরজাফর সুবাদার হইলেন, তখন তৎপুত্র মিরন দেওয়ান ও মহারাজ দুর্ল্লভরাম নায়েব সুবাদার ও তাহার ভ্রাতা রাজা কুঞ্জবিহারী "রায় রাইয়া" ও রাজা রাস বিহারী মিরনের দেওয়ান হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মহারাজ দুর্ল্লভরাম সর্ব্ব-প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ইহা মুসলমান ও ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। আর আমাদের গ্রন্থকার দুর্ল্লভরামের পদে রাজবল্লভকে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাজ দুর্ল্লভরাম কায়স্থ কুলজাত। তিনি মহারাজ জানকি রামের পুত্র। উত্তর কালে যখন জনৈক ইংরাজ লেখক মহম্মদ রেজা খাঁ ও মহারাজ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কার্য্যকলাপ সমালোচনা করেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালার রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে কায়স্থগণ যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, অন্য কোন জাতীয় লোক সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই।" তাহারই দৃষ্টান্ত স্থলে তিনি মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ;—

"সম্রাট সাহ আলম্ এই সময়ে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। যদিও এই যুদ্ধে কর্ণেল কালিয়ট (ক্যালিউড হইবে) সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু রাজবল্লভও এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।"

মিথ্যা ! মিথ্যা !! মিথ্যা !!!

এই যুদ্ধে যদি কোন হিন্দু বীরত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তিনি রাজা সীতাব রায়। ইহা নিতান্তই দুঃখ ও ঘৃণার বিষয় যে, গ্রন্থকার বারম্বার পরের যশ হরণ করিয়া তদ্দ্বারা রাজবল্লভকে যশস্বী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ক্যালিউড স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "Sitab Roy fought with greatest activity and resolution; and having compelled them at least to quit the field pursued them till night."

এই যুদ্ধে ক্যাপ্তেন নক্স ক্যালিউডের অধীনস্থ সেনাপতি ছিলেন। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সীতাব রায়ের গুণানুবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, This is a real Nawab; I never saw such a Nawab in my life.

সায়রল মতাক্ষরীণ প্রণেতা স্বয়ং এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া সীতাব রায়ের অশেষ গুণানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। এবম্প্রকার যশস্বী মৃত ব্যক্তির যশ হরণ করিতে যিনি উদ্যত হইয়াছেন, তিনি মানব সমাজের ঘৃণার পাত্র।

তৎপর গ্রন্থকার বলেন "রাজবল্লভ মীরজাফরকে মন্ত্রণা প্রদান করতঃ পরাজিত সম্রাটকে বাকী রাজস্ব প্রদান করিলেন। সাহ আলম রাজবল্লভের এরূপ অপরিসীম

সাহস, অতুল সৌজন্য দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া পুরস্কার স্বরূপ একটী কলমদান ও একখানি তরবারি সম্মুখে রাখিয়া যেটী তাহার অভিরুচি হয়, তাহাই নিতে আদেশ করিলেন। রাজবল্লভ তরবারি গ্রহণ করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে "মহারাজ রাজবল্লভ রায় রাইয়াঁ সলার জঙ্গ বাহাদুর" উপাধি সহ ঐ তরবারি পুরস্কার প্রদান এবং মুঙ্গেরের সুবেদারি পদে নিযুক্ত করিলেন।

আমরা এরূপ নির্লজ্জ গ্রন্থকার কুত্রাপি দেখি নাই। এ সকল মিথ্যা কথা যে তিনি কিরূপে প্রচার করিতে সাহসী হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রথমতঃ এই যুদ্ধের সহিত রাজবল্লভের কোন সংশ্রব নাই। ২য়তঃ এই সময় রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তৎপর রাজা সীতাব রায় সেই পদ প্রাপ্ত হয়েন। মুঙ্গেরের স্বতন্ত্র শাসন কর্ত্তা ছিল না। আর রায়-রাইয়াঁ উপাধি ১৭২৫ খ্রীঃ অঃ প্রথম সৃষ্টি হয়। নবাব সুজা উদ্দিনের রাজস্ব মন্ত্রী মহারাজ আলমচাঁদ প্রথম রায় রাইয়াঁ; রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র দ্বিতীয় রায় রাইয়াঁ; মহারাজ জানকীরাম তৃতীয় রায় রাইয়াঁ; মহারাজ দুর্লভরাম চতুর্থ রায় রাইয়াঁ; রাজা কুঞ্জবিহারী পঞ্চম রায় রাইয়াঁ; ষষ্ঠ বা শেষ রায় রাইয়াঁ মহারাজ রাজবল্লভ। এই রাজবল্লভ মহারাজ দুর্লভ রামের পুত্র। আমাদের বোধ হয় গ্রন্থকার দুর্লভরামের পুত্রের উপাধিটী তাঁহার রাজ বল্লভের মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন। রাজ নগরের রাজবল্লভের সলার জঙ্গবাহাদুর উপাধি সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি। কারণ ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকার যে এইরূপ গ্রন্থের কত স্থানে ইতিহাসের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। আমরা তাহা আলোচনা করিয়া ক্লান্ত হইয়াছি। এই জন্য লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করিলাম। গ্রন্থকার যদি আমাদিগকে ব্যক্তি গত ভাবে গালি গালাজ করিয়া নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলে কোন কথা বলিতাম না। এমন কি এই গ্রন্থের সমালোচনার ভারও গ্রহণ করিতাম না, তিনি ইতিহাসের গলায় ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই এত কথা বলিলাম।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ফুলরেণু।

দাহ।

পুড়ে'ছি পুরুষগুলা কাঠ-কাঠ মরা,
লাবণ্যের নাহি লেশ নীরস শরীর;
লোলিত গলিত চর্ম্ম শিরাজাল ভরা,
করিয়াছি দেহ দাহ কত রমণীর!
পরিপূর্ণ ষোলকলা হেন রূপরাশি,
উলঙ্গ শ্মশানে শোয়া দেখিনি কখন,
অনলে মিশিয়া যায় অধরের হাসি,
অনন্ত ধরিয়া দেয় মত্ত আলিঙ্গন!
কি যে সে বিশাল ভাব ভীষণ গম্ভীর,
পুলকে বিস্ময়ে উঠে শিহরিয়া মন,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া উঠে তনু তরুণীর,
প্রাণে উঠে প্রেমমূর্ত্তি জাগিয়া তখন!
ও নহে শ্মশানে তার পোড়া ভস্ম ছাই,
আমরা যা দি'ছি সে যে রে'খে গে'ছে তাই!

একটী কথা।

কোন্ কালে নিবে গে'ছে চিতার অনল,
ভুলিয়া গিয়াছি কবে তার সেই কথা,
মুছিয়া ফেলেছি কবে নয়নের জল,
মনে নাই সেকেলে সে আদর মমতা !
সে যে গো আমার কেহ ছিল কোন দিন,
এ কথা এখন আর হয় না স্মরণ,
ধুয়ে গেছে— মুছে গেছে—হয়ে গেছে লীন
তার যেন নাম, গন্ধ, চুম্ব, আলিঙ্গন !
কেহ আজ তার কথা করিলে জিজ্ঞাসা,
উপকথা বলি যেন হেন লয় মন,
ছুঁইতে ছিঁড়িয়া যায় মান, কাঁদা, হাসা
কীটনষ্ট সর্ব্বদষ্ট জীর্ণ পুরাতন !
কেবল একটী কথা মনে বড় জাগে,
রাগ করে লিখেছিল মরিবার আগে !

কোন রমণীর প্রতি।

একটী চুলায় দি'ছি এই ত সে দিন,
খুঁজিলে এখনো বুঝি মিলে পোড়া হাড়,
মিলে বুঝি ছাই ভস্ম হয় নাই লীন
এখনো— এখনো তার চিতার অঙ্গার !
আমারে করিতে বিয়ে কে চাহ আবার,
কে তুমি রমণী হেন এমন সাহস ?
বাঁচিতে জীবনে বুঝি আশা নাই আর,
জান না আমি যে এক ভীষণ রাক্ষস ?
ফিরে যাও, ফিরে যাও, যাও বিধুমুখি,
আমার বিষের হাওয়া লাগে যার গায়,
এ জীবনে এ জনমে নাহি হয় সুখী,
নয়নের জল তার নয়নে শুকায় !
আমার আগুন-মাখা লাগে যার হিয়া,
দু দিনে উঠে গো তার শ্মশান জলিয়া !

বৃদ্ধের প্রেম।

হইল তুষার শুভ্র কাল কেশ রাশি,
খসিল মুকুতা সম বিমল দশন,
নিমগ্ন অধর প্রান্তে ডু'বে মরে হাসি,
গ্রাসিল বিকট জরা জীবন যৌবন !
প্রবৃত্তি বাসনা যত ক্রমে দূরে যায়,
দূরে যায় সংসারের পাপ প্রলোভন।
উদ্যম উৎসাহ আশা ডুবি'ছে সন্ধ্যায়,
বিমল বৈরাগ্যে যেন ভেসে গেছে মন !
ভেবেছিনু প্রেম অন্য বাসনার মত,
জরায় হইয়া জীর্ণ ক্রমে হবে লীন,
কিন্তু এ বার্দ্ধক্যে দেখি বাড়ে ক্রমাগত,
আগেকার শতগুণ নেশায় নবীন !
হেরিয়া রমণী হাসে একি রে বালাই,
পোড়া প্রণয়ের বুঝি জরা মৃত্যু নাই ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বিধবা বিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বসন্ত।—ভাই বিজয় ! তোমার দৃষ্টি কেবল সাংসারিক সুখের দিকেই পতিত হইয়াছে। বিধবাগণ ভোগ সুখে বঞ্চিতা বলিয়া তুমি ব্যথিত হইয়াছ। তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে ত দৃষ্টিপাত করিতেছ না। অগ্নিতে যত ইন্ধন দিবে, ততই তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। আমাদের পৃথিবীতে আসিবার উদ্দেশ্য কি ? বিষয় সুখ ভোগ করিবার জন্য কি আমরা মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছি ? আমরা কি অজু গোঁসাইয়ের ন্যায় বলিব যে, "এ সংসার সুখের টাটি, ও হে খাই দাই

মজা লুটি।" তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে বিষয় সুখ উপভোগ করিয়া লোকে সুখী হয় না কেন? বিষয়েতে কি কেহ কখন তৃপ্তি-লাভ করিয়াছে? ভোগ ইচ্ছা যত বাড়াইবে, ততই বাড়িবে। একেত লোকে পার্থিব সুখে নিমগ্ন, তাহাতে কি তাহাকে আরো অধিক নিমগ্ন করা উচিত? তুমি বিধবাকে একটি পতি দিবে, ইহার স্থিরতা কি যে সে তাহাকে অবলম্বন করিয়া সুখী হইতে পারিবে? তাহার সহিত মনের মিল না হইতে পারে। আর তাহার যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বিধবাকে কি তৃতীয়-বার বিবাহ করিতে হইবে? এরূপ হইলে ত আর ভোগের নিবৃত্তি হইবে না। তুমি বলিবে, যত সুখ পুরুষের দিকে, আর যত দুঃখ রমণীর জন্য রাখা হইয়াছে। বল দেখি, প্রকৃত সুখ কোথা হইতে পাওয়া যায়? ইন্দ্রিয় সেবা কি সুখ বিতরণ করিতে পারে? পুরুষগণ দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়া কি সুখ পাইয়া থাকে? সে কাম রিপুকে দমন করিতে না পারিয়া বিবাহ করে বটে, কিন্তু পরিণামে তাহাকে আক্ষেপ করিতে হয়। যে পুরুষের প্রথম পরিণয়ের ফল স্বরূপ পুত্র কন্যা থাকে, তাঁহার লাঞ্ছনার একশেষ হইয়া থাকে। দুই পক্ষের সন্তানের মধ্যে ঘোরতর গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হয়। পুরুষ তজ্জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার যন্ত্রণার আর সীমা থাকে না। যাহার প্রথম স্ত্রীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তানাদি থাকে না, তিনিই যে সুখী হইতে পারেন, এমনও নহে। তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী তাঁহাকে দুঃখে ভাসাইয়া পর-লোক গমন করিতে পারে। তাঁহাকে হয়ত তৃতীয়বার বিবাহ করিতে হয়। এই-রূপে পুরুষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। দুঃখে-তেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পুরুষের পক্ষে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহের যে প্রথা আছে, তাহা তাহার দুঃখের কারণ। এ নিয়ম না থাকিলেই ভাল হইত। রমণীর পক্ষে এ প্রথা না থাকাতে তাহার মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। তাহার অনিষ্ট না করিয়া তাহার ইষ্ট সাধন করা হইয়াছে। কি স্ত্রী কি পুরুষ, রিপুর প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া না দিয়া তাহাদের এ বেগ সম্বরণ করাই উচিত। যেমন একদল ব্রহ্মবাদিনী সংসার রূপ পঙ্কের মধ্যস্থ পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে, সেইরূপ এক দল ব্রহ্মচারী পুরুষ দেখিলে আরো পরিতৃপ্ত হওয়া যায়। বিপত্নীকের দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ এই দণ্ডেই রহিত হউক। তাহা হইলে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। আমাদের শুভাদৃষ্ট বশতঃ আমরা এই পাপ সংসারে পূত-আত্মা দেবীগণকে দেখিয়া স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিতেছি, এ আনন্দ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করো না।

কোন কোন বিধবা কুপথগামিনী হয় বটে। কিন্তু তাই বলিয়া বিধবা মাত্রেরই অনিষ্ট সাধন করা উচিত নহে। ব্যভিচার কোথায় না দেখা যায়? সধবাদের মধ্যে কি ব্যভিচারিণী নাই? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বিধবা রমণীগণের দ্বারা আমাদের সমাজ পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের প্রভায় আমরা প্রভাম্বিত হই-য়াছি। তাঁহারা এই দৈত্যপূর্ণ ধরাধামে দেবতার স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছেন। আর, একথা না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, বিধবাদের মধ্যে যে দুই একটী কুলটা

নয়ন গোচর হয়, তাহা আমাদের গুণধর পুরুষদেরই কৃপায়। জঘন্য পুরুষের প্রলোভনে পড়িয়াই আমাদের অবলাগণ বিপথগামিনী হয়েন। দৈত্যগণ চির কালই দেবতার শত্রুতাচরণ করে, স্বর্গীয় সুধা নষ্ট করিতে তাহারা সর্ব্বদাই প্রয়াস পায়। নারায়ণ দেবতাদের সহায় ও রক্ষক। তাঁহার আশ্রয় লইলে দৈত্যগণের কি সাধ্য যে, দেবতার অনিষ্ট সাধন করে। আমাদের বিধবাগণ নারায়ণের আশ্রয় লউন, তাঁহার ধ্যান ধারণায় সময় ক্ষেপণ করুন। তাহা হইলে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে পারিবে না, তাঁহারা অটল ভাবে ব্রহ্ম-চর্য্য-ব্রত সমাধা করিতে পারিবেন। ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া যাঁহারা দিন যাপন করিতে পারেন, এই ধরাধামে তাঁহারাই যথার্থরূপে সুখী। সুতরাং হিন্দু সমাজ বিধবাগণকে যন্ত্রণা দিতেছেন না, তাঁহাদিগকে স্বর্গীয় সুখ প্রদান করিবার জন্য উৎসুক আছেন।

বাল-বিধবাদের অবস্থা বিলোকন করিলে, মনে বড় ক্লেশ হয়, সন্দেহ নাই। স্বামী যে কি বস্তু, যাহারা জানে নাই, স্বামীর মৃত্যুতে তাহাদের সম্বন্ধে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাহারা বুঝে নাই; তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য বাধ্য করা অন্যায়। আমার বিবেচনায়, যত দিন না তাহারা তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারে, তত দিন তাহাদিগকে এ কঠোর ব্রতে ব্রতী করা উচিত নহে। যখন তাহাদের বিবেচনা শক্তি হইবে, তখন তাহাদের সমক্ষে সমুদায় প্রকাশ করিতে হইবে। সে সময়ে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। বিধবাগণ আপনারাই তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য। কিন্তু, শাস্ত্র ও যুক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কন্যাকে অল্পবয়সে পাত্রস্থ করা কেন হয়? সে দিন অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা যে, যে পর্য্যন্ত কন্যা পতি সেবা করিতে সক্ষম না হইবে ও পতি-মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত পিতার উচিত নহে যে, তাহাকে বিবাহ সূত্রে বদ্ধ করেন। অতএব যতদিন বাল্য বিবাহ প্রথা রহিত না হইতেছে, ততদিন শিশু বিধবাদের প্রতি আমার প্রস্তাবিত নিয়ম অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া শিশু বিধবাদের বিবাহ দেওয়া আমার বিবেচনায় উচিত নহে। সরল শিশুদের মনে ধর্ম্মভাব সহজেই উদয় হয়। সুতরাং এই বাল বিধবারা যদি প্রকৃতরূপে উপদেশ পায় ও তাহাদিগকে ধর্ম্ম আলোচনা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা হিন্দুকুল উজ্জ্বল করিয়া থাকে। তাহারা কখন ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করে নাই, সুখের সে দিকে তাহাদের আকর্ষণ নাই। বরং যাহারা অধিক বয়সে বিধবা হয়, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বকার সম্ভোগ-সুখ স্মরণ করিয়া কখন কখন বিচলিত হইতে পারে। কিন্তু শিশু বিধবাদের সম্বন্ধে সে আশঙ্কা নাই। এবং এরূপ বিধবাদিগের দ্বারা কি আমাদের সমাজ উজ্জ্বল হইতেছে না? দেবী শরৎসুন্দরীর ভাব মনে উদয় হইলে আমরা কি স্বর্গীয় সুখ অনুভব করি না? অতএব যদি এই কলুষিত সমাজে দেবতার স্বরূপ ব্রহ্মবাদিনীদিগকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আর বিধবা রমণীদিগকে পাপ সংসারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করো না।

অধ্যাপক মহাশয়ের নাম উল্লেখ হওয়াতে বিজয় বলিয়া উঠিলেন, চল আমরা ভাই আমাদের প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট গমন করি। এ সম্বন্ধে তাঁহার কি মত, তাহা অবগত হইলে আমাদের অনেক উপকার হইতে পারিবে। বসন্ত এ কথায় সম্মত হইলেন। পরে উভয়ে অধ্যাপক রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। অধ্যাপক রামচন্দ্র উভয়ের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিজ অভিপ্রায় এইরূপে ব্যক্ত করিলেন;—

আজকাল বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে দুইটী দল দেখা যায়। উভয় দলই যে বিধবাদের মঙ্গল কামনা করেন,তাহাতে সন্দেহ নাই। বিধবাগণ পার্থিব সুখ হইতে বঞ্চিত এবং তাহারা নানা প্রকার দুঃখ বহন করে,এ দৃশ্য অনেক হৃদয়বান ব্যক্তির প্রাণকে আঘাত করিয়া থাকে এবং তাহাদের এই অভাব ও ক্লেশ দূর করিবার জন্য তাঁহাদিগকে যত্নবান দেখা যায়। আরো কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা যে বিধবাদের পার্থিব অভাব ও ক্লেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, এরূপ নহে। কিন্তু, বিধবাদের উচ্চ ধর্ম্মভাব ও পবিত্রতা দেখিয়া তাঁহারা এরূপ মোহিত হয়েন যে, তাঁহাদের ইচ্ছা নহে যে, এই ব্রহ্মবাদিনীগণ অতি হেয় সংসার কূপে নিমগ্ন হইয়া পাপ পঙ্কে কলুষিত হয়েন। তোমরা দুইজন এই দুইটী দলকে সমর্থন করিতেছ। তোমাদের দুজনেরই কথায় অনেক সত্য আছে, অনেক উচ্চভাব আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে ভ্রমও লক্ষিত হয়। বিধবা বিবাহের পক্ষ অবলম্বীগণ বলেন যে, একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য,—যে বিধবা আজ নানা প্রকার পার্থিব সুখ ভোগ করিতেছেন, নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণ করিতেছেন, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতেছেন, মহার্হ বসন পরিতেছেন, এবং মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইতেছেন, কল্য তিনি পতি হারাইলেন, অমনি এ সমুদায় হইতে বঞ্চিতা হইলেন! এক দিনে তিনি ব্রহ্মচারিণী হইবেন। তাঁহাকে সামান্য খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে হইবে, একাহারে জীবন কাটাইতে হইবে এবং একাদশীর দিনে অনাহারে থাকিতে হইবে। কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাঁহার সংশ্রব থাকিলে তাহা পণ্ড হইবে। তাঁহার মুখ দেখিয়া কোন স্থানে গমন করিলে সে যাত্রা অমঙ্গলজনক হইবে! বলিতে কি, সকলে তাঁহাকে অভাগিনী বলিয়া ঘৃণা করিবে। আবার যদি কোন প্রলোভনে তাহার একবার পদস্খলন হয়, তাহাকে কুলকলঙ্কিনী আখ্যা দিয়া সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। এ দৃশ্য দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? কাহার না ইচ্ছা হয় যে, এই দণ্ডে তাহাদের দুঃখ দূর করি—তাহাদের বিবাহ দিবার উদ্যোগ করি। আবার বিধবা-বিবাহের বিরোধীগণ বলেন, দেখ কি স্বর্গীয় দৃশ্য এই কলুষিত পৃথিবীতে দেখা যাইতেছে—বিধবাগণ পার্থিব সুখকে অসার বিবেচনা করিয়া ধর্ম্ম-আলোচনায় জীবন যাপন করিতেছেন। যে পতির তিনি সহধর্ম্মিণী ছিলেন, যাহার সহিত তিনি আধ্যাত্মিক সম্মিলনে মিলিত ছিলেন, তাঁহাকে হারাইয়া তিনি কি কোন পার্থিব সুখে সুখী হইতে পারেন? বহু মূল্যের বসন ও ভুষণ তাঁহার কাছে কোন্ ছার! জগচ্চন্দ্র হার তাঁহার গলার শোভা সম্পাদন করিতেছে, হরি নাম শ্রবণ তাঁহার কর্ণের ভূষণ হইয়াছে, হরিনাম কীর্ত্তন

তাঁহার কণ্ঠকে শোভান্বিত করিয়াছে, হরিরূপ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের শোভা সম্পাদন করিয়াছে, হরির জপমালা তাঁহার হস্তকে শোভিত করিয়াছে, দেবদর্শনে গমন তাঁহার চরণের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। এ সকল ভূষণ-ছাড়িয়া তিনি কি আর অন্য কোন অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইতে ইচ্ছা করেন? পরলোকগতা পতির ধ্যানে যিনি নিমগ্ন, তাঁহার কি ভোগ-স্পৃহা থাকিতে পারে? তাই তিনি কেবল জীবন ধারণের জন্য মাত্র আহার করেন এবং একাদশীব্রত তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর জন্য পালিত হয় বলিয়া তিনি অনুগ্রহের সহিত তাহা সমাধা করেন। তিনি পার্থিব ব্যাপারে তাঁহার হস্ত কেন কলুষিত করিবেন? ঐ দেখ, পরিবার মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় তিনি কি করিতেছেন; দেবতার নাম লইতে লইতে তিনি অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিলেন, স্নান করত অনেক ক্ষণ সন্ধ্যা আহ্নিকে সময় অতিবাহিত করিলেন, কখন দীনকে ভিক্ষা দান, কখনঅভ্যাগত ব্যক্তির জন্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। পরে নিজে কিছু আহার করিয়া প্রতিবাসীদের সংবাদ লইতেছেন। ঐ দেখ রোগীর শয্যায় বসিয়া কখন তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছেন, কখন তাহার জন্য পথ্য প্রস্তুত করিতেছেন। বসন্ত রোগের বীভৎস তাঁহাকে ভীত করিতে পারে না, তিনি অনায়াসে রোগীর কাছে বসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। অবকাশ পাইলে কখন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিতেছেন, কখন নিকটস্থ কোন দেবালয়ে বসিয়া দেবতার নাম জপ করিতেছেন, কখনও বা কথকমহাশয়ের দ্বারা বিবৃত পুরাণের কথা শ্রবণ করিতেছেন। এ দৃশ্যটী কি চমৎকার! ইহা দেখিলে কি কাহারো কখন ইচ্ছা হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মবাদিনীগণ তাঁহার পবিত্র স্বভাব ও সদনুষ্ঠান সকল ত্যাগ করত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়া সংসারের পঙ্কিলজলে নিমগ্ন হউন? এখন দেখা হউক, এই দুইটী চিত্রের মধ্যে কোথায় খুঁৎ আছে। বিধবা বিবাহ সমর্থনকারীগণ পার্থিব সুখকে অতি উচ্চ পদবীতে সংস্থাপন করেন এবং বিধবা বিবাহের বিরোধীগণ পার্থিব পদার্থ ও ব্যাপার সকলকে অতি হেয় বিবেচনা করিয়া থাকেন। উভয় দলেরই পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায়। যাহার যে প্রকার প্রকৃতি ও মনের ক্ষমতা, তাহার উপর সেই রূপ কার্য্য ন্যস্ত করিলে সকল দিকে মঙ্গল হয়। যাহার ভোগ বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই, তাহাকে জোর করিয়া ব্রহ্মচার্য্য করিতে বাধ্য করিলে সে প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া ভ্রষ্টাচারী হইবে। কিন্তু তাহাকে যদি পরিণয় সূত্রে বদ্ধ কর, সে পবিত্র দাম্পত্য সুখ ভোগ করত, ধর্ম্ম আলোচনায় ও পর উপকার সাধনে রত থাকিয়া সমাজের মুখোজ্জল করিতেপারে। আবার কাহার কাহার মনের ভাব এ প্রকার যে, দাম্পত্য প্রেমে যে সুখ পায় না, সংসারের কোন পদার্থ যাহাকে সুখী করিতে পারে না, তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করিলে, সে সে সূত্র ছিন্ন করিয়া কোথায় পলায়ন করে।

ক্রমশঃ

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

চৈতন্য চরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (২৭শ)

(নগর সঙ্কীর্ত্তন।)

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন দিন দিন জমকাইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমস্ত নিশা সঙ্কীর্ত্তন হয়; ভক্ত ভিন্ন সাধারণ লোকের সেখানে প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্তু নগরের আবাল বৃদ্ধ বালিকা কীর্ত্তন শুনিবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়া উঠিল যে, প্রতি রজনীতে বাটীর বাহিরে, পথে, গলিতে ও অন্তঃপুরে লোক ধরে না; সমুৎসুক চিত্তে নগরবাসীগণ নব ভক্তি-বিধানের নব সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ব্যগ্র। এই সকল লোকদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; কতক লোক কেবল উপহাস বিদ্রূপ করিবার জন্য আসিত; কিন্তু অনেকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া উপকার লাভের প্রত্যাশায় সমস্ত রজনী হিম ভোগ করিয়া জাগরণ করিত। কীর্ত্তনের মাধুর্য্য শ্রবণে ও প্রেমের স্বর্গীয় ছবি দৃষ্টে পক্ষপাতীগণ এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা পাষণ্ডীদিগকে যথোচিত তিরস্কার করিত। মহিলাগণ গৌরের রূপ-মাধুর্য্যে ও নৃত্য কীর্ত্তনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের গুরুজনের অশেষ গঞ্জনা লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতেন। তাঁহাদের তৎকালের মনের ভাব কোন বিদগ্ধা মহিলা নিম্নলিখিত গানে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"পাড়ার লোকে গোল করে গো
আমায় সবে বলে গৌর-কলঙ্কিনী।
সঙ্কীর্ত্তনে গৌর নেচেছে,
তাতো পাড়ার লোক দেখেছে,
তখন আমি দাঁড়ায়ে নাছে,
(বাড়ীর বাহির হই নাই মা)
কেবল দেখেছিলাম তাঁর চরণ দুখানি।
একদিন জাহ্নবীর ঘাটে,
গোরাচাঁদ দাঁড়ায়ে তটে,
যেন চন্দ্রসূর্য্য উভয় জোটে, গৌর অঙ্গেতে,
দেখে গৌর রূপের ছবি,
ভুলে গেল শাক্ত শৈবী,
দৈবে গেল মোর কলসী ভেসে,
এলোথেলো হলেম পাগলিনী।
আর একদিন শ্রীবাসের বাড়ী,
সঙ্কীর্ত্তনের ছড়াছড়ি,
ভক্তগণ যায় গড়াগড়ি, শ্রীবাস অঙ্গনে;
(ভাবে কে কার গায়ে ঢলে পড়ে মা)
তখন আমি লুকায়ে,
ছিলাম এক ভিতরে দাঁড়ায়ে,
পড়িলাম অচেতন হয়ে,
চেতন করে শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী।

নগরের কতকগুলি লোক শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি এতই আসক্ত হইয়া পড়িল যে, তাহারা দিবাভাগে তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য তাহার বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিতে লাগিল। গৌরচন্দ্র ঐ সকল লোকের শ্রদ্ধা ও ব্যাকুলতা দৃষ্টে তাহাদিগকে হরি নাম উপদেশ করিলেন এবং সন্ধ্যার সময় সকলকে একত্রিত হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে বলিয়া দিলেন। তদবধি নবদ্বীপ নগরে প্রতি পল্লীতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের

রোল উঠিয়া গেল। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমান্তে নগরীয় লোক সকল যখন একত্রিত হইয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ বাদ্য যোগে কীর্ত্তন করিতে লাগিল,—"হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমো গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন"। এই পদ সুমধুর স্বর সংযোগে যখন নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল, আর প্রগল্‌ভ নৃত্যের প্রেমতরঙ্গ যখন চারিদিক আন্দোলিত হইত, তখন নবদ্বীপ এক নূতন শ্রী ধরিত। পাষণ্ডীগণের বিদ্বেষানল ইহাতে শতগুণ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে গোপনে কাজীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, নিমাই পণ্ডিতের কুপরামর্শে নগরের কতকগুলা অসচ্চরিত্র লোক নগরের স্থানে স্থানে জোটলা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লোকের প্রতি উৎপাত করিতেছে; তাহাদিগকে দমন না করিলে শীঘ্রই নগর মধ্যে শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা। কাজী দৃঢ়তা সহকারে এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন আপনার দলবল সহ সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে যাইয়া দেখিলেন যে, যথার্থই হরিনাম সংকীর্ত্তনের রোলে নদীয়া টলমল করিতেছে। তখন ক্রোধান্ধ হইয়া কাজী সাহেব এক দলের মধ্যে প্রবেশ করতঃ মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। লোকদিগকে অশেষ প্রকারে অপমান করিলেন এবং আর কীর্ত্তন করিলে তাহাদের জাতি মারিয়া মুসলমান করিবেন, এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন। দুই চারি দিন পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া এইরূপ করাতে সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল, প্রেমভক্তি প্রচারের শাণিতাস্ত্র আপাততঃ কোষ মধ্যে লুকায়িত রাখিতে হইল, পাষণ্ডীদের জয় হইল, এবং ভগবৎ বিধান সয়তানের হস্তে পরাস্ত হইয়া গেল। সংসারে এইরূপ ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটীতেছে; ইহা দেখিয়া যাঁহারা অসত্যের জয় মনে করেন, তাঁহারা একদেশদর্শী অবিশ্বাসী। বিশ্বাসীগণ এরূপ বাধা বিঘ্নের এক কড়ার মূল্যও দেন না। তাহারা নিশ্চয় জানেন "সত্যমেব জয়তে" সত্যের জয় হইবেই হইবে। তাই কীর্ত্তনকারী লোক সকল যখন দলে দলে যাইয়া গৌরচন্দ্রের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে নিরাশ অন্তরে কাজীর আচরণের কথা জ্ঞাপন করিল, তখন গৌরচন্দ্র ক্রোধে হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন—"শুন নিতাই! সাবধানে বৈষ্ণব সমাজে ঘোষণা করিয়া দাও যে, আজ অপরাহ্নে সমস্ত নবদ্বীপে নগর সঙ্কীর্ত্তন হইবে, দেখা যাউক কোন কাজি, কি বাদসাহ কি করিতে পারে? আমি সত্যই বলিতেছি যে, আজ বিশাল প্রেমভক্তির বৃষ্টি হইবে, তাহার তরঙ্গে কাজী ও পাষণ্ডীগণ ডুবিয়া মরিবে। নগরবাসীদিগকে বলিলেন, "ভাই সব! যাও, আমার এই ইচ্ছা আজ নগরের ঘরে ঘরে প্রচার কর এবং তদুপযুক্ত আয়োজন কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আজ লীলা-বিহারী ভগবানের অতি রহস্যলীলা প্রকাশিত হইবে, কিসের ভয় কাজীকে? আর কিসের ভয় বাদসাহকে? যিনি সকল ভয়ের ভয়ানক, যিনি ভীষণের ভীষণ, আমরা সেই উদ্যত বজ্রহস্ত শ্রীহরির শরণাপন্ন। আমরা কি সামান্য মানুষের ভয়ে ভীত হইব? যাহার চরণাশ্রয় লইলে সকল ভয় চলিয়া যায়, তিনি সেনাপতি থাকিতে তাহার সৈন্যগণ কি ভয় করিবে? এই প্রেমভক্তির সমরে আজ কত পাপী

নিধন হইবে, কত পাষণ্ডী বন্দী হইবে সে রহস্য স্বচক্ষেই দেখিবে। এখন যাও, বিকালে সাজ সজ্জা, করিয়া আসিও।" গৌরচন্দ্রের সাহসপূর্ণ তেজস্বী বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া সকলে স্তম্ভিত ও উৎসাহিত হইল, নগরবাসীরা বিদায় হইয়া গেল এবং মহা-নগরে সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হইতে লাগিল।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিবিধানে নগর-সঙ্কীর্ত্তন এক মহা ব্যাপার। ভাগিরথীর জল স্রোত যেমন প্রথমে হিমাচলের কয়েক খণ্ড প্রস্তর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া গোমুখী হইতে প্রবল ধারায় প্রবাহিত হওতঃ ভার-তের নানা দেশের প্রান্তরগুলিকে শস্য পূর্ণ করিয়া ও কোটি কোটি নর-নারীকে সুশীতল জলদানে পরিতৃপ্ত করিয়া সাগর-সঙ্গমে যাইয়া মিশায়া গিয়াছে, সেইরূপ গৌরের সঙ্কীর্ত্তন-নদী, যাহা এত দিন কয়েকটী হৃদয়ে আবদ্ধ ছিল এবং শ্রীবাসের চণ্ডীমণ্ডপের চতুষ্কোণ মধ্যেই যাহার তরঙ্গ খেলিত, আজ তাহা প্রবল বেগে সমস্ত নবদ্বীপে, পরে ভারতের নানা স্থানে প্রবা-হিত হইয়া অনন্ত প্রেমের সাগরে মিশিয়া একাকার হইতে লাগিল; ইহা মনে করিলে কাহার না হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয়? ফলতঃ ধর্ম্মসংগ্রামে নগর-সংকীর্ত্তন যে এক মহাস্ত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অস্ত্রের আঘাতে কত পাপীর হৃদয় যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কত জগাই মাধাই যে উদ্ধার হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

কে শত্রু, কে মিত্র।

এই বিস্তৃত পৃথিবীর মধ্যে কে কাহাকে শাসন ও তিরস্কার করিতে বা উপদেশ দিতে অধিকারী?—না—যে যাহাকে ভাল-বাসে। যে যাহাকে ভালবাসে না, যে যাহার মঙ্গল চায় না, সে তাহার কোন ছিদ্র দেখাইয়া তিরস্কার করিতে অধিকারী নয়। পিতা পুত্রকে তিরস্কার বা শাসন করিতে অধিকারী, কেননা, পিতা পুত্রকে ভালবাসে। বন্ধু, বন্ধুর দোষ সংশোধনের জন্য যত্ন করিতে অধিকারী, কেননা বন্ধু বন্ধুর ম-ঙ্গল চান। যে যাকে ভালবাসে না, তার শাসন বা তিরস্কারে কোনই উপকার দর্শে না। এই যে পিতা বা বন্ধু, সন্তান বা বন্ধুর মঙ্গ-লের জন্য সময়ে সময়ে শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন, ইহার মধ্যে কি তাহাদের কোন ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বার্থ আছে? না, অনেক স্থলেই তাহা থাকে না। যার মধ্যে ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বার্থ আছে, সে অন্যের শাসন করিতে বা অভাব দেখাইতে অধিকারী নয়। আপ-নাকে যে অন্যের মঙ্গলের জন্য বিসর্জ্জন দিতে না পারে, অথবা যে অন্যের মঙ্গলের সহিত একাত্মক না হইতে পারে, সে

অন্যকে শাসন করিতে বা উপদেশ দিতে অধিকারী নয়। প্রেমমূলক শাসন ভিন্ন অন্য শাসনে পৃথিবীর মঙ্গল নাই।

মহাত্মা ঈশার জীবনে দুটী বিসদৃশ ভাব দেখা যায়। একদিকে তিনি উপদেশ দিতেন, "শত্রুকেও ভালবাসিবে এবং যে তোমার বাম গণ্ডে আঘাত করিবে, তাহাকে তুমি দক্ষিণ গণ্ড ফিরাইয়া দিবে (১)" "বারম্বার তুমি বন্ধুর অপরাধ ক্ষমা করিবে (২)।" তিনিই স্থানান্তরে ফেরুসী ও সাডিউসিদিগকে কত তীব্র তিরস্কার, কত গালাগালী দিতেন (৩)। যে খ্রীষ্ট নিজের বিচারের সময় একেবারে নির্ব্বাক ছিলেন, আত্মরক্ষার জন্য একটী কথা বলেন নাই, তিনিই, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন ভ্রাতা চলিতেছেন, কি কপটতার বেশ পরিধান করিতেছেন দেখিলে ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন। এই বিসদৃশ চিত্রে আমরা কি শিক্ষা পাই? এক সময়ে যিনি সিংহের ন্যায় তেজে অন্যকে তিরস্কার করিতেছেন, তিনিই সময়ান্তরে মেষশাবকের ন্যায় কোমলস্বভাব। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? খ্রীষ্টের জীবনের এইদুটী ভাবে আমরা প্রধানত এই শিক্ষা পাই, যেখানে তার নিজের স্বার্থ, নিজের লাভালাভ, সেখানে তিনি নীরব। কিন্তু যেখানে তাঁর পিতার জিনিসের অবমাননা বা অন্যের অনিষ্ট, সেখানে তিনি সিংহাবতার। পিতার বিরুদ্ধে মানুষকে চলিতে দেখিলে, কপটতার আচ্ছাদনে লুকাইয়া কাহাকেও অমঙ্গল করিতে দেখিলে তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন;—মানুষ নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছে দেখিলেও তিনি অধীর হইতেন। ফেরুসী ও সাডিউসিদিগকে যিনি তীব্র নিন্দা করিতেন, তিনিই পতিত বেশ্যাকে আদর করিয়া হৃদয়ের প্রেমালিঙ্গন দিতেন। এরূপ কেন করেন, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"এক দল কপটী, আর এক দল নিজ কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত।" অনুতপ্ত ব্যক্তির জন্য তাঁর প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত, কিন্তু কাহাকেও কপটতা আচরণ করিতে দেখিলে ক্রোধে অধীর হইতেন। আপন সন্তানের দোষ দেখিলে যে প্রেমিক পিতা ক্রোধে অধীর হন, তিনিই সময়ান্তরে শত শত লোকের দোষ উপেক্ষা করেন। ইহারই বা কারণ কি? কারন এই, শিশু যে পিতার আপন জিনিস,—ঈশ্বরের সন্তান,

(১) But I say into you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you.

Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.

And unto him that smiteth thee on the one cheek, offer also the other.

Luke, Chap. VI. 27, 28, 29

(২) Then came Peter to him, and said Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?

Jesus saith unto him, I say not unto thee Until seven times, but Until seventy times seven. Mathew. XVIII-21-22,

(৩) See Mathew, Chap XXIII. 3,14,15, 16, to 28.

(৪) And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.

And he answered him to never a word in so much that the governor marvelled greatly. Mathew, Chap XXVIII. 12 to 14.

পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক। শিশুর দোষ বা ত্রুটি পিতার প্রাণে অসহ্য। এখানে পিতার ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ কোন স্বার্থ নাই, এখানে তিনি কেবল অন্যের মঙ্গল কামনা বা ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত।

মানুষ যখন সৎইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্যকে তিরস্কার করে, তখন সেখানে স্বর্গ অবতীর্ণ হয়। এইরূপ তিরস্কার না থাকিলে, সমাজের কোন প্রকার উপকার হইত না। সন্তানের সমক্ষে পিতার তিরস্কার রূপ শাণিত অস্ত্র যেমন মঙ্গলের একমাত্র সোপান, জাতি এবং সমাজের সমক্ষে তেমনি তীক্ষ্ণশাণিত অস্ত্রধারী সমালোচকেরও নিতান্ত প্রয়োজন। যে অন্ধ হইয়া খোসামুদী করে, বৃথা প্রশংসার করতালি দেয়, তার চেয়ে, যে দোষ প্রদর্শন করে, সে অধিক উপকারী। সে বন্ধু বন্ধুই নয়, সে কেবল প্রশংসা বা স্তুতিবন্দনা করিয়া বন্ধুর প্রাণে অহঙ্কারের বীজ বপন করে; কিন্তু সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু, যে দোষ প্রদর্শন করে, এবং তাহা সংশোধনের পথ দেখাইয়া দেয়। এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে মোহ মায়ার অধীন মানুষ পদে পদে পদস্খলিত হয়। সব সময়ে নিজের দোষ ত্রুটি মানুষ দেখিতে পায় না; মোহ মায়ায় সে আচ্ছন্ন থাকে। বন্ধুরাই এ সময়ে দোষ প্রদর্শন করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করেন। এই জন্য, ব্যক্তি সম্বন্ধে এবং সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ উপকারী বন্ধুর নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ সমালোচক বন্ধু জগতে না থাকিলে জগতের কোনরূপ উন্নতি হইত না।

ইংলণ্ডের অভ্যুদয়ের ও উন্নতির মূল কারণ যাঁহারা নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন এবং অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, রাজনৈতিক জগতে লিবারল (উদার নৈতিক) ও কন্‌সারভেটিভ (স্থিতিশীল) দলের পরস্পর শত্রুতা আচরণের জন্য ও দোষ ত্রুটি প্রদর্শনের জন্যই ইংলণ্ডের গৌরব এত বৃদ্ধি হইয়াছে। সেখানে উভয় দলেই মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণের অভ্যুদয় হইয়াছে (১)। যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মে অভ্যুদয়ের ইতিহাস পাঠ ও আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাও জানেন যে, প্রবল জন সাধারণের উত্তেজনা, কঠোর সমালোচনা এবং নির্যাতনে এই ধর্ম্মের কত উন্নতি হইয়াছে। মহাপুরুষদিগকে জীবন-পরীক্ষার অটল ভিত্তিতে এই সকল লোকেরাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা দোষ প্রদর্শন করে, তাহারাই যেন উন্নতির পথ-প্রদর্শক। আপন মতের বা চরিত্রের দোষ নিজের পক্ষে দেখা সব সময়ে সম্ভবপর নয়। এই জন্যই, সমালোচক বা দোষ-প্রদর্শকের প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের স্বভাব এই, সে আপন দোষ শুনিলে ক্রোধে অধীর হয়। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে উন্নতি সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িতেছে, দেশের হীনাবস্থা ঘুচিতেছে না।

পৃথিবীতে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা, যাহা আছে, কেবল তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চান;—অনন্ত উন্নতির পথ ধরিতে চান না। অনন্ত উন্নতির পথে যাইতে হইলে অনন্ত অভাব-বোধ নিতান্ত প্রয়োজন। হইল না, পাইলাম না, যাহা করা উচিত ছিল, তাহা করা হইল না—এইরূপ অনন্ত-পিপাসা প্রাণে না জাগিলে মানুষ অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে ধাবিত হয়

(১) See English Politics and Party Leaders, Vol. I.

না, সুতরাং উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাহা পাইয়াছি, খুব পাইয়াছি,—খুব জ্ঞানী হইয়াছি, খুব ধার্ম্মিক হইয়াছি,—খুব কাজ করিয়াছি, উন্নতির আর বড় কিছু বাকী নাই, —এই পরিতৃপ্তি-বোধ জন্মিলে মানুষ কেন বলত আর উন্নতির জন্য লালায়িত হইবে? কিন্তু, কি জানি কেন, মানুষ আত্ম-তৃপ্তি, আত্ম-প্রশংসা, আত্ম-গরিমা লইয়াই থাকিতে ভালবাসে, অভাবের কথা শুনিতে সে নিতান্ত বিরক্ত। সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়া অহঙ্কারী মানুষ মনে করে, কত বড় জ্ঞানী হইয়াছি; সামান্য একটু দেশের হিতকর কার্য্য করিয়া ঢোল ঢাক কাঁদে করিয়া দেশে বিদেশে প্রচার করে—কত মহৎ কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি। যেন সেরূপ মহৎ কার্য্য আর কেহ কখনও করে নাই! নিজের মুখেই নিজের প্রশংসা, নিজের পত্রিকাতেই নিজের গৌরব-ঘোষণা! কিছু কাজ না করিয়াও কত ব্যক্তি কর্ম্মীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়ায়! লম্বা লম্বা বক্তৃতা, উচ্চ উচ্চ কথা, তাহাদের মুখে সর্ব্বদা শোনা যায়। ধর্ম্মপ্রচারক দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনা দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ করে, দেশ-সংস্কারক উচ্চ কথার দ্বারা নিজের কীর্ত্তিকলাপের গুণ কীর্ত্তন করিয়া জীবনকে সার্থক করে, এদিকে তাহাদের চরিত্রহীনতার দুর্গন্ধে আকাশ যে পরিপূর্ণ, তাহা একবারও ভাবে না। যাহা করিবার ছিল, সব যেন করা হইয়া গিয়াছে;—আর যেন কিছুই করিবার বাকী নাই। ইহাদের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে কথা বল, তোমার প্রতি সকলে ক্রোধান্ধ হইবেন, এবং যে কোন রূপেই হউক, তোমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করিবেন। এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াই খ্রীষ্ট অকালে ক্রুস কাষ্টে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ম্যাট্‌সিনী কারাবাসী হইয়াছিলেন, রবার্ট এমেট অকালে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন! হায়! পৃথিবীর কত সোণার চাঁদ এইরূপ মানুষের উপকার করিতে যাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! পৃথিবী! বুঝিল না, কে প্রকৃত শত্রু, কে বা মিত্র।

আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা প্রতিনিয়ত অতৃপ্তির আগুণে জর্জ্জরিত। কিছুই হইল না, কিছুই পাইলাম না—তাঁহাদের কথা এইরূপ। জ্ঞানরাজ্যে নিউটন, প্রেমরাজ্যে শ্রীরাধিকা ও শ্রীচৈতন্য, সেবার রাজ্যে হাওয়ার্ড, ম্যাট্‌সিনী, পার্কার ইত্যাদি। ইঁহারা এই অনন্ত অতৃপ্তির ভিতর দিয়া উন্নতির অনেক উচ্চ সোপানে উঠিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে ইঁহাদের ন্যায় লোক অতি বিরল।

আমরা দেখিতেছি, আমাদের দেশে প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকই অধিক। যে দিকে চাই—দেখি, যে যাহা করে, তাহাতেই সে তৃপ্ত;—আর যেন কিছুই করিবার নাই! ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা প্রেমহীন চরিত্রহীন হইয়া দিন দিন ঝগড়া বিবাদের ভীষণ অনলকুণ্ড সৃজন করিয়া তাহাতে দগ্ধ হইতেছে, তবুও ভাবে, বেশ উন্নতি হইতেছে! ব্রাহ্মপ্রচারক বক্তৃতা করেন,—"খুব উন্নতি হইতেছে, যাহা আশা করা যায় নাই, তাহা হইয়াছে!" অহঙ্কার, বিলাসিতা সব সাধুতা, নিষ্ঠা, চরিত্র ও পুণ্যের সৌরভ বিলোপ করিল, তবুও অশান্তি নাই, অনুতাপ নাই, উদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা নাই,—প্রাণে অনন্ত অতৃপ্তি নাই। কেমনে উন্নতি হইবে, বলত? হিন্দুসমাজের মধ্যে কপটতা দিন দিন ভয়ানক রূপ বৃদ্ধি পাই-

তেছে। যার যা ইচ্ছা করিতেছে, এবং লোক জিজ্ঞাসা করিলে অম্লানচিত্তে অস্বীকার করিতেছে ;—অখাদ্য খাইয়া,অনাচার কদাচারে কলুষিত হইয়াও "না" কথার সাহায্যে রক্ষা পাইতেছে। এদিকে পুনরুদ্ধারকারী প্রচারকেরা বলিতেছেন—"হিন্দু ধর্ম্মের খুব উন্নতি হইতেছে, কিছুই অবনতি নাই।" দেশ-সংস্কারক যাহারা, তাহারা গগণ কাঁপাইয়া বক্তৃতা করিয়া দেশোদ্ধার করিতে চাহিতেছে—কিন্তু দুঃখী দরিদ্রের প্রতি সহৃদয়তা, দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা, হায়, সে সকলের বড়ই অভাব। কিছু কাজ না করিয়াও তাহারা বাহাবা পাইতেছে, নিজেদের প্রশংসা নিজেরাই অসঙ্কুচিত চিত্তে আপন আপন সংবাদ পত্রে ঘোষণা করিতেছে! যদি কেহ কোন বিরুদ্ধ কথা বলে, অমনি তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি দিতে প্রস্তুত! হা ধর্ম্ম, হা দেশোপকার-ব্রত, তোমাদের আজ একি হীনাবস্থা দেখিতেছি !! কোথায় মানুষ, ঈশ্বরে মনপ্রাণ সঁপিয়া, স্বার্থ ও সংসার কামনা বিরহিত হইয়া কাজ করিবে ;—না এখন দেখি, মানুষ সংসারকে মন প্রাণ সঁপিয়া, দুটা চারটা ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান লইয়া মাতামাতি করিতেছে, বাহাদুরী দেখাইতেছে! মন তাঁতে, কাজ এখানে ;—না—মন এখানে, দুই চারিটা অনুষ্ঠান তাঁর! এতে আর কি হইবে বলত? আমরা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে দুই চারিটী অভাবের কথা বলিয়াছি,—জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধেও দুই দশটী কথা বলিয়াছি। ভালবাসি, এবং উন্নতি চাই বলিয়া অভাবের কথা বলিয়াছি। বলি হিতৈসি, তাতে তুমি এত বিরক্ত হও কেন, বলত? তোমাদের কোন অভাব না থাকে, এই গরীবের কথায় কর্ণপাত করিও না, আর যদি প্রকৃতপক্ষে অভাব থাকে, তবে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে না কেন? আমরা বৃথা কেবল খোসামুদী করিব?—কেবল প্রশংসা করিব? না—তা পারিব না। কাজ দেখি না, জীবন দেখি না, নিঃস্বার্থতা দেখি না ;—যা দেখি, কেবল হই-চই। হই-চই করিয়া দেশোদ্ধার করিবে, ভাবিয়াছ? তাহা হইবে না। কাজ না করিয়াও যে প্রশংসার জন্য লালায়িত, তার প্রশংসা না পাওয়াই উচিত। বিশেষত সে কাজের ভার নিজেরাই যখন গ্রহণ করিয়াছ, তখন আর সেজন্য চিন্তা কি? নিজেদের কাগজেই যখন নিজেদের প্রশংসা গাইতে শিখিয়াছ, তখন আর ভয় কি? প্রশংসার শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে, চতুর্দ্দিকের মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতেছে, কি যেন একটা ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু হায় কোথায় বা কাজ, কোথা বা উন্নতি! উন্নতির চেষ্টা করিতেছ? সে ভাল কথা, কিন্তু উন্নতির পূর্ব্বাভাস যে আপন অভাব স্মরণ করা, আত্মত্যাগ করা, তাহা একবার ভাবিবে না কেন? তোমরা তোমাদের অভাব দেখ না, স্বার্থ ছাড় না, তাই তোমাদের অপযশ গাই। জাতীয় মহাসমিতিতে যাইয়া যাহারা মূকের ন্যায় বসিয়াছিলেন, কোন কাজই করেন নাই,তাঁহাদেরও প্রশংসার স্তুতিবাদে আকাশ ফাটিতেছে। না জানি, কিছু কাজ করিয়া আসিলে বা দেশোদ্ধার হইলে কি না হইত! যে প্রকৃত কাজ করে, বিনয়ে তার মস্তক নত নয়, সে মনে করে, যাহা করা উচিত ছিল, তাহার কিছুইত করা হয় নাই। আর যে কিছু না করে, তাহারই যত বাহাদুরী। বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(W. C. Bonerjee) প্রশংসা চান না, কিন্তু অকর্ম্মা চুণাপুঁটিদের প্রশংসা না করিলে তাহারা অমনি মুখভার করেন, কত কথাই বলেন। ছি, এ কিরূপ ব্যবহার! তোমরা অহঙ্কারে যদি আটখানা না হইতে, কিছু ব্রত বা কর্ত্তব্যপালন না করি-করিয়াও যদি করিয়াছি বলিয়া জগতে ঘোষণা না করিতে ;—এইরূপ হই-চই দ্বারা যদি মাতৃঋণ পরিশোধ করিতে না চাহিতে, তবে আমরাও কোন কথা বলিতাম না। কিন্তু যে ভাবে তোমরা ঘুরিতেছ, ফিরিতেছ, ইহার তীব্র প্রতিবাদ না করিলে আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু মনে রাখিও, আমরা তোমাদিগকে ভালবাসি বলিয়াই তোমাদিগকে দেশের অনন্ত অভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দি। বুঝ আর না বুঝ, আমরা আত্মীয় ভাবি বলিয়াই তোমাদের দোষের, ও দেশের অভাবের উল্লেখ করি। তাতে যদি বিরক্ত হও, নাচার কি করিব! প্রকৃত কথা বলিতে কি, যতদিন আমাদের দেশের প্রচারকেরা, দেশ-সংস্কারকেরা, দেশের হিতৈষীরা দোষের কথা, অভাবের কথা শুনিলে ক্রোধান্বিত হইবেন, ততদিন বুঝা যাইবে যে, তাহারা কেবল যশের লালসায় ও স্বার্থ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত,—নচেৎ কেন দোষের কথা শুনিতে পারেন না? যতদিন তাঁহারা দোষ-প্রদর্শনকারীকে প্রকৃত বন্ধু জানিয়া কোল পাতিয়া উদার-বক্ষে আলিঙ্গন করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহারা যে যশ মান পিপাসু, একথা বলিবই বলিব। প্রকৃত গুণের পুরস্কার কোথায় না হইয়াছে? প্রকৃত গুণ থাকে, মহত্ত্ব থাকে, আপনি তাহা জগতে প্রচারিত হইবে ;—সে জন্য এত ব্যতিব্যস্ত কেন? প্রশংসার কিছু থাকে, দশ মুখে অন্যে প্রশংসা করিবে, সে জন্য চিন্তা কি? মানুষ তুমি যদি প্রশংসার স্তুতিবাদ না ভুলিয়া যাইতে পারিলে, তবে তোমার দেশ-হিতৈষিতা বা ধর্ম্ম যে কেবল কথার কথা, তাতে আর সন্দেহ নাই। যদি মানুষ হও, অনুসন্ধান করিয়া যে যে ব্যক্তি দোষ, বা ছিদ্র বাহির করিয়াছে, সৈয়দ আমেদই হউন, আর লর্ড ডফারিণই হউন, তাঁহাদিগকে আনিয়া প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় পূজা কর। মনে রাখিও, যে স্তুতিবাদ করে, সে অহঙ্কারের রাজ্যের পথপ্রদর্শক; আর যে অভাব দেখায়, সে অনন্ত উন্নতির পথ-প্রদর্শক। বিনীত হৃদয়ে তার পূজা কর। নিশ্চয় বলিতেছি, চাটুকারিতা, আত্ম-প্রশংসা যদি না ভুলিতে পারিলে, তবে তোমার এই কঠোর দেশহিতকর ব্রত গ্রহণের অধিকার নাই।

বড়ই দুঃখের বিষয়, শিশু যাহা বুঝে, আমাদের দেশের প্রবীণ ব্যক্তিরাও তাহা বুঝেন না। শিশুকে বারম্বার মা প্রহার করিলেও শিশু মা মা বলিয়া কাঁদিয়া মাকে ধরিয়া আদর করে ;—একবারও সে ভাবে না যে, মা পর। আমাদের দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের কোন দোষের কথা বলিলে তাহারা মনে করেন যে, এ ব্যক্তি আমাদের শত্রু! যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি আমাদের জীবনের লক্ষ্য, সেই ব্রাহ্মসমাজের দোষের উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজের শত্রু বলিয়া অভিহিত হইয়াছি! জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে কয়েক বৎসর কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি বলিয়া মহাজনেরা মনে করিতেছেন, আমরা জাতীয় মহাসমিতির শত্রু, সুতরাং দেশের শত্রু। গভীর প্রাণের টানে ভাল-

বাদার আকর্ষণে যে এই গুরুতর অভাব প্রদর্শন করিয়াছি, কপটতার জাল মুক্ত করিয়া দিয়াছি, এ কথার বিচার কে করিবে, এ কথা কে বা বুঝিবে !!

ব্রাহ্মসমাজের ও জাতীয় মহাসমিতির বিজয়ঢক্কা যাঁহারা গভীর গর্জ্জনে বাজাইতেছেন, তাঁহাদিগকে একান্ত অনুরোধ করি, আত্মানুসন্ধান করুন, দেশের অভাব রাশির বিষয় পর্য্যালোচনা করুন, আত্ম-প্রশংসা ও আত্মকামনা, যশ মানের লালসা ভুলিয়া, দেশের অনন্ত অভাব রাশির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সেই সকল অভাব দূর করিতে চেষ্টিত হউন। কেবল ভিক্ষা-নীতি অবলম্বনে দেশোদ্ধার হইবে না। আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে, অভাব দূর করিতে চেষ্টিত হউন। নীতি, পুণ্য ও চরিত্র লাভ করুন, দরিদ্রের অভাব দূর করুন, অহঙ্কার ও বেশ ভুষা ছাড়িয়া সাধারণ লোকের সহিত একাত্মক হউন, কপটতা পরিহার করুন, বৃথা হই-চই, বাহ্যাড়ম্বর পরিহার করিয়া প্রকৃত কর্ত্তব্য পালনে বদ্ধপরিকর হউন। দেশের উন্নতির জন্য জীবনকে আহুতি দিন—স্বার্থ বিসর্জ্জন দিন, প্রকৃত বীরের ন্যায় কার্য্য করুন। দেশের অভাব দূর হইবে, ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে। তখন বুঝিবেন—কে শত্রু, কে বা মিত্র;—কে আপন, কে বা পর। সেই দিন অভাব-স্মরণে অনুতপ্ত, সুতরাং অনন্ত উন্নতির অধিকারী হইবেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **কৃষ্ণ-জীবনী**—শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ১৲। পুস্তক খানির লেখা ভাল, কিন্তু প্রসন্ন বাবুর এ পুস্তক সম্বন্ধে সুলভ সমাচার লিখিয়াছেন, নববিধান সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় সুলভ সমাচারে কৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অনুমতি না লইয়া গ্রন্থকার সেই গুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এ গ্রন্থকার সম্বন্ধে অনেক দিন পূর্ব্বে বান্ধবেও এরূপ একটী কলঙ্কের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। সত্য হইলে, ইহাপেক্ষা এক জন ভদ্রলোকের পক্ষে কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে !

২। **জীবন সমস্যা**।—শ্রীরমেশ চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৶০। পদ্যময় পুস্তিকা, ভাল হয় নাই।

৩। **বিবিধ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত শ্লোক সংগ্রহ**।—শ্রীরাম চক্রবর্ত্তিণা সুসংগৃহীত। মূল্য ।৷০ আনা মাত্র। হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া গ্রন্থকার অনুবাদ সহ অনেক সুন্দর শ্লোক ইহাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। সংগ্রহ অতি সুন্দর হইয়াছে এবং অনুবাদ বিশুদ্ধ হইয়াছে।

4. THE CHILD'S OWN BOOK ;—Containing a list of simple words, phrases and sentences by Triguna Charan sen M. A. Price 2 Annas. অনেক আবশ্যকীয় ইংরাজি শব্দ অনুবাদ সহ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেদের খুব উপকারে লাগিবে।

৫। কবিতা-কণা।—বিনোদ বিহারী রায় প্রণীত, মূল্য ৵০। পুস্তক খানি ছোট, কিন্তু হইলে কি হয়, ইহাতে সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে। চেষ্টা করিলে লেখক কালে ভাল কবি হইতে পারিবেন।

৬। দাদা ও আমি—নাটিকা, মূল্য ১৵০ এক টাকা দুই আনা। পুস্তক খানি রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইতেছে। পুস্তকের অনেক স্থানই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনুবাদ করিলেও কি এমন নীরস করিয়া করিতে হয়! গ্রন্থকারের পূর্ব্ব সুযশে কালিমা পড়িয়াছে।

৭। নলিনী।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। কবিতা লেখার ক্ষমতা গ্রন্থকারের আছে, কিন্তু ভাব বড় অস্পষ্ট; অনেক টানিয়া বুনিয়া বাহির করিতে হয়।

৮। "শতদল" ও "ত্রিশূল।"—শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ।৵০ ও ।০। লেখা দেখিয়া বোধ হইল, বালকের লেখা। লেখক রবীন্দ্র বাবুর শিষ্য। পুস্তক খানির স্থানে স্থানে অতি সুন্দর কবিত্বশক্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কালে ইনিও ঠাকুরবাড়ীর মুখ কতক উজ্জ্বল করিতে পারিবেন বলিয়া আশা হয়।

৯। ঢাকার তুর্ণড সঙ্গীত ও তুর্ণড কাব্য।—কবির বর্ণনা করিবার শক্তি বেশ আছে। কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনে তিনি নিতান্ত অপটু।

১০। জ্বর-প্রকাশ।—শ্রীসত্যজীবন লাহিড়ী কর্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ১।০ টাকা। হোমিওপ্যাথিক মতে জ্বরচিকিৎসা। এই পুস্তকখানি বহুদিনের বহুদর্শিতার অর্থাৎ পরিপক্ক বৃক্ষের ফল। ইহাদ্বারা মফঃস্বলবাসী চিকিৎসকগণের যথেষ্ট উপকার হইবে।

১১। ব্রহ্মসেনা।—ব্রহ্মসেনার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মসেনার উদ্দেশ্য ভাল। স্থায়ী হইলে এবং হুজুগে পরিণত না হইলে ইহা দ্বারা মঙ্গল হইবে।

১২। নীতি-কুসুম।—দ্বিতীয়ভাগ, শ্রীবিপিনবিহারী রায় সঙ্কলিত—মূল্য ।০; বিপিন বাবু নানা খ্যাতনামা গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সুন্দর সুন্দর নীতিপূর্ণ কবিতাগুচ্ছ স্কুলের পাঠোপযোগী করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। সংগ্রহ সুন্দর হইয়াছে।

১৩। দাশরথি।—শ্রীবিপিন বিহারী রায় প্রণীত; মূল্য ॥০ আনা। রামায়ণ এ দেশের অতি আদরের জিনিস। ইহা চির নূতন, চির শিক্ষাপ্রদ, চির আনন্দদায়ক। যতবার পাঠ কর, অতৃপ্তি জন্মিবেনা। ইহা অবলম্বনে যত গ্রন্থ রচিত হউক না কেন, নীরস হইবে না। রামজীবনে এমন কিছু স্বর্গীয় শোভা আছে, যাহাতে তাঁহার নাম এদেশবাসীর হৃদয়ে চির উজ্জ্বল রহিয়াছে। দাশরথি, সুতরাং এ দেশে যে উপেক্ষিত হইবে না, অনায়াসেই আশা করা যায়। পুস্তকখানি স্কুলের ছাত্রগণের জন্য লিখিত। ছাপা বেশ পরিস্কার, অক্ষর বেশ বড় বড়,—কাগজ বেশ সুন্দর, বিষয় ভাল, রুচি পরিমার্জ্জিত। ইহা সীতার বনবাসের ভাষার অনুকরণে লিখিত। কিন্তু গ্রন্থকার উপযুক্ত শব্দ-যোজনায় তেমন কৃতী নহেন, স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে বহু ত্রুটী লক্ষিত হয়। অযথা অনেক বড় বড় সমাসযুক্ত পদ প্রয়োগ হইয়াছে। অনেকের বিবেচনায় এরূপ ভাষা বিদ্যালয়ের পাঠ্যের উপযুক্ত; কিন্তু আমরা এরূপ অযথা পদ-প্রয়োগের পক্ষপাতী নহি। বাঙ্গলা ভাষা বর্ত্তমান সময়ে যে উন্নতির ভিতর দিয়া যাইতেছে, সেই হৃদয়স্পর্শী সরল ভাষায় দাশরথি লিখিত হইলে আমরা সুখী হইতাম।

চৈতন্য চরিত ও চৈতন ধর্ম্ম। (২৮শ)

(নগরকীর্ত্তন শেষ।)

অল্প ক্ষণ মধ্যেই সমস্ত নগরে প্রচার হইয়া গেল যে আজ নিমাই পণ্ডিত প্রকাশ্য ভাবে নগরে নগরে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইবেন। নাগরিক লোক সকল মহোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বাহ্নিক আয়োজন করিতে লাগিলেন; যুবকেরা রাশি রাশি ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল; কদলী তরু, আম্রশাখা ও পূর্ণ কুম্ভ দিয়া মনোহর তোরণ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, বয়স্কেরা ছোট বড় নানা প্রকারের অসংখ্য মশাল প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন, তৈলের যোগাড় করিলেন এবং বৃদ্ধেরা মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা, রামসিঙ্গা ও পতাকাদি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; মহিলারা মালা চন্দন ও শঙ্খ লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন যে সংকীর্ত্তনের দল যখন বাটীর নিকটে আসিবে তাঁহারা তখন শঙ্খ-ধ্বনি করিয়া মালা চন্দন বৃষ্টি করিবেন। আজ আর লোক সকল কাজীর ভয়ে ভীত নয়, পাষণ্ডীদের বিদ্রুপ গ্রাহ্য করেনা এবং পিতা মাতা গুরুজনের নিষেধ মানে না। অনুরাগ ও উৎসাহের বিশাল তরঙ্গ উঠিয়া সমস্ত নবদ্বীপকে যেন নাচাইতে লাগিল; রামের দেখে শ্যাম, শ্যামের দেখে হরি, হরির দেখে মধু, এইরূপে আবাল বৃদ্ধ বনিতা নবভক্তিবিধানের নূতন মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এক মশাল রচনার কথাই কতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

'নিমাই পণ্ডিত আজি নগরে নগরে;
নাচিবেন ধ্বনি হইল প্রতি ঘরে ঘরে।
বাপে বাঁন্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার;
কেহ কারে হরিষে না পারে রাখিবার।
তার বড় তার বড় সবেই বান্ধেন;
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন।
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার;
দিয়াটির সংখ্যা করিবার শক্তি কার।
হইল দিয়াটিময় নবদ্বীপ পুর;
স্ত্রীবালবৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর।
এই শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণ বিনে;
তবু পাপী লোক না জানিল এত দিনে।
ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব নবদ্বীপ;
চলিল দিয়াটি লই প্রভুর সমীপ।'

যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নানা সাজে সজ্জিত বৈষ্ণব মণ্ডলী ও নাগরিক লোক সকলে গৌরের আঙ্গিনা পূর্ণ হইয়া গেল; সকলের মুখেই উৎসাহ আনন্দ মূর্ত্তিমান বিরাজ করিতেছে। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার? এক সামান্য ব্রাহ্মণ কুমারের ইঙ্গিতে রাজাজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া এত লোক নগরে নগরে সংকীর্ত্তন গাইতে যাইবে? একি ভগবানের ভক্তির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে সমর যাত্রার মিছিল না কি? বৃন্দাবন দাস সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে ভগবদ্ভক্তি বিনা ইহা কখনই হইতে পারে না; তথাচ

অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে না। ধন্য ভগবান্! ধন্য তোমার বিধান চক্র! ধন্য বিধান প্রবর্ত্তকগণ! যে শক্তি আজ গৌরের এই বিশাল সংকীর্ত্তনদলে প্রতিষ্ঠিত; সেই লীলাময়ী ভগবচ্ছক্তিকে আমি অবনত মস্তকে বারবার নমস্কার করি।

সকল লোক একত্রিত হইলে গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনের পৃথক পৃথক সম্প্রদায় বাঁধিয়া দিলেন। সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈত আচার্য্যের দল, তৎপরে হরিদাসের, তৃতীয় শ্রীবাস পণ্ডিতের ও সর্ব্ব শেষে স্বয়ং গৌরচন্দ্রের দল কীর্ত্তন করিতে লাগিল। গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিতাই কহিলেন 'আমার স্বতন্ত্র দলে নাচিবার শক্তি নাই; আমি তোমার পাশেপাশেই থাকিব।' সুতরাং পঞ্চম দল হইল না। সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তকদিগের বেশভূষারই বা কি সৌন্দর্য্য! সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ও আবীরে চর্চ্চিত, ত্রিকচ্ছ ধূতি পরিধান, মস্তকে, গলদেশে, বাহুমূলে সুগন্ধি পুষ্প মালা, হাতে মন্দিরা, করতাল, শঙ্খ আদি। খুব মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, গৌরের অশ্রু কম্প, স্বেদ বৈবর্ণ প্রভৃতি ভাবোদয় হইতে লাগিল, হরিধ্বনিতে গগণ বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং থাকিয়া থাকিয়া সেই বিস্তীর্ণ লোক সমুদ্রের মধ্যে নানা প্রকারের ভাবতরঙ্গ খেলিতে লাগিল। এইরূপে বেলাবসান হইলে ভক্ত মণ্ডলী কীর্ত্তন করিতে করিতে বাড়ীর বাহির হইলেন। তখন চারিদিকে কোটি অর্ব্বুদ মশাল জ্বলিয়া উঠিল, মহিলাগণ মঙ্গল সূচক শঙ্খধ্বনি যোগে খই, কড়ি, পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং পুরুষদিগের হরিনাম মিশ্রিত উচ্চ কণ্ঠধ্বনির সহিত বামাগণের হুলুধ্বনির কোমল কণ্ঠ মিশিয়া সান্ধ্য সমীরণকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। চারি সম্প্রদায়ে চারিটী নূতন রচিত পদ গীত হইতে লাগিল। আচার্য্য-প্রমুখদল 'হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমো, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' হরিদাসের দলে 'হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম' শ্রীবাস পণ্ডিতের দলে 'মুগধা গোবিন্দ বলরে, যাহা হৈতে নাহি হয় শমন ভয়রে" এবং গৌরের দলে "তুয়ার চরণে মন লাগহুঁরে শারঙ্গ ধর! তুয়ার চরণে মন লাগহুঁরে" পদ প্রমত্ত ভাবে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রথমে চারিটী সম্প্রদায় স্থির গম্ভীর ভাবে গাইতে গাইতে চলিল, কিন্তু নগরের পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, কীর্ত্তন যতই জমাট বাঁধিতে লাগিল, লোক সকল যতই মাতামাতি করিতে লাগিল, ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ যতই তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল, সম্প্রদায় চতুষ্টয় ততই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সাগর সঙ্গমোন্মুখী নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। নবদ্বীপের গঙ্গার ধারে ধারে এক প্রশস্ত পথ ছিল, এই বিশাল সংকীর্ত্তন দল সেই পথে চলিল। প্রথমে গৌরের স্নান ঘাটে কতকক্ষণ কীর্ত্তন হইয়া মাধাইর ঘাট ও বারকোণা ঘাট দিয়া সংকীর্ত্তন সিমুলিয়া নগরে প্রবেশ করিল। এই সিমুলিয়া নামক স্থানে কাজী ও রাজকীয় সমস্ত কর্ম্মচারী বাস করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহা তখনকার অতি সমৃদ্ধিশালী ও সৌষ্ঠবান্বিত স্থান। কি আশ্চর্য্য! কাজীর নিষেধ সত্ত্বেও লোক সকল কীর্ত্তন অভ্যর্থনার জন্য নানা প্রকারে স্বস্ব বাড়ীর ও পথ ঘাট সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কদলীর কাঁদি সহিত রম্ভাতরু,

আম্রসার, নারিকেল, গুবাক, পুষ্পমালা, অশোকমালা প্রভৃতি নানা সজ্জায় নগরী আজ সুশোভিত।

"গঙ্গা তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায় ;
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায়।
আপনার ঘাটে আসে বহু নৃত্য করি ;
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌর হরি।
বারোকোণা ঘাটে,নগরীয়ার ঘাটে গিয়া,
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া।
লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুর্দ্দিকে জলে ;
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে।
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে ;
দিবা নিশি এক কেহ নারে নিশ্চয়িতে।
সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে ;
রম্ভাপূর্ণ ঘট আম্রসার দীপ জলে।'

'লক্ষ কোটি দীপে, চন্দ্রের আলোকে
না জানি কি ভেল সুখে ;
সকল সংসার, হরি বই আর,
না বলয়ে কেহ মুখে।
অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্ব লোক,
আনন্দে হইল ভোর ;
সবেই সবার, চাহিয়ে বদন,
বলে ভাই হরি বোল।'

সিমুলিয়ার নিকটবর্ত্তী হইলে অসংখ্য অসংখ্য নগরীয় লোক কীর্ত্তনে যোগ দান করিল। প্রবল স্রোতস্বতী নদীজলে প্রখর বেগে নুতন বন্যার জল পড়িলে যেরূপ উত্তাল তরঙ্গ ও ফেণোদ্গম হইয়া ভীষণতর বেগ সমুত্থিত হয়, তখন সংকীর্ত্তনও সেইরূপ ভীষণ রূপ ধারণ করিল ; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যেন কৃষ্ণোন্মাদগ্রস্থ হইয়া পড়িল। কে কাহাকে কি বলে, কি করে কিছুরই ঠিক নাই। কেহ কেহ নানা রঙ্গ ভঙ্গীতে নাচিতে লাগিল, কেহ কেহ হরি বলিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ ধূলাতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, কেহ মুখে নানা রূপ বাদ্য করিতে লাগিল, কেহ কাহারও স্কন্ধে উঠিয়া বসিল, কেহ মাতোয়ালের ন্যায় কাহারও চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, কেহ কেহ পরস্পর কোলাকুলী করিতে লাগিল, কেহ বলিতে লাগিল, আমি ভাই! নিমাই পণ্ডিত, জগৎ উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, কেহ বলে আরে ভাই! কাজী বেটাকে ধরিয়া আন; তাহাকে শিক্ষা দিব, কেহ বলে আরে! ধর ধর পাষণ্ডী বেটাদের ধর; তাহারা যেন পলাইতে না পায় ; কোন কোন বীর অবতার লম্ফ দিয়া গাছে উঠিয়া ডাল পালা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। কেহ কেহ যম রাজাকে বাঁধিয়া আনিতে আদেশ দেয়। এইরূপ গৌরচন্দ্রের কীর্ত্তনে নবদ্বীপের লোকগুলা আজ ক্ষেপিয়া গিয়াছে। যাহাদের বহুদিনের মনোমালিন্য ও অসদ্ভাব ছিল তাহারা আজ প্রেমে গলা ধরা ধরি করিয়া গাইতেছে, নাচিতেছে ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে ; যে চিরজীবন পাপ পথে ভ্রমণ করিয়াছে, দুষ্ক্রিয়ার মলিন পঙ্কে যাহার চরিত্রের বস্ত্র মলিন হইয়া গিয়াছে, সে অবিরল অশ্রু ফেলিয়া অনুতাপের কান্না কাঁদিতেছে, যে সৌভাগ্যবান আজন্ম ভগবৎ সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আজ পুলকে দুই হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে ঘোষণা করিতেছেন "আরে ভাই! ভবপারে যাইবার আর ভয় নাই, পতিত পাবন শ্রীহরি স্বয়ং কাণ্ডারী সাজিয়া নাম তরী লইয়া সকলকে ডাকিতেছেন, তোরা সব চলিয়া আয়।"

পাষণ্ডীদিগের দল এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কত কি বলাবলি করিতে লাগিল।

একজন বলিল "এই সময় কাজী সাহেব এখানে আসেন, তো আচ্ছা মজা হয়; কোথায় বেটাদের রঙ্গ ঢঙ্গ যায়, কোথাই বা গান বাজনা থাকে আর কোথাইবা আম্র শাখা কলার গাছ পড়ে থাকে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল "তা হলে যত দেখছো মহাতাপ মশাল, খোল করতাল, ভাব কালী, গঙ্গাসই হয়ে যায়।"

তৃতীয় পাষণ্ডী বলিয়া উঠিল "তাহলে ভাই আমি গঙ্গার ধারে গিয়া ভাবক বেটা-দের ঢেকা মেরে জল সই করে দি। চলনা কেন সকলে যাইয়া কাজীকে ডাকিয়া আনি।"

তাহাদের মধ্যে রসিক রকমের একজন লোক ছিল সে বলিল "আরে তাও কি করতে আছে, তাতে যে আমাদেরও বিপদ ঘটিতে পারে। এসো এক কাজ করা যাক্; কীর্ত্তনের নিকটে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিগে যে ঐ কাজী আসছে। তাহলে মজা দেখো, সকল বেটাই চম্পট দিবে"।

এদিকে সঙ্কীর্ত্তনের দল আস্তে আস্তে সিমুলিয়ার মধ্যস্থানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। গৌরাঙ্গের তৎকালের ভাব যে দেখিল সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। নয়ন যুগল দিয়া দর বিগলিত ধারে অশ্রু পড়িতেছে, হরিবোল হরিবোল বলিয়া দুইটী বাহু তুলিয়া নাচিতেছেন, কখন ভাবাবেশে হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন, কখন আছাড় খাইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছেন, এবং কখন মহাভাবে গর গর হইয়া থর থর কাঁপিয়া উঠিতেছেন। এইরূপ ভাবে কীর্ত্তনের দল ক্রমশই কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরাও অল্প সময়ের জন্য সঙ্কীর্ত্তন হইতে বিদায় লইয়া কাজী সাহে-বের দরবারে যাইবার জন্য পাঠককে অনু-রোধ করিতেছি।

সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই কাজী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কীর্ত্তনকারীদিগের চরিত্রের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য তিনি কয়েকজন পেয়াদাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই আজ কাজী সাহেব দরবারঘরে প্রত্যাগত দূতদিগের নিকট গৌরাঙ্গের আচরণ শুনি-তেছেন। একজন দূত হস্তযোড়ে দণ্ডায়-মান হইয়া বলিল "হুজুর! কি আর বলিব নগরের লোকগুলা এমন করিয়া নগর সাজাইয়াছে যে আমাদের বাদসা নামদার আসিলেও তেমন ঘটা হয় না। কত লক্ষ লক্ষ লোক জুটিয়া যে দলবদ্ধ হইতেছে তাহার ঠিকানা হয় না। মশালই বা কত? বাজনার শব্দে কাণ পাতা যায় না! অধিক কি বল্‌বো, পরদার জানানা গুলাকে পর্য্যন্ত ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। তাহারা শাঁক বাজাচ্ছে, হুলু দিচ্ছে ও খই কড়ি ছড়াচ্ছে, বেটা যেন ঠিক্ বিয়ে কর্‌তে বেরিয়েছে। কি বলে ভূতের নাকি সয়-তানের কীর্ত্তন হচ্ছে। আমরা সেদিন যে সকল লোককে শাস্তি দিয়া আসিয়াছি, তাহারাই আজ মার মার বলিতে বলিতে আসিতেছে। উহাদের সর্দ্দার ঐ নিমাই পণ্ডিত, তাহাকে জব্দ করিতে না পারিলে এ ভূতের বাসা ভাঙ্গিবে না। আল্লা হো আকবর! হুজু-রের এখন যেমন মর্জ্জী।

আর একজন দূত দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "ধর্ম্মাবতার! এক আশ্চর্য্য দেখি-লাম; বামনা কীর্ত্তন করে আর কাঁদে! তার দুই চক্ষের পানীতে বুক ভাসিয়া যায়,

আবার থাকিয়া থাকিয়া এমন চীৎকার করিয়া উঠে যে, দেখিলে বোধ হয় ঠিক যেন গিলিতে আসিতেছে। বাপরে! তাহাকে দেখিলে আমার বড় ভয় হয়।

তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "হুজুরের আদেশ শিরে ধরিয়া আমি একদিন কীর্ত্তন নিষেধ করিতে গিয়াছিলাম। বলিলে বিশ্বাস করিবেন না আমি যেই লোকদিগকে শাসন করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি কোথা হইতে এক প্রকাণ্ড অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আসিয়া আমার দাড়ী গোঁপ পোড়াইয়া দিল। এই দেখুন এখনও মুখে ব্রণ রহিয়াছে।"

এই সময় সভা মধ্যে একজন যবন 'হরি-বোল হরেকৃষ্ণ' ! বলিয়া গান করিয়া উঠিল। কাজী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে! তোমাকেও ভূতে পাই-য়াছে নাকি? হিন্দুরা কীর্ত্তন করে তাদের ধর্ম্ম, তুমি বাপু মুসলমানের ছেলে হয়ে ঐ নামগুলা কেন উচ্চারণ করিতেছ। যাও কলমা না পড়িলে আর তোমার রক্ষা নাই।" সে বলিল "ধর্ম্মাবতার! আমি কি করিব? কীর্ত্তনের স্থানে যে যাইতেছে, সেই হরি নাম না শিখিয়া ফিরিয়া আসিতেছে না। একটী দিনমাত্র সঙ্কীর্ত্তন নিষেধ করিতে যাইয়া আমার এই দশা হয়েছে। আমি কি জানি না যে মুসলমানের পক্ষে হরিনাম করা মহাপাপ। কিন্তু কি করি, সে ভাব যে একবার দেখেছে সে নাম না লইয়া থাকিতে পারে না। কে জানে নিমাই বামনা কি জাদু জানে। হুজুর যদি সেখানে একবার যান আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আপনারও এই দশা হবে।"

কাজী দূতগণের মুখে এই সকল বিবরণ শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া অশেষ প্রকারে ভৎ-সনা করিতে লাগিলেন। তিনি বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ধিক্ তোমাদের মুসলমান বংশে জন্ম; সামান্য কাফেরকে এত ভয়? তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে এই মহা-নগরীতে ত্রয়োদশজন মাত্র মুসলমান বীর হাজার হাজার কাফেরদিগকে পরাভূত করিয়া ইসলামের বিজয় নিশান তুলিয়া গিয়াছেন? তোমরা তাঁহাদের বংশীয় হইয়া এত কাপুরুষ হইয়াছ যে একজন সামান্য বামনাকে ভয় করছো, দেখি আজ কার মাথায় দশটা মাথা আছে যে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এত হিন্দুয়ানি করে।" এই সময় সভামধ্যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। রাজপ্রতিনিধির শেষ কথাগুলি কণ্ঠ হইতে নিঃশেষ হইতে না হইতে হঠাৎ তিনি বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। চারিদিকে হৈ চই উঠিয়া গেল। সকলেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িল; এবং অনুচরবর্গ ধরাধরি করিয়া মূর্চ্ছিত কাজীকে অভ্যন্তরে লইয়া গেল। কেহই ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইল না।

এই সময়ে নগর সংকীর্ত্তনের দল কাজীর অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুসলমান কর্ম্মচারীগণ ইচ্ছা সত্বেও তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। কাজীর মূর্চ্ছা, তাঁহার বাটীর তৎকালিকের বিশৃঙ্খল অবস্থা, সংকীর্ত্তনের গাম্ভীর্য্য ও স্বর্গীয় ছবি, আর নগরের আবাল বৃদ্ধ যুবকের প্রেমোন্মত্ততা তাহাদিগকে কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় করিয়া ফেলিল। কতক লোক গোলমাল দৃষ্টে পলাইয়া গেল, আর কতক লোক নিশ্চেষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিল।

এদিকে নগরবাসী লোক সকল ভাবে বিভোর ও উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া কাজীর পুষ্পবন বাগিচা প্রভৃতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ খুব মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইলে পর গৌরচন্দ্রের ইঙ্গিতে কিছু ক্ষণের জন্য স্থগিত থাকিল। তখন তিনি কাজীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং জনৈক ভব্য লোকদ্বারা তাঁহার আগমন বার্ত্তা বলিয়া পাঠাইলেন। ইহার পূর্ব্বেই কাজীর মুর্চ্ছাপনোদন হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিলেন এবং সম্যক্ সম্মানের সহিত গৌরকে আপনার গৃহে লইয়া বসাইলেন। গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, আজ আমি আপনার অভ্যাগত; কোথায় আপনি আমাকে অভ্যর্থনা করিবেন, না আমাকে দেখিয়া অন্দরে পলাইয়া গেলেন। এরূপ আচরণের কারণ কি?"

কাজী উত্তর করিলেন "তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা হইতেন, সে সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল, তুমি আমার ভাগিনেয়। দেহ সম্বন্ধ হইতেও গ্রামসম্বন্ধ আমার কাছে গৌরবের জিনিষ; স্মুতরাং তুমি আমার যে সে নও। বলিতে কি বাপু হে! তুমি ক্রোধ করিয়া আসিতেছিলে দেখিয়া আমি লুকাইয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম তোমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছে, অমনি আসিয়া সাক্ষাৎ করিলাম। ভাগিনা বলিয়া যেমন আমি তোমার ক্রোধ সহিলাম, তেমনি তুমি কি মাতুলের অপরাধ মার্জ্জনা করিবে না?"

গৌর। অবশ্য করিব, মামা ভাগিনাতে কি বিবাদ রাখিতে আছে? মহাশয় আমি দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, অভয় দিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

কাজী। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর।

গৌর। আচ্ছা আপনারা গোবধ করেন কেন? যাহার সুমধুর দুগ্ধ পানে শরীর পুষ্ট হয়, যাহার পরিশ্রমে জীবনোপায় শস্য সকল উৎপন্ন হয়, আপনারা কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া সেই গাবী ও বৃষের প্রাণবধ করিয়া ভোজন করেন।

কাজী। তোমাদের বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় আমাদের কোরাণশাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দুইটী পথ আছে। নিবৃত্তি মার্গে জীবহিংসামাত্র নিষেধ, কিন্তু প্রবৃত্তি পথে গোবধের বিধি আছে। শাস্ত্রাজ্ঞায় আমরা গোবধ করি, তাহাতে দোষ কি? কেন তোমাদের বেদেও তো গোবধের বিধি দেখা যায়।

গৌরচন্দ্র কাজীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন 'বধ করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিতে না পারিলে বধ নিষেধ। পুরাকালে ঋষিগণ বৃদ্ধ বৃষকে মারিয়া খাইয়া পুনরায় তাহাকে যৌবনাবস্থায় পুনর্জ্জীবিত করিতেন। স্মুতরাং তাঁহাদের মারা হইত না। কলিযুগে ব্রাহ্মণদের সেরূপ ক্ষমতা নাই, সেই জন্য এ যুগে গোবধ নিষিদ্ধ হইয়াছে।' এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ গোহত্যার বিরুদ্ধে অশেষ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কাজীকে গোবধের অপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। কাজী তাঁহার অখণ্ডনীয়যুক্তিবলে পরাজিত হইয়া গেলেন। গৌরচন্দ্র পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "মামা! আর একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঠিক উত্তর দিবেন।"

কাজী উত্তর করিলেন, "যাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা কর।"

গৌর। আচ্ছা আপনি তো পূর্ব্বে মৃদঙ্গ করতাল ভাঙ্গিয়া দিয়া সংকীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার পরে এখন পর্য্যন্ত প্রবলতর রূপে কীর্ত্তন হইতেছে। তথাচ আর বাধা দেন না কেন? আপনারা মুসলমান, হিন্দুর আচার আচরণে বাধা দেওয়া ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন, তবে কেন এখন এত সদ্ব্যবহার করিতেছেন?'

কাজী উত্তর করিল, "একটু নিভৃতে চল এ কথার জবাব্ দিব।"

শচীনন্দন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ সকল লোক আমার অন্তরঙ্গ, যাহা বলিবার থাকে নিঃশঙ্কে বলিতে পারেন।"

তখন অনুতপ্ত কাজী ধীর গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেনঃ- "তোমার সংকীর্ত্তন আরম্ভের পর পাষণ্ডীরা তোমার বিরুদ্ধে আমাকে কত কথা জানাইয়াছে। তাহারা বলে, "নিমাই পণ্ডিত শাস্ত্রোক্ত হিন্দুধর্ম্ম নাশ করিয়া কোথা হইতে এক অদ্ভুত কীর্ত্তন আনিয়াছে, অষ্টপ্রহর তাহা গাইয়া এবং লোকদিগকে শিখাইয়া নগরের শান্তিভঙ্গ করিতেছে। তাহারা মাতালের মত হাসে কাঁদে নাচে গায় ও ধূলায় গড়াগড়ি যায় ও কত অসম্বন্ধ বকে। পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডী বিষহরির পূজায় কেবল রাত্রি জাগরণ হইত, এখন প্রত্যহই রজনী জাগরণ, তাহাদের দৌরাত্ম্যে রাত্রে কেহ ঘুমাইতে পারে না। আপনি বিচারক আপনিই ইহার বিচার করুন।" আমি তাহাদের অভিযোগের তদন্ত জন্য একদিন দুই এক স্থানে যাইয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন নিষেধ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রজনীতে স্বপ্ন দেখিলাম যে এক নরদেহ সিংহ মুখ বিকটাকার পুরুষ আসিয়া তর্জ্জন করত আমার বুকে বসিয়া বিশাল নখ ও দশন দিয়া আমার বুক বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং দন্ত কড়মড় করিয়া বলিতে লাগিল "আরে দুষ্ট! আমার কীর্ত্তনে তুই উৎপাত করিস্? এত বড় স্পর্দ্ধা, মৃদঙ্গের বদলে তোর বুক ফাড়িয়া দিব; আর যদি কিছু বলিস্ তবে সবংশে যবনকুল ধ্বংস করিব। আজ আর কিছু বলিলাম না।"

"সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর;
নরদেহ সিংহ মুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর।
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি;
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি।
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বলে,
ফাড়িব তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে।
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্? করিমু তোরে ক্ষয়;
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পেয়ে বড় ভয়।
সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত;
তেঞি ক্ষমা করি না করিনু প্রাণাঘাত।
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিব;
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিব।"

গৌর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তার পর?'

কাজী। 'আমি স্বপ্ন অমূলকজ্ঞানে ভীত না হইয়া কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য পেয়াদা নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু কোথা হইতে অগ্নি উল্কা লাগিয়া তাহাদের দাড়ি গোঁপ পুড়িয়া যাওয়ায় তাহারা ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ কীর্ত্তন শুনিয়া ভাবাবেশে মত্ত হইয়া হরেকৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে ও কেহ কেহ বা পাগল হইয়া গিয়াছে। আমি ইহাও আকস্মিক ঘটনাজ্ঞানে গ্রাহ্য না করিয়া আজ্ তাহাদের কত তিরস্কার, করিতেছিলাম।

কিন্তু সে দৃশ্য! সেই ভীষণ সিংহ আবার আসিয়া যেন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত, এবার স্বপ্ন নয় সত্যই দুর্জ্জয়সিংহ! তখন আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইলাম, অনুচরবর্গ ইহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই দেখ আমার বুকে তাহার নখ চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।' এই বলিয়া কাজী বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বুক দেখাইলে সকলে সেখানে নখ দন্তের চিহ্ন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। কাজী আবার বলিতে লাগিলেন, "গৌরহরি! আমি এখন নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া এই সংকীর্ত্তন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে, আমি আর ইহাতে বাধা দিতে পারি না, দিলে দেবদ্রোহী হইব।' বলিতে বলিতে কাজীর নয়ন যুগল দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

তখন শচীনন্দন কাজীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া পরমাত্মীয় জ্ঞানে বলিতে লাগিলেন "মামা! তুমি বড় ভাগ্যবান, তাই হরেকৃষ্ণ নারায়ণ নাম গ্রহণ করিলে। যে নাম লইলে মহাপাপী উদ্ধার হইয়া যায়, তুমি তাহাই উচ্চারণ করিলে। তোমার শরীরে আর পাপ নাই।'

কাজী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "নিমাই! তোমার প্রসাদে আমার সব কুমতি দূর হইয়াছে, এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমাতে আমার ভক্তি ও বিশ্বাস অচলা থাকে।"

গৌর বলিলেন, "পতিতপাবন শ্রীহরি আপনার মঙ্গল করিবেন; কিন্তু মামা আমাকে একটী ভিক্ষা দাও যেন নবদ্বীপে আর হরিসংকীর্ত্তনের বাধা না হয়।"

কাজী উত্তর করিলেন যাবৎ আমার বংশ থাকিবে, আমি তালাক দিতেছি কেহই সংকীর্ত্তনে বাধা দিতে পারিবে না।

"কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে;
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে।"

কাজীর অধস্তন বংশীয়েরা বরাবর এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিলেন। শুনিতে পাই এখনও ঐ বংশ বিদ্যমান আছে, এখনও নাকি ঐ বংশীয় মুসলমানেরা বৈষ্ণব অতিথি উপস্থিত হইলে পরম সমাদরে সেবা করিয়া থাকেন।

গৌরচন্দ্র কাজীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। অসংখ্য মৃদঙ্গ করতালের শব্দের সহিত অসংখ্য মানবকণ্ঠ সম্মিলিত হইয়া পুর্ণিমার নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল, নবদ্বীপ পুরী যেন সুখ তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল; আনন্দ বিহারী সঙ্কীর্ত্তন দলে জীবন্ত রূপে উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন; ভক্ত বৃন্দের চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল; প্রেমবন্যার খরতর স্রোতে কত কত পাষণ্ডীদিগের চিত্তরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ হাবুডুবু খাইতে খাইতে ভাসিয়া চলিল; সকল উৎপাত শান্তি হইয়া ভগবানের মহিমা মহীয়ান হইল; এবং গৌরের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। গৌর আজ প্রেমানন্দে ভরপুর হইয়া কাজীর কণ্ঠ ধরিয়া হরিবোল' বলিতে বলিতে রাজপথ দিয়া নাচিয়া চলিলেন। অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া কাজী গৌরের নিকট বিদায় হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

'সঙ্গে সঙ্গে আইসে কাজী উল্লসিত মন।
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।"

কাজীর উপাখ্যান সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতের বর্ণনার সহিত চৈতন্য চরিতামৃতের

বর্ণনার বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। ভাগবতের মতে কিছু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হওয়ায় চরিতামৃতের মতানুসারেই বর্ত্তমান প্রস্তাব লিখিত হইল। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, গৌরচন্দ্র কাঁজীর গৃহে উপস্থিত হইয়া লোকদিগকে কাজী সাহেবের ঘর বাড়ী বাগান ভাঙ্গিতে আর তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কাজী পলায়ন করিলে গৌরের উন্মত্ত দল কাজীর ঘর দুয়ার বাগান বাড়ী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন শচীনন্দন ক্রোধে অধীর হইয়া কাজীর বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে বলিলে ভক্তগণ নাকি স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। তাই কাজী রক্ষা পাইয়াছিলেন।

"আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর ;
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর।
ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজী বেটা কোথা ?
ঝাঁট আন্ ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা।
নির্যবন করি আজি সকল ভুবন ;
পূর্ব্বে যেন বধিয়াছি সে কাল যবন।
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার ;
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার।"

স্থানান্তরে :—

"মহামত্ত সর্ব্বলোক চৈতন্যের রসে ;
ঘরে উঠিলেক সবে প্রভুর আদেশে।
কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার ;
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার।
আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে ;
কেহ কদলীর বন ভাঙ্গি হরি বলে।
ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর ;
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর।
পুড়িয়া মরুক সবগণের সহিতে ;
সর্ব্ববাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে।
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ যত ভক্তগণ ;
গলায় বান্ধিয়া বস্ত্র পড়িল তখন।
উর্দ্ধ বাহু করিয়া সকল ভক্তগণ ;
প্রভুর চরণে ধরি করে নিবেদন।
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব দাসের বচনে ;
হরিবলি নৃত্য রসে চলিলা আপনে।
কাজীরে করিয়া দণ্ড সর্ব্বলোক রায় ;
সংকীর্ত্তন রসে সর্ব্বগণ নাচি যায়।"

ইত্যাদি।

কাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল কি না ও কি করিয়াই বা তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইল, এই বর্ণনায় তাহার কোন কথা লেখা নাই। দণ্ড দেওয়ার অর্থ যদি কাজীর ঘর বাড়ী বাগান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় ; তবে প্রস্তাবটী বড়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে ও সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের মূল উদ্দেশ্যে কুঠারাঘাত করা হয়। আর যদি ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ও দগ্ধ করিয়া ফেলা রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কাজীর আসক্তির ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া পাপবনে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত কথার সামঞ্জস্য হইলেও উপাখ্যানটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ; কারণ কেমন করিয়া কাজীর পাপাসক্তি নষ্ট করিয়া তাহাকে উদ্ধার করা হইল তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু যে ভাবের বর্ণনা দেখা গেল, তাহা হইতে আধ্যাত্মিক ভাব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। আমরা জানি যে বৃন্দাবন দাস মহাশয় একজন উচ্চশ্রেণীর ভক্ত ; গৌরচরিতে কঠোর অপ্রেমের দোষারোপ করা তাঁহার মনে থাকিতে পারে না ; কিন্তু তাঁহার বর্ণনা দৃষ্টে তাহা বুঝা যায় না ;

সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে একথা এখানে বলিতে হইল; ইহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে ভক্তপাঠক অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন।

সে যাহাহউক কাজী বিদায় হইয়া গেলে সঙ্কীর্ত্তনের দল শঙ্খবর্ণিক পাড়া, তন্তুবায় পাড়া প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থান সকল প্রদক্ষিণ করিয়া গাদিগাছা, পার ডাঙ্গা, আম্রুদিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সকল নগরই শোভনীয় রূপে মণ্ডিত, পথের দুই ধারে দীপমালা, আম্র-শাখা ও কদলী তরুরাজি নানাবিধ পুষ্প মালায় শোভা পাইতেছে, পুরাঙ্গনারা উলু ধ্বনি ও শঙ্খনাদ করিতেছেন, আর খই কড়ি কুসুম স্তবক বর্ষণ করিতেছেন; নগরবাসি-গণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আজ মহা-মহোৎসবে মাতিয়াছে। নগরের শেষ প্রান্তে শ্রীধরের বাড়ী; একখানি ভগ্ন কুটীরে তিনি বাস করেন। ভক্তদল মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নাচিতে নাচিতে অবশেষে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অমনি ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো উদয় হইল; ভগ্ন কুটীর রাজপ্রাসাদে পরিণত হইল; তাই তরকারী বিক্রেতা প্রেমানন্দে ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিতে লাগিলেন। ঘরের দুয়ারে একটী নানা স্থানে তালি দেওয়া জলপূর্ণ লৌহপাত্র ছিল। বাহিরের কাজে লাগাইবার জন্য গৃহস্বামী ঐ পাত্রটী বাহির দুয়ারে রাখিতেন। গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনের শ্রমে পিপাসিত হইয়া ঐ পাত্রের জল পান করিয়া ফেলিলেন। শ্রীধর দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া "মারিলেরে! মারিলেরে! আমাকে সংহার করিতে তুমি এখানে আসিয়াছ! বলিতে বলিতে দৌড়িয়া আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ বলিলেন "প্রভু! উহা অপবিত্র জল, পান করিবেন না।" শচী-নন্দন উত্তর করিলেন "কি? ভক্তের জল অপবিত্র? তবে পবিত্র কি? আজ আমি এই অমৃত জল পান করিয়া পরম পবিত্র হইলাম।"

"প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর।
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে;
শ্রীধরের জল পান করিনু যখনে।
এখন সে কৃষ্ণ ভক্তি হইল আমার;
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সুধার।"

তখন শ্রীধর অঙ্গনে একটা মহা প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল; প্রভুর ক্রন্দনে ভক্ত-দল সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। হাজার হাজার লোকের রোদন ধ্বনিতে আকাশ তোলপাড় হইয়া গেল। এখন আর কীর্ত্তন নাই; কেবল ক্রন্দন আর লুণ্ঠন। এই স্বর্গের দৃশ্য যিনি দেখিলেন তিনিই কৃতার্থ হইয়া গেলেন। রজনী প্রভাতে সংকীর্ত্তন দল গৌরের অঙ্গিনায় ফিরিয়া আসিলে, ভক্তগণ যে যাহার আবাসে চলিয়া গেলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

বর্ণভেদ।

বৈদ্য।

বৈদ্যদিগের সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রচার করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, তাহা পাঠকদিগের নিকট নূতন। আমাদিগের পূর্ব্বে কেহ এই মত প্রচার করার সংবাদ আমরা অবগত নহি, বোধ হয় পাঠকগণও তাহা জ্ঞাত নহেন। তিন বৎসর অতীত হইল, বান্ধব নামক সাময়িক সন্দর্ভে আমরা ইহা সংক্ষেপে প্রচার করিয়াছিলাম। কিন্তু এই দীর্ঘকাল মধ্যে কেহ ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, কিম্বা কাহারও দ্বারা এই মত অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়াও আমরা জ্ঞাত নহি। আমাদের প্রচারিত মত কায়স্থ কিম্বা বৈদ্যদিগের প্রীতিকর হউক আর না হউক তজ্জন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। প্রবন্ধ লিখিয়া ব্যক্তি বিশেষের প্রীতি সাধন করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। দীর্ঘকাল পুরাতত্ত্বালোচনা দ্বারা আমাদের হৃদয়ে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহা প্রচার করাই আমাদিগের একমাত্র অভিপ্রায়। এ পর্য্যন্ত কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে, তৎ সমস্তই পরস্পর গালাগালিতে পরিপূর্ণ। কায়স্থ দ্রোহীগণ ইহার পথ প্রদর্শক। কায়স্থকৌস্তভ নামক গ্রন্থ প্রচার হইলে পর তাহার প্রতিপক্ষগণ কায়স্থ দিগকে নির্যাতন মানসে এই ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিয়া দেশ মধ্যে একটী বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন। সেই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কোন পাঠক আমাদিগকে নানা প্রকার মধুর শব্দ দ্বারা আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এমন কি বৈদ্যবংশীয় কোন কোন ব্যক্তি আমাদিগকে সুদৃঢ় দণ্ড প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রদান করিতেও লজ্জিত হন নাই। (১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের বান্ধবে পাঠকগণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।) আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উপরিউক্ত সুহৃদবর্গের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত দুই একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন বলিয়া আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস নাই, দেশে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও অদ্যাপি কেহ সেই ইতিহাসউদ্ধারের জন্য যত্নবান্ হন নাই। অথবা এই সুমহৎ ব্যাপারের অনুপযুক্ত হইলেও দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবৎ এই ইতিহাস সংগ্রহ জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। দীর্ঘকাল যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা হৃদয়ে যাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে, ব্যক্তি বিশেষের প্রীতি বা অপ্রীতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহাই প্রচার করিব।

হিমালয়ের অভ্রংলিহ প্রদেশ হইতে কুমারিকার সাগর চুম্বিত স্থান, ও যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের সূতিকাগৃহ মিথিলা হইতে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী আর্য্যজাতীর শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ কর, কোন স্থানেই বৈদ্য আখ্যা সম্পন্ন একটী স্বতন্ত্র বর্ণ দেখিতে পাইবে না। যেস্থানে বসিয়া মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি

ঋষিগণ তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন সেই দেশে বৈদ্য বলিয়া একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী নাই। প্রাচীন কালে প্রধানতঃ কায়স্থগণ চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন, এ জন্যই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে অম্বষ্ঠ-দিগকে চিকিৎসক বলা হইয়াছে। কিন্তু উত্তরকালে কায়স্থ ব্যতীত ব্রাহ্মণ কুলজাত কোন কোন ব্যক্তিও এই ব্যবসা অবলম্বন করেন; তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুগ্ধবোধ প্রণেতা "বিপ্র" বংশীয় বোপদেব গোস্বামীর পিতা কেশব চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। অদ্যাপি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও দক্ষিণাপথে কোন কোন ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। মহারাষ্ট্র দেশে কতকগুলি কায়স্থ পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। আমাদিগের পদবীর ন্যায় তাঁহাদের নামের অন্তে "বৈদ্য" শব্দ সংযুক্ত হইয়াথাকে। * এবম্বিধ নানা প্রকার কারণে বোধ হয় যে বল্লালকৃত শ্রেণী বিভাগের পর বঙ্গদেশীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী কায়স্থগণ বৈদ্য নামে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। সেন বংশীয় রাজাদিগের অধিকার যে সকল স্থানে বিস্তৃত হয় নাই, বাঙ্গালার সেই অংশে অদ্যাপি কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের মধ্যে আদান প্রদান হইয়া থাকে। † মুর্সিদাবাদের অন্তর্গত কোন একস্থানের কায়স্থ নন্দী বংশীয় এক ব্যক্তি স্থানান্তরে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহার উত্তর পুরুষগণ বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। শাণ্ডিল্য গোত্রজ কায়স্থ দত্তবংশের এক শাখা স্থানান্তরে যাইয়া বৈদ্য আখ্যা ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু মূল স্থানে এই বংশ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত; ইহা আমরা বিশেষ রূপে অবগত আছি।

ইহা কে না জানেন যে, পুরাণকারগণ তাঁহাদের কল্পনা অশ্বের বলগা উন্মোচন করিয়া কত আশ্চর্য্য ও অলৌকিক কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার একটী ব্রাহ্মণীর গর্ভে বল পূর্ব্বক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইনিই বৈদ্যদিগের আদি পুরুষ।

শৌনক উবাচ—

কথং ব্রাহ্মণ পত্ন্যাস্তু সূর্য্য পুত্রোঽশ্বিনী সুতঃ।
অহোকেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকার সঃ।

---

* মহারাষ্ট্রী কায়স্থগণ ২৬ গোত্রে বিভক্ত, তাঁহাদের ৪১টী পদবি আছে যথা,—১ গরুড়, ২ গুপ্ত, ৩ বহির, ৪ দল্লী, ৫ নাচনি, ৬ কামাঠ ৭ দিক্ষিত, ৮ গড়করী, ৯ রাওরা, ১০ ক্ষিপ্রে, ১১ শটে, ১২ জয়বন্ত, ১৩ শৃঙ্গারপুরে, ১৪ জাবাল, ১৫ কর্ণটকী, ১৬ প্রধান, ১৭ রণদিবে, ১৮ হলে, ১৯ সাতপুতে, ২০ পাটনকর, ২১ তাক্ষণে, ২২ ফনাস, ২৩ খাটিক, ২৪ বেন্দ্রে, ২৫ বৈদ্য, ২৬ পাৎগুলে, ২৭ কৌড়রে, ২৮ লিখিতে, ২৯ বিবাদে, ৩০ দবলে, ৩১ রাঘুলে, ৩২ চিত্রে, ৩৩ মোহিলে, ৩৪ বোখারে, ৩৫ মুথে, ৩৬ উলকন্দ, ৩৭ ভিসে, ৩৮ চৌবল, ৩৯ থলে, ৪০ তিরেকর, ৪১ দেউপাত্র।

† কেহ কেহ বলেন ঐ সকল স্থান "পাণ্ডব বর্জ্জিতদেশ", কিন্তু "পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ" শব্দের যে অর্থ কি তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। বঙ্গীয় পুরাতত্ত্ববিৎদিগের শীর্ষ স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মতে সমগ্র বাঙ্গালাই "পাণ্ডববর্জ্জিতদেশ" অর্থাৎ পাণ্ডবদিগের সময়ে আর্য্যগণ বাঙ্গালার উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা দ্বারাও এই মত সমর্থিত হইতেছে।

সৌতিরুবাচ—

গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং কুরুনন্দন।
দদর্শ কামুকীং কান্তঃ পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
তস্যা নিবারিতা যত্নাৎ বলেন বলবান্ স্মরঃ।
অতীব সুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভংসা পুষ্পোদ্যানে মনোরমে।
সদ্যোবভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভঃ।
সপুত্রা স্বামিনো গেহং জগাম ব্রাড়িতা তদা।
স্বামিনং কথয়ামাস যথাদৈবাদি সংকটং।
বিপ্র রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীং।
সরিদ্বভূব যোগেন সা চ গোদাবরী স্মৃতা।
পুত্রং চিকিৎসা শাস্ত্রঞ্জ পাঠয়ামাস যত্নতঃ।
নানা শিল্পঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ স্বয়ং স্ব রবিনন্দন।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত, ব্রহ্ম খণ্ড, ১০ অধ্যায়।

উশনা ঠাকুর বলেনঃ—

নৃপায়াং বিপ্রত শ্চৌর্য্যাৎ সংজাতোয়া ভিসক স্মৃতঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গোপনে ক্ষত্রিয়া রমণীতে যে (অবৈধ) সন্তান উৎপাদন করেন, সেই সন্তানই ভিষক অর্থাৎ বৈদ্য।

এবম্প্রকারে আরও কতকগুলি শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা এই পন্থাবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহি। এই সকল প্রমাণ অবলম্বন করিয়া বৈদ্য বিদ্বেষীগণ, বৈদ্যদিগকে "খচ্চর" "জারজ" ইত্যাদি বিশেষণে সুশোভিত করিয়াছেন।

স্কন্দ পুরাণে বৈদ্যোৎপত্তি বৃত্তান্ত যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত কৌতুকাবহ ও হাস্যজনক বিধায় কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টিরের প্রশ্নোত্তরে মৈত্রেয় বলিয়াছিলেন যে, মহর্ষি গালব একদা কাষ্ঠ ও কুশ আহরণ করিতে বনে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন একটী প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা এক কলসী জল লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। গালব তাহার নিকট জল প্রার্থনা করিলেন। রমণী তাঁহাকে তৃষ্ণায় কাতর ও অবসন্ন দর্শনে পূর্ণ কলসী বারি প্রদান করেন। মুনিপুঙ্গব তদ্দারা স্নান ও পিপাসা শান্তি করত বর প্রদান করিলেন, হে কন্যে! তুমি পুত্রবতী হও। বালিকা বলিল প্রভো! আমি অবিবাহিতা। গালব বলিলেন, "তুমি কে তোমার নাম কি?" সে বলিল "আমি বৈশ্য কন্যা, নাম বীরভদ্রা।'

গালব সেই কন্যাকে লইয়া তাহার পিতৃকুলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। বীরভদ্রার পিতা গালবকে সেই কন্যা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। মহর্ষি তাহাকে জীবন রক্ষিত্রী (সুতরাং মাতৃতুল্যা) বলিয়া বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন। অন্যান্য ঋষিগন গালবের বাক্য শ্রবণে তাহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন এই বৈশ্য কন্যা হইতে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করিবেন। তৎপর ঋষিগণ একটী কুশ পুত্তল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বৈদিক মন্ত্রদ্বারা তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করত বীরভদ্রার ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন, বালিকার ক্রোড় স্পর্শ মাত্র পুত্তলির জীবন সঞ্চার হইল। বেদ মন্ত্রদ্বারা তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এজন্য তিনি বৈদ্য, ও মাতৃকুলে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি অম্বষ্ট, তাঁহার নাম অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি।

এই সকল পৌরাণিক বর্ণনার ঐতিহাসিক মূল্য কি পরিমাণ হইতে পারে পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। প্রকৃত

পক্ষে ধন্বন্তরি দেব-বৈদ্য, সমুদ্র মন্থন কালে ইনি সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, বলিয়া মহাভারতে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের মতে ভগবান ব্রহ্মা ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব ও আয়ুর্ব্বেদ নামক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করিয়া তাহা ভাস্করকে প্রদান করেন। ভগবান সহস্র রশ্মি সেই আয়ু-র্ব্বেদ হইতে সতন্ত্র সংহিতা রচনা করত আয়ুর্ব্বেদসহ স্বীয় শিষ্য ধন্বন্তরি, দিবদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনীনন্দন, নকুল, সহদেব, অর্কি, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ, ও অগস্ত্যকে অধ্যয়ন করান। ইহারা চিকিৎসা বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যদিগের সেই প্রাচীন চিকিৎসক ধন্বন্তরিকে বৈদ্য ও অম্বষ্ট আখ্যা দ্বারা পরিচিত করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যদিগের কুলজি গ্রন্থ লেখকগণ বলেন, ধন্বন্তরি অশ্বিনীকুমারের কন্যা সিদ্ধবিদ্যাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে ধন্বন্তরির তিন পুত্র জন্মে যথা সেন, দাস ও গুপ্ত।

সেনের চারি পুত্র। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার দ্বারা পৃথক পৃথক গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা, ধন্বন্তরি সেন, বৈশ্যানর সেন, শক্তি সেন, আদ্য সেন। ইহাঁদের সন্তানগণ দ্বারা সেন বংশে আরও চারিটী গোত্র বৃদ্ধি হইয়াছে।

দাসের তিন পুত্র! ইহারা প্রথমত তিন গোত্রে বিভক্ত হইয়াছিলেন, যথা, মৌদ্গল্য, শালঙ্কায়ণ ও ভরদ্বাজ। উত্তর কালে দাস বংশে আরও তিনটী গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শাণ্ডিল্য, বশিষ্ট ও বাৎস্য।

গুপ্তের উত্তর পুরুষগণ তিন গোত্রে বিভক্ত হইয়াছেন। যথা, কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি। গুপ্তের ভিন্ন জাতিয় আরও কয়েকটি স্ত্রী ছিলেন। তাহাদেরও কয়েকটী সন্তান হইয়াছিল। সেই সকলের মধ্যে যাঁহাদের মাতামহ দেব তাঁহার, কৃষ্ণাত্রের গোত্রদেব। যাহারা দত্ত বংশীয় কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা মৌদ্গল্য দত্ত। যাহাদিগের মাতামহ বংশধর তাহারা কাশ্যপগোত্র ধর। যাহাদের মাতামহ কুন্-কর তাহারা ভরদ্বাজ গোত্র কর।

দেব ভিন্ন জাতীয়া দুই রমণীর পাণি-গ্রহণ করেন। তাহাদের সন্তানগণ মাতা-মহ বংশের উপাধি প্রাপ্ত হন যথা, ইন্দ্র ও চন্দ্র। এইরূপে দত্তের এক পুত্র জন্মে, ইনি মাতামহ কুলের সোম উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধরের দুই পুত্র, মাতামহ বংশ হইতে নন্দি ও আদিত্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। করের দুই পুত্র মাতুল বংশের উপাধি গ্রহণ করত কুণ্ড ও রক্ষিত পদ্ধতিতে পরি-চিত হন।

এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য গুপ্ত ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ ভিন্ন জাতিয়া যে সকল রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন বংশীয়। যদিচ বঙ্গদেশীয় নবশাখা শ্রেণীর কোন কোন জাতিতেও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি অনাচরণীয় জাতিতে এই সকল পদ্ধতি দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহারা যে বৈদ্যদিগের কোন সংশ্রবে আসিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং ইহা বিশ্বা-সের অনুপযুক্ত। যে সকল স্থান সেন-রাজদিগের অধিকারভুক্ত হয় নাই বঙ্গের সেই সকল অংশে অদ্যাপি কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে, এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি।

যে বঙ্গদেশীয় চিকিৎসাব্যবসায়ী কায়স্থগণ "বৈদ্য" আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিলে পর যে সকল বৈদ্য স্বীয় সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়স্থ বংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সন্তানগণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের গোত্রানুসারে দেখা যাইতেছে যে এক এক বংশের মূলগোত্র ও প্রবর উভয় শ্রেণীতেই অভিন্নভাবে বিদ্যমান আছে। বৈদ্য বংশীয় সেনদিগের মূলগোত্র ধন্বন্তরি; বঙ্গীয় কায়স্থ সেনদিগের মধ্যে এই গোত্র অদ্যাপি দৃষ্টহইয়া থাকে। বৈদ্য দাসের মূলগোত্র মৌদ্গল্য, কায়স্থ কুলজাত মৌদ্গল্য দাস বাঙ্গালায় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় কায়স্থ দত্ত শ্রেণী মধ্যে মৌদ্গল্য শীর্ষ স্থানীয়। বৈদ্য দত্তদিগের মধ্যেও তাহাই। কায়স্থ ও বৈদ্য দেববংশীয়দিগের মধ্যে আলম্যান ও শাণ্ডিল্য গোত্র সমভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ আরও কতকগুলির উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে। বঙ্গীয় কায়স্থদিগের মধ্যে "গুপ্ত" বংশ সর্ব্বাধম, ইহাদের আলম্যান গোত্র। বৈদ্য গুপ্তদিগের মধ্যে এই গোত্র দৃষ্ট হয়না। কিন্তু মহারাষ্ট্র কায়স্থদিগের মধ্যে গুপ্ত নিকৃষ্ট নহে। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে গুপ্তগণ নিতান্ত নিকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হন এজন্য তাহারাই স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিতে সর্ব্ব প্রথম দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

কুলজি অনুসারে বৈদ্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা উত্তম, মধ্যম ও অধম। সেন, দাস ও গুপ্ত, উত্তম। দত্ত, দেব, কর, মধ্যম। ধর, রাজ, সোম, নন্দি, চন্দ্র, কুণ্ড, রক্ষিত, ইন্দ্র, আদিত্য প্রভৃতি অধম। —

ভরত মল্লিক কৃত "বৈদ্যকুল তত্ত্ব' অবলম্বন করিয়া বৈদ্যদিগের গোত্রানুসারে একটী তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১। সেন — ধন্বন্তরি, শক্তি, মৌদ্গল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় ও অঙ্গিরস এই আট গোত্র।

২। দাস—মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, শালঙ্কায়ণ, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ট, ও বাৎস্য প্রভৃতি ছয় গোত্র।

৩। গুপ্ত—কশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণ তিন গোত্র।

৪। দত্ত—মৌদ্গল্য, কৌশিক, ও শাণ্ডিল্য এই চারি গোত্র মূল। এতদ্ব্যতীত আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয় ও বাৎস্য নামক তিনটী গোত্র পশ্চাৎসৃষ্টি হইয়াছে।*

৫। দেব—আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য আলম্যায়ন ইত্যাদি চারিগোত্র।

৬। ধর—কাশ্যপ গোত্রমূলী, দেশান্তরে জামদাগ্ন্যগোত্র ধর থাকার কথা ভরত মল্লিক শ্রুত হইয়াছিলেন।

৭। কুণ্ড—ভরদ্বাজ।

৮। রক্ষিত — কাশ্যপ ও ভরদ্বাজ গোত্র।

৯। কর—কাশ্যপ, বাৎস্য, ও মৌদ্গল্য এই তিন মূল গোত্র পশ্চাৎ করগণ সপ্ত গোত্রে বিভক্ত হইয়াছে।

১০। রাজ—মূলে এক কাশ্যপ গোত্র, কিন্তু পশ্চাৎ আদ্য ও মৌদ্গল্য গোত্র দ্বারা আর দুই ঘর বৃদ্ধি হইয়াছে।

---

* দেশ ভেদে আদ্য গোত্র দত্ত দৃষ্ট হয়।
ভরত মল্লিক

১১। ইন্দ্র—কাশ্যপ গোত্র।

১২। আদিত্য—কাশ্যপ ও কৌশিক গোত্র।

১৩। সোম—শাণ্ডিল্য গোত্র।

১৪। চন্দ্র—কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র।

১৫। নন্দী—ঘৃত কৌশিক গোত্র।

পঞ্চাশদেতে বিখ্যাত স্তস্মাদেষাত্রা ভিষকৃকুলে।

ভরত মল্লিক।

মতান্তরে ত্রয়োদশটী বংশ যথাঃ—সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেব করো ধরঃ। রাজ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ। এষাং বংশা সমুৎপন্না এতৎ পদ্ধতয়ো মতাঃ। অন্য পদ্ধতয়োঽপ্যেবং সন্তি বৈদ্যা ন তে শ্রুতাঃ।

সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম এই আট ঘর রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। নন্দী, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড, রক্ষিত, এই পঞ্চ ঘর বারেন্দ্র বৈদ্য, কিন্তু দাস, দত্ত ও কর এই শ্রেণীতে পশ্চাৎ নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে, প্রথমত সেন দাস ও গুপ্ত দ্বারা বৈদ্য সমাজ গঠিত হয়। তৎপরে দেব দত্ত কর ধর এই চারি বংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তদনন্তর রাজ, সোম, নন্দী, চন্দ্র, কুণ্ড ও রক্ষিত তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া বৈদ্যসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এই সকল ঘটনার বহুকাল পর ইন্দ্র ও আদিত্য বৈদ্য কুলে সমুদিত হইয়াছেন। অদ্যাপি কোন কোন ব্যক্তি কায়স্থের "দাস" আখ্যা দর্শনে সেই শ্রেণী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। কেহ বা এজন্য প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নুতন পদ্ধতি ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কেহ বা আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অন্য এক বংশের শাখা বলিয়া সেই বংশের বংশাবলীর সহিত আপনাদের নব নির্ম্মিত বংশাবলী যোগ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। যে মহাত্মা সমগ্র বাঙ্গালা তন্ন তন্ন করিয়া এই সকল তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে কায়স্থও বৈদ্য বংশ যদিচ একমূল হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথক বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন; এবং ক্যাপিউলেঠ ও মনটেগ বংশের ন্যায় ইহাদের বিদ্বেষ স্রোত পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তথাপি এই দুই বংশের শুক্র শোণিত একত্রিত হইয়া অদ্যাপি বঙ্গীয় কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজে প্রবাহিত হইতেছে।

বৈদ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস নিবন্ধন তিন সমাজে বিভক্ত হইয়াছে। যথা বঙ্গজ, রাঢ়ী ও পঞ্চকোটী। ভরত মল্লিক বারেন্দ্র বৈদ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বারেন্দ্র বৈদ্যদিগের বর্ত্তমান অবস্থা আমরা কিছুই অবগত নহি।

বঙ্গজ বৈদ্যদিগের একটী মাত্র সমাজ যথা, সেনহাটী * সেনহাটী *** যশোহরের

---

* বঙ্গজ বৈদ্যদিগের শীর্ষ স্থানীয় সেনহাটীর সেন ও দাস মহাশয়গণ পূর্ব্বে চন্দনমহাল নামক গ্রামে বাস করিতেন, বহুকাল গত হইল তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ছোটহাটী নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। সেনদিগের পদবি অনুসারে ইহা সেনহাটী নামে পরিচিত হইয়াছে। লালমোহন বাবু প্রকৃত বৃত্তান্ত না জানিয়া লিখিয়াছেন যে বঙ্গজ বৈদ্যের দুই সমাজ যথা, সেনহাটী ও চন্দনমহাল।

অন্তর্গত। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা সপ্তগ্রাম, সাতশৈক ও শ্রীখণ্ড। প্রাচীন সপ্তগ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বৈদ্যগণ সপ্তগ্রাম সমাজ ভুক্ত। কালনা হইতে বর্দ্ধমান ও কাঁটোয়া হইতে পাণ্ডুয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান গুলি সাতশৈক সমাজের অধীন। কাঁটোয়ার উত্তর দিকে শ্রীখণ্ড। পূর্ব্ববঙ্গে সেনহাটী ও পশ্চিমবঙ্গে শ্রীখণ্ডের বৈদ্যগণ বিশেষ সম্মানিত। পঞ্চকোটী সমাজ দুই শাখায় বিভক্ত যথা, সেনভূম (মানভূম) ও বীরভূম।

বৈদ্যের কুল ত্রিবিধ। যথা,—সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ঠ। শক্তি ও ধনন্তরি সেন, মৌদ্গল্য দাস, ও কশ্যপ গুপ্ত ইহারাই, সিদ্ধ। অন্য দশটী পদ্ধতি সাধ্য যথাঃ—

শক্তি কাশ্যপ মৌদ্গল্য ধন্বন্তরি কুলোদ্ভবাঃ।
বৈদ্যাঃ কুলীনাঃ সিদ্ধাঃস্যুঃ তদান্য সাধ্য সংজ্ঞিতাঃ॥
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ সিদ্ধানাং পদ্ধতি স্মৃতা।
শক্তি ধন্বন্তরি সেন, মৌদ্গল্য দাস পদ্ধতিঃ।
কাশ্যপস্ত ভবেদ্‌গুপ্ত ইতি সিদ্ধ নিরূপণঃ॥
বৈশ্বানরো ভরদ্বাজ কৃষ্ণাত্রয়োদঙ্গিরা স্তুতা।
শালঙ্কায়ণ শাণ্ডিল্যো কৌশিকোঽথ বশিষ্ঠকঃ॥
বাৎস্যো গৌতম সাবর্ণ বালমালক এবচ।*
আত্রেয় শ্চতথাদ্যশ্চতথা বিষ্ণু মহর্ষিকঃ।
মার্কণ্ডেয়ো ধ্রুবশ্চৈব সাধ্যানাং গোত্রসংগ্রহঃ।
সোমরাজশ্চন্দ্রনন্দীধরা কুণ্ডশ্চ রক্ষিতঃ।
দত্ত দেব করাঃ সাধোদশ পদ্ধতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

* * *

সিদ্ধং সাধ্যং তথা কষ্ঠং ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে।
সাক্ষাৎ পরম্পরা সাধ্য সম্বন্ধ কুলদূষণং॥
কষ্ঠ শ্রীহট্টদেশীয়ৈঃ সম্বন্ধ স্তু বিগর্হিতঃ।
শ্বিত্রং যথা শরীরস্য তস্মাদ্‌যত্নেন তংত্যজেৎ॥
কবিকণ্ঠহার।

ইহাদিগের মধ্যে আট ঘর মুখ্য কুলীন যথা, দুহি, শিয়াল, বিনায়ক ও গয়িসেন, চায়ু ও পম্বদাস। ত্রিপুর ও কায়ু গুপ্ত। *

দুহিঃশিয়ালঃ শক্তিঃস্যাৎ কাশ্যপৌ ত্রিপুর কায়ুকৌ।
বিনায়াকো গয়িশ্চাপি ধন্বন্তরি কুলাদ্ভুতঃ।
চায়ু পম্বৌচ মৌদ্গল্যৌ গোত্রমেষাং নিরূপিতং॥
কবিকণ্ঠহার।

কিন্তু স্থান ও সম্বন্ধ দোষ প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধবংশও সাধ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত বৈদ্য কুলপঞ্জিকায় আর যে সকল বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে এস্থলে তৎসমস্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করা গেল। মুদ্রিত কিম্বা অমুদ্রিত যে সকল বৈদ্যকুলজি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভরতমল্লিক কৃত "বৈদ্যকুলতত্ত্ব" ও কবিকণ্ঠহার প্রণীত "সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকা" প্রাচীন। তৎপরে রাজনগরের রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পর যে সকল কুলজীগ্রন্থ রচিত হইয়াছে তৎসমস্তে কেবল অম্বষ্ঠ নামের ছড়াছড়ি ও গল্পের বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ পশ্চাৎ উল্লেখ করা যাইবে।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের কৃপায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য আর্য্যবংশীয় মানবগণ সকলেই শূদ্রভাবাপন্ন হইয়া শূদ্র

* আলম্বায়ণ ইতি পাঠান্তর।

* এক্ষণ গুপ্তদিগের কুল লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল বরাহনগরের গুপ্তদিগের সামান্য কুল মাত্র আছে।

শ্রেণীতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপবীত পরিত্যাগ ও একমাস অশৌচ ধারণ প্রভৃতির ব্যবস্থা তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। মুসলমানদিগের সমাগমে কায়স্থদিগের উন্নতি ও ব্রাহ্মণদিগের অবনতি সংশোধিত হয়। সেই সময় তাহারা আপনাদের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত প্রথার বিপরীত-কায়স্থদিগকে দাসবংশজ প্রচারপূর্ব্বক মাসাশৌচ প্রভৃতির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বৈদ্যগণ কায়স্থদিগের একশাখা বলিয়া তাহারাও উপবীত পরিত্যাগপূর্ব্বক মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ ব্যতীত বঙ্গদেশীয় অন্যান্য কায়স্থগণ যেরূপ ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই, বৈদ্যগণও সেইরূপ দাসত্ব স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ ভাবে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সহস্তে আপনাদের কুলজীগ্রন্থ লিখিয়া আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে কিয়ৎপরিমাণে সক্ষম হইয়াছিলেন। কায়স্থগণ এই সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। এইরূপ দীর্ঘকাল বৈদ্যগণ উপবীত হীন অবস্থায় ছিলেন; তৎপর কিরূপে তাহারা পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চদশ দিবস অশৌচ ধারণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিবিধ দুষ্কর্ম্ম দ্বারা রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পাপকর্ম্ম দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করত তাহার কিয়দংশ পুন্যকর্ম্মে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়া তিনি অগ্ন্যাষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন মহারাজ! উপবীতধারী বিশুদ্ধ আর্য্য ব্যতীত ইহাতে অন্যের অধিকার নাই। তৎশ্রবণে রাজবল্লভ বৈদ্যজাতির উৎকর্ষসাধনে মনোনিবেশ করেন। মনু ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যারমণীর গর্ভে অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি ও তাহাদিগকে চিকিৎসা ব্যবসায়ী লিখিয়াছেন। এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগকে অম্বষ্ঠ অবধারণ করা হইল। তৎপরে তাহারা দ্বিজাচার বহিভূর্ত অর্থাৎ শূদ্রাভাবাপন্ন ছিলেন। এজন্য তাহাদিগকে ব্রাত্যাম্বষ্ঠ প্রচারপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতবর্গ হইতে দশলক্ষ টাকা দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছিল।

রাজবল্লভের কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় রাজাবলী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "বাদসাহি দেওয়ান নবাব মহমৎজঙ্গ বড় দাতা ছিলেন, তাঁহার দেওয়ান বৈদ্যরাজা রাজবল্লভ ছিলেন, তিনিও বড় দাতা ছিলেন, তিনি বৈদ্যদিগকে যজ্ঞোপবীত দিলেন, পূর্ব্বে বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত ছিল না।" (রাজাবলি ১১০ পৃষ্ঠা।)

কিঞ্চিদূন একশতাব্দী পূর্ব্বে ডাক্তার বকনন্ লিখিয়া গিয়াছেন যে,

Rajballabh, the grandfather of the present representative, was in very affluent circumstances, and purchased from the Brahmans at a great expense (it is said 10 lakhs of Rupees) the privilage for the medical caste of wearing a thread like the sacred order. "

(Eastern India. Vol. II.615.)

রাজা রাজবল্লভ যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বৈদ্যদিগের জন্য উপবীত গ্রহণের অধিকার ক্রয় করিয়াছিলেন, ইহা বৈদ্যকুলজী লেখকগণও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা বলেন যে পূর্ব্বে তাহাদের যজ্ঞোপবীত ছিল। বৈদ্যবংশীয় মহারাজ

বল্লালসেন দিল্লীর সম্রাট এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষণসেন গৌড়ের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। এই সময় বল্লালসেন এক নীচ-জাতীয় পদ্মিনী-রমণীর প্রণয়ে আশক্ত হন। যুবরাজ লক্ষণ সেন এই সংবাদ শ্রবণ করত পিতাকে, অস্পৃশ্যা রমণী পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। বল্লাল পুত্রের বাক্য অগ্রাহ্য করিলেন। তখন লক্ষণসেন বৈদ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, পিতাকে কুকার্য্য হইতে বিরত করা আমাদের সাধ্যাতীত। সুতরাং জাতি রক্ষার জন্য তাঁহার সংশ্রব ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব। তিনি বাধ্য হইয়া আমাদের সংশ্রব পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই আমাদের জাতি রক্ষা হইবে।

রামজীবন কৃত কুলজীগ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

লক্ষণ বলিল বৈদ্য ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥
লক্ষণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥

এই ঘটনার প্রায় সাত শত বৎসর অন্তে মানবসমাজের ঘৃণার পাত্র নরাধম (কিন্তু বৈদ্যদিগের মতে "বৈদ্যকুলের তিলক") রাজবল্লভ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে পাতি গ্রহণ পূর্ব্বক বৈদ্যজাতির উপবীত ও এক মাসের পরিবর্ত্তে পঞ্চদশ দিবস অশৌচ ধারণের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুন উপবীত।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত॥
তদবধি কতকগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত।
পক্ষমাত্রে পায় শুদ্ধি করে বৈশ্যবৃত্ত॥
সংস্কার দশবিধ লয় পূর্ব্বমত।
তখন পতিত জনে কহে শত শত॥

রামজীবন।

যে কালে মহম্মদ সাহ দিল্লী পালক।
নবাব মহবৎ জঙ্গ * বঙ্গাদি শাসক॥
সাহবৎ জঙ্গ † নামে তস্য ভ্রাতৃপুত্র।
পাদসাহী দেওয়ান মুরশিদাবাদে স্থিত॥
তাহার দেওয়ান রাজবল্লভ সুকৃতি।
সর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ তার মহারাজ খ্যাতি॥
ষোলশত একষষ্টি শকাব্দা অবধি।
সাতাত্তর পর্য্যন্ত তাহার রাজোন্নতি॥
বহুবিধ যজ্ঞ আর স্বজাতি পোষণ।
যথাসাধ্য করে নানা দান বিতরণ॥
দেখে বহুতর বৈদ্য যজ্ঞ সূত্রহীন।
কোন কোন বৈদ্য সদাচারেতে প্রবীণ॥
স্বজাতির ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া রাজন।
পণ্ডিত নিকটে করে পত্রিকা প্রেরণ॥
অগ্নিষ্টোম অত্যাগ্নিষ্টোম যজ্ঞকারী।
মহারাজ রাজবল্লভ দাতা শুদ্ধাচারী॥ ‡
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কটক কাশী ভোজ।
মধুপুর কাঞ্চী মায়া নেপাল কাম্বোজ॥
তৈলঙ্গ মগধপুর গৌর দেবরাষ্ট্র।
কর্ণাট তৈরট্ট খট্ট শ্রীক্ষেত্র সৌরাষ্ট্র॥

---

* আলিবর্দ্দি খাঁ।

† নিওয়াইস মহম্মদ।

‡ অম্বষ্ঠ সম্বাদিকা লেখক গোপাল কৃষ্ণ কবীন্দ্র জীবিত থাকিলে আমরা অদ্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, যে ব্যক্তি প্রভুপত্নী—রাজপত্নী—যবন-পত্নী গমন করিয়াছিল, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যদি সে ব্যক্তি শুদ্ধাচারী হয় তবে পাপাচারী কে?

কামরূপ জনকপুর হস্তিনা দ্রবিড়।
মহারাষ্ট্র কান্যকুব্জ অযোধ্যা দ্রাবিড়।
নবদ্বীপ বিদর্ভ শূরসেন পাশ্চাত্য।
মৎস বর্দ্ধমান চট্টগ্রাম দাক্ষিণাত্য ॥
চন্দ্রদ্বীপ যশোর আর রাজসাহী আদি।
যে যে স্থানে ছিল কোন পণ্ডিত বসতি ॥
পত্র লিখিয়া আনিয়া পণ্ডিত বিপ্রগণ।
পাতি নিয়া করে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ॥

গোপাল কৃষ্ণ।

১। বল্লালসেনের দিল্লীতে রাজত্ব করার সংবাদটী ঐতিহাসিক তত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তির রচিত সম্পূর্ণ মিথ্যাবাক্য।*

২। যে চন্দ্র বংশে জগদ্বিখ্যাত কুরু পাণ্ডব প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন, সেই বংশ হইতে গৌড়াধিপতি সেন রাজশ্রেণীর উৎপত্তি।† সেই ক্ষত্রিয় বংশের উপবীতের সহিত বঙ্গীয় বৈদ্যদিগের উপবীতের কোন সংশ্রব থাকিতে পারে কি না পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

৩। বিদ্বান-বিদ্যোৎসাহী, গুণবান—গুণগ্রাহী রাজা বল্লালসেনের চরিত্রে এক মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগের কারণ নির্দ্দেশ করা হইল। তর্কস্থলে স্বীকার করা হউক এই ঘটনা সত্য, কিন্তু নীচ জাতিয়া হইলেও বল্লালসেন অহিন্দু রমণীর প্রণয়ে আসক্ত হন নাই। কিন্তু বৈদ্য কুলতিলক রাজবল্লভ যবনী গমন করিয়া স্বীয় পতিত কুলের উদ্ধার সাধন করিলেন। কি চমৎকার ব্যবস্থা। পাঠকগণ কিছু বলিবেন না। এই ব্যবস্থার মূল্য এক টাকা দুটাকা নয়, দশ লক্ষ টাকা।

৪। ছয়শত বৎসরের প্রাচীন একখণ্ড তাম্র শাসনে বনমালী কর নামক একব্যক্তিকে "বৈদ্য বংশ প্রদীপ' বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। কবিকণ্ঠহার ও ভরত মল্লিক প্রণীত কুলজী গ্রন্থের নাম "বৈদ্যকুলতত্ব" কিম্বা "বৈদ্যকুল পঞ্জিকা।" আর রাজবল্লভের পরবর্ত্তী রামজীবন, গোপালকৃষ্ণ প্রভৃতি কুলজী লেখকগণ তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থসমূহের "অম্বষ্টচারু চন্দ্রিকা,' "অম্বষ্টসম্বাদিকা' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং ইহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে বঙ্গীয় বৈদ্যদিগের অম্বষ্ট আখ্যা কত আধুনিক।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে মূল তিন প্রকার কায়স্থ আছে, যথা, চন্দ্রসেনী অম্বষ্ঠ ও করণ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ এই তিন শ্রেণী হইতেই উদ্ভূত। ইহার মধ্যে কে চন্দ্রসেনী, কে অম্বষ্ট কে করণ, তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। এমতাবস্থায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ শ্রেণীর চিকিৎসা ব্যবসায়ী—বৈদ্য আখ্যাধারী কতকগুলি লোক অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করা নিতান্তই হাস্য জনক বলিয়া বোধ হয়। উপবীত গ্রহণের অধিকার বঙ্গীয় কায়স্থের থাকিলে বৈদ্যেরও আছে, কায়স্থের না থাকিলে বৈদ্যেরও নাই। আমাদের বিবেচনায় এই অধিকার উভয়েরই আছে।

রাজবল্লভের সময় হইতে যদিচ বৈদ্যদিগের পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, তথাপি অদ্যাবধি সমস্ত বৈদ্য পরিবারের এই নিয়ম প্রচলিত হয় নাই, অদ্যাপি অনেকে এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গীয় কায়স্থ ও বৈদ্য উভয়ই এক বংশসম্ভূত।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

* মৎপ্রণীত সেনরাজগণ।

† ঐ।

সরস্বতী পূজা।

নমঃ দেবি সরস্বতি শ্বেত-পদ্মাসনা,
শত চন্দ্র জ্যোতি ঢালা, শত বিশ্ব রূপে
আলা,
গলায় কমল মালা কমল ভূষণা!
সঞ্জীবনী বীণা কোলে, আলাপে ব্রহ্মাণ্ড
ভোলে
চরণ সরোজ করে দেবে উপাসনা!
মঞ্জরী মুকুলে ফুলে, কোকিল কাকলী তু'লে
আনন্দে ভারত করে বসন্তে বন্দনা,
এ'ত আজ শ্বেতভূজা, নহে সে বাসন্তী পূজা
চন্দনে চর্চ্চিত নহে কুসুমে অর্চ্চনা,
এ'ত নহে ভারতের বসন্ত-বন্দনা!

(১)

নমঃ দেবি সরস্বতি শ্বেত-পদ্মাসনা,
আজ মা নিদাঘে হায়, ভারত পুড়িয়া যায়,
ধূ ধূ করে দ্বেষ হিংসা বিঘ্ন বিড়ম্বনা,
আতঙ্কে অবনী ফাটে, অগ্নি উঠে কাঠে কাঠে
কি বিষম আত্মদ্রোহ আত্ম প্রবঞ্চনা!
নাহি দয়া নাহি মায়া, শান্তির শীতল ছায়া
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড শিরে বর্ষে অগ্নিকণা!
এস এ শ্মশান দেশে, এস দয়াময়ী বেশে
করিব নিদাঘে আজ অগ্নি-উপাসনা,
এস দেবি দয়াময়ি বসন্ত-বাসনা!

(২)

নমঃ দেবি সরস্বতি, তুমি বিনা আর,
পতিত অধম,দেশ হবেনা উদ্ধার!
কপট কুটিল ভণ্ড, ফেঁপেছে ধর্ম্মের ষণ্ড
বেদ কৈল লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড বুঝা ভার!
আত্মঘাতী যদুবংশ, আপনি হইল ধ্বংস
কে জানে অদৃষ্টে কত অভিশাপ তার!
রাখ মা করুণা করি, মহাবিদ্যা শক্তীশ্বরি
এ মহা প্রলয়ে সৃষ্টি রাখ আপনার,
কর দেবি ব্রহ্মবিদ্যা বেদের উদ্ধার!

(৩)

অধম পতিত দেশ কর মা উদ্ধার,
ভূভার হারিণী তুমি, ভারাক্রান্ত আর্য্যভূমি
রাজা প্রজা ধনী দীনে হিংসা অনিবার,
ভিন্নভাব পরস্পরে, অভিন্ন আপন পরে
ঘরে ঘরে অগ্নিশিখা জ্বলিছে তাহার!
সুখ নাই—শান্তি নাই, পুড়িয়া হইল ছাই
সর্ব্বদা শঙ্কিত ভীত চিত্ত সবাকার,
অধম পতিত দেশ কর মা উদ্ধার!

(৪)

রাখ মা ভারতবর্ষ যায় রসাতলে,
বাণিজ্যে নাহি মা মতি, দিন দিন অধোগতি
একটী শ্রীমন্ত আর যায় না সিংহলে!
শুধু যায় কর্ম্মদোষে, অষ্ট্রেলিয়া মরিশশে
আপনা বেচিতে যায় কুলি দলে দলে!
কত যুগ হ'ল পার, সীমা সংখ্যা নাহি তার
গেল কত মাস বর্ষ পল অনুপলে,
কি কব লজ্জায় মরি, ভারত বাণিজ্য তরী
আর না ভাসিল মাগো কালীদহ জলে!
বেচিয়া চুরট পান, অষ্টাদশ কোটি প্রাণ
বাঁচিতে পারে কি—বল কত দিন চলে?
অবাধ বাণিজ্য বাঁধে, ভারত পড়িয়া কাঁদে
লুঠে নিল ধন রত্ন দানবের দলে।
খুলে দেও নাগ পাশ, ঘুচাও এ সর্ব্বনাশ
দয়া কর কালীদহে কামিনী কমলে,
রাখ মা ভারত বর্ষ যায় রসাতলে!

(৫)

গেল শিল্প অধঃপাতে দেশে হাহাকার,
যত যোগী জোলাতাঁতি, পারেনা রাখিতে জাতি

কাড়িয়া হাতের তাঁত নিল মাঞ্চেষ্টার!
মাথায় মারিয়া বাড়ি, হাতুরী লইল কাড়ি
সেফিণ্ডে রজার্স্‌সন্—কাঁদিছে কামার!
দরজী খলিফা যত, রিঙ্গার করিল হত
দিন গেলে এক মুষ্টি অন্ন মেলা ভার!
কাসারি কাচের স্রোতে, ভিক্ষা করে পথে পথে
গৌরাঙ্গ করঙ্গ দিছে হাতে তুলে তার
হাহাকারে কাঁদে যত কামার কুমার!

(৬)

গিয়েছে বাণিজ্য শিল্প—কৃষি যায় যায়!
সামান্য লাঙ্গলে আর, কত শক্তি চষিবার?
তাহাও থাকেনা দেশে—যা কিছু জন্মায়!
গম যব ধান তুলা, পাট তিসি যত গুলা
ভারত ভাসিয়া যে'ত থাকিলে হেথায়!
যত বেটা গাঁটকাটা, বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁটা
চাষার আশার ধন লুঠে নিয়া যায়!
দুর্ভিক্ষে ভারত মরে, হাহাকার ঘরে ঘরে
হায়রে ফেমিন্ ফণ্ড আফগানে যায়!
তুষের আগুন জলে ক্রুশের জ্বালায়!

(৭)

দেশে মাগো ধন রত্ন কিছু নাই আর,
নিয়েছে মুকুট মণি, খুড়িয়া নিয়েছে খনি
শতাধা ভারত বক্ষ করিয়ে বিদার,
দরিদ্র করিল দেশ, ছাইভস্ম অবশেষ
এখন খুঁড়িলে শুধু উঠিছে অঙ্গার,
দেশে মাগো ধন রত্ন কিছু নাই আর!

(৮)

দেশে মাগো ধন রত্ন কিছু নাই আর,
ছলে বলে লুঠে নিল ভারত ভাণ্ডার!
কত টেক্‌স পদে পদে, কত নিল ভাঙ্গ মদে
চারিদিকে বিপদের অকূল পাথার!
বুঝিনা কি ভস্ম ছাই, এ,বি, সি, ডি, কে,
জি, আই,
দিয়ে সে বিলাতী ভেল্কী—শব্দ মাত্র সার,
নিল যাহা ছিল বাকি, বোকারা বুঝিবে বা কি
অক্ষরে অক্ষরে টাকা সংখ্যা নাহি তার,
নিল এ, বি, সি, ডি, মন্ত্রে ভারত ভাণ্ডার!

(৯)

রাখ মা ভারতবর্ষ যায় রসাতল,
দেও শক্তি শক্তীশ্বরি, সাগরে ভাসাই তরী
আবার মথি মা গিয়ে কালীদহ জল!
বিদারি পর্ব্বত বন, করি ভূমি সংকর্ষণ
আকাশ পাতাল ভেদি চালাই লাঙ্গল!
হয়ে বিশ্বকর্ম্মা আজ, করি মা বিশ্বের কাজ
রচি দৈত্যবধ অস্ত্র—মুখে কালানল,
দাসত্ব দারিদ্র্য ক্লেশ, করি ভস্ম অবশেষ
মুছি জননীর চক্ষে চির-অশ্রুজল,
দেও শক্তিময়ী দেবি ভূজে দেও বল!

(১০)

দেও শক্তিময়ি দেবি ভূজে দেও বল,
উদ্যম উৎসাহ আশা, দয়া মায়া ভালবাসা
পরাণ ভরিয়া দেও প্রতিজ্ঞা অটল!
যত্ন চেষ্টা একাগ্রতা, শ্রদ্ধা ভক্তি পবিত্রতা
দেও স্বজাতির দুঃখে দেও চক্ষে জল,
দেও মা স্বদেশ ভক্তি, সত্য ধর্ম্মে আনুরক্তি
দেও সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস প্রবল!
দেও এই ভিক্ষা চাই, দেও স্বার্থ ভুলে যাই
করিব দেশের সেবা দেও বক্ষে বল,
দেও স্বজাতির দুঃখে দেও চক্ষে জল!

(১১)

দেও মা সর্ব্বার্থসিদ্ধ দেও শ্রীচরণ,
লইয়া তোমার নাম, অবিরাম-অবিশ্রাম
করিব দেশের সেবা করিলাম পণ,
ক্ষুদ্র বক্ষে যত ভক্তি, ক্ষুদ্র প্রাণে যত শক্তি
লইয়া সমুদ্রে আজ দিনু সন্তরণ!
স্বদেশ হইল ধ্যান, স্বজাতি হইল প্রাণ
হইল ভারত ভূমি দেহ আত্মা মন,
জীবনে এ মহাব্রত, পালিব মা অবিরত
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন,
দাও মা সর্ব্বার্থসিদ্ধ দেও শ্রীচরণ!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ভারত সমাজ। (দ্বিতীয়)

কেহ কেহ বলেন সাধারণ শিক্ষার (Mass education এর) গুণে কতকগুলি শ্রমজীবী লোক যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া একেবারে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীতে উঠিয়াছে, তাহাতে সাধারণ মধ্যবর্ত্তীদিগের জীবিকা লাভ আরও দুষ্কর হইয়াছে; ইহার প্রমাণ স্বরূপে তাহারা দেখাইতে চাহেন যে, তিন টাকা বেতনে একজন চাকর পাওয়া অসাধ্য, কিন্তু দুই টাকা বেতনে মুহুরি রাখিতে চাহিলে শত শত পাওয়া যায়; এ উক্তি ও প্রমাণ সঙ্গত বলিয়া বোধ করি না, কারণ যদি শ্রমজীবী শ্রেণী হইতে কিছু লোক উপরে উঠিত, তাহা হইলে উচ্চোত্থিত লোকদিগের পরিত্যক্ত ক্ষেত্র সকল আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত; আমরা তাহা দেখিতেছি না, বরঞ্চ ইহা দেখিতেছি যে, পূর্ব্বে যে সকল স্থান নিবিড় জঙ্গলময় ছিল, এক্ষণে সেখানে উত্তম শস্যাদি প্রস্তুত হইতেছে; ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার গোয়ালাদিগের ব্যবসায়েও যথেষ্ট লোক আছে। চাকরের দুষ্প্রাপ্যতা ও মুহুরির সুলভতার কারণ এই যে, প্রথমটীর উপরের অশেষ পথ হইয়াছে। দ্বিতীয়টী মধ্যশ্রেণীর লোক, তাহার উপায়াভাব।

যাহারা ধর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা শ্রমজীবী অভিধেয়; কৃষক, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, ধীবর গোপ এ সকলেই এই শ্রেণীর অন্তঃপাতী। এই শ্রেণী ইংরেজ সমাগমে লাভবান হইয়াছে। অনেকে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, শ্রমজীবিরা দুঃখের তরঙ্গে ভাসিতেছে; তাহাদিগের পেটে ভাত নাই, পরিবার কাপড় নাই, চালে খড় নাই ইত্যাদি; কিন্তু এ সকল উক্তি কেবল অলস-কল্পনা-প্রসূত। যে কোন পল্লীতে যাইয়া চক্ষু মেল, দেখিতে পাইবে শ্রমজীবীরা সুখে আছে, মধ্যবর্ত্তীর অভাবের অবধি নাই। শ্রমজীবীর শ্রম-শক্তিই প্রধান মূলধন; কেহ মৃত্তিকার প্রতি, কেহ কাষ্ঠের প্রতি, কেহ লোহার প্রতি শ্রম প্রয়োগ করিয়া অক্লেশে জীবন যাপন করিতেছে। জমির খাজানা অল্প, যে কোন সামগ্রী জন্মাইতে পারিলে খাজানার দেনা পরিশোধ করিয়া যথেষ্ট মুনাফা থাকে। কারণ ভয়ঙ্কর বিদেশীয় বাণিজ্যের বিস্তারের সহিত পাট, তুলা, আলু, গম, তিসি ইত্যাদি সকল প্রকার উৎপন্নের মূল্যই বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণ ইংরেজ শাসন অন্তর্দ্ধান করিলে যদি দেশীয়েরা এই প্রকারের খরতর বিদেশীয় বাণিজ্য না রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে সমস্ত শস্যের মূল্যের পতনের সঙ্গে শ্রমজীবীর পতন হইবে। কিন্তু এক্ষণ তাহাদিগের জাতিগত কোন অভাব নাই ও হইতে পারে না।

মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষবশতঃ যে লোকক্ষয় হয়, তাহাতে অধিকাংশ শ্রমজীবীকে নষ্ট হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি দুর্ভিক্ষে মধ্যবর্ত্তী লোক না মারা পড়িয়া শ্রমজীবী মারা পড়ে, তবে মধ্যবর্ত্তী অপেক্ষা শ্রমজীবীর অবস্থা কি প্রকারে ভাল হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে দুর্ভিক্ষের মুখ্য কারণ স্থানীয় উৎপত্তির অভাব, গৌণ

কারণ অপর্য্যাপ্ত রপ্তানী, এই দুই কারণ একযোগিতায় ক্রিয়া করে বলিয়া যেখানে উৎপত্তির অভাব হয়, কেবল সেই স্থানেই দুর্ভিক্ষ প্রতীয়মান হয়। ভূমির শস্য শ্রমজীবীর প্রধান অবলম্বন, মধ্যবর্ত্তীর সেই ভূমির কর অবলম্বন; শ্রমজীবী ভূমিতে কিছু পাইল না, তথাপি মধ্যবর্ত্তীকে কর না দিয়া পারে না; মধ্যবর্ত্তী সেই প্রাপ্ত করের কিয়দংশ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ক্ষুধা নিবারণ করিল ও কিয়দংশের দ্বারা নিজের ক্ষুধা থামাইল; শ্রমজীবী কি দিয়া কি করিবে? ঋণ করিয়া গরু বেচিয়া কর দিয়াছে, এক্ষণ আর তাহার উপায় কি? সুতরাং শ্রমজীবীদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখা যায়; কিন্তু ইহা হইতে প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, শ্রমজীবীর দুঃখ দাবানলের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ক্ষয়কারী; কিন্তু মধ্যবর্ত্তীর দুঃখ তুষের আগুণের ন্যায় ক্রম ক্ষয়কারী; শ্রমজীবীর অভাব স্থানিয়, মধ্যবর্ত্তীর অভাব দেশব্যাপী। যদি গবর্ণমেণ্ট রপ্তানিটা একটু কমাইতে পারেন, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের ক্লেশ অপনীত হয়। ইহা করা কিছুই দুষ্কর নহে; আমাদিগের প্রধান খাদ্য চাল ও গম; এই দুই দ্রব্যের রপ্তানির উপর অবাধ বাণিজ্যের (Free trade এর) ধুয়া ছাড়িয়া দিয়া একটা রক্ষণকর (Protective duty) বসাইলে সব ঠিক থাকে।

এরূপ কর বসাইতে হইলে গবর্ণমেণ্ট বলিবেন তাহা হইলে হোমচার্জ্জের টাকা উঠে কি প্রকারে? সত্য বটে হোমচার্জ্জের টাকা উঠিবার বাধা হইবে, কিন্তু আমাদিগকে প্রাণে বধ করিয়া তোমাদিগের ন্যায় ধনী জাতির এরূপ হোমচার্জ্জ লওয়া উচিত কি? যখন নিজের হাতে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে ১৪ চৌদ্দ কোটি টাকা দিতে হইলে আমাদিগকে অনাহারে মরিতে হয়, তখন তুমি হোমচার্জ্জ স্বরূপে আমাদিগের প্রাণ না লইয়া কিছু কম লওনা কেন? চাল গম রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিলে ৮ আট কোটি টাকা ঘরের হানি হয়, কিন্তু যদি একেবারে রপ্তারি না বন্দ করিয়া কেবল মাত্র একটা কর বসাও তাহা হইলে জোর তোমার ৪ কোটি টাকার হানি হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে আমরা সকলে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারি।

ইহা না করিয়া তুমি যে আভ্যন্তরীণ আমদানি রপ্তানির সুবিধা বৃদ্ধি করিতেছ, তাহাতে দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইতে পারে না; ভাব, উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হইল, তথায় তুমি রেলে কিংবা জাহাজে করিয়া চাল পৌছিয়া দিলে, তাহাতে কি হইবে? বাজার একটু নরম হইতে পারে, কিন্তু যাহার দুর্ম্মূল্য দ্রব্যক্রয়ে পয়সা একেবারে ফুরাইয়াছে, সে তখন একটু সস্তা হইলেই বা কিনিবে কি দিয়া; তুমি বিনা সুদে ধার দিলে তাহাই বা সে শোধ করিবে কি প্রকারে? যদি প্রকৃত দুঃখ মোচন করিতে চাও, তবে যাহাতে দুর্ভিক্ষ একেবারে না আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর; সেরূপ করিতে হইলে উপরে যাহা বলিয়াছি, তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির যে মন্ত্রণা তুমি করিয়াছ, উহা সিদ্ধ হইবে না, কারণ সেটা খুড়ির কর্ম্ম নহে; জমিতে সার দেওয়া হইয়া থাকে, গোবর অল্পই পোড়াইয়া থাকি। এক্ষণ যদি তুমি ভূমিতে সার দেওয়ার একটা নুতন বন্দবস্ত করিতে চাও, তাহাতে আবার আমাদিগের একটা ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, যে

দুদিন পরে মরিতাম সে আজই মরিব তোমার বৈজ্ঞানিক লাঙ্গল সেও ব্যয় সাপেক্ষ, সে সকল উদ্ভট্ পরীক্ষায় আমাদিগকে লাগাইওনা; যদি দুর্ভিক্ষ দোষের প্রতিকার করিতে তোমার বাস্তবিকই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে রপ্তানিটা যে প্রকার হয় কমাও। জল জঙ্গল সর্ব্বত্রে চাষ চালাইয়াছি তাহাতেও কুলাইল না; ভদ্রাসন বাড়ী পর্য্যন্ত চষিয়াছি তথাপি বাঁচিবার উপায় হইলনা; এক্ষণ তুমি কৃপা করিয়া একটু আত্মহানি স্বীকার কর।

শ্রমজীবী অপেক্ষা মধ্যাবর্ত্তীর অবস্থা যে অধিক শোচনীয় হইয়াছে তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ছয় টাকা বেতনে একজন চাপরাসী রাখিতে চাও, সুবোধ লিখনক্ষম, কার্য্যনিপুণ পঞ্চাশজন উপস্থিত হইবে, জামিন চাও দিবে; যেথানে পাঠাও সেই খানে যাইবে, কিন্তু সাত টাকা বেতনে একটা মজুর পাইবে না। কেহ হয়ত বলিবেন ৬ টাকার চাপরাসীর অন্য আয় আছে, কিন্তু সে কথা যে স্থলে মিথ্যা সেখানেও লোককে আগ্রহ সহকারে কাজ করিতে দেখিয়াছি, আর তাহার তুল্য একজন কর্ম্মঠ মজুরকে ১০৲ দশ টাকার কমে রাখা যায় না। ১৫৲ টাকা বেতনে একজন এল, এ পাশ করা লোক রাখা যায়; কিন্তু ঐ বেতনে এক জন ভাল কর্ম্মকার, সূত্রধর কিংবা রাজমিস্ত্রী পাওয়া যায় না। একজন শ্রমজীবী এক দিনে দুইশত ঘন ফুট মাটি কাটিয়া ৶৹ ছয় আনা কিংবা ॥৹ আট আনা উপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী এক ব্যক্তি সারাদিন মাথা ঘামাইয়া কাজ করিলেও তত পয়সা উপার্জ্জন হয় না।

এজন্য বলি শ্রমজীবীর অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তীর অবস্থা অতিশয় কষ্টকর হইয়াছে; অদ্যাপি যে মধ্যবর্ত্তীরা পদ রাখিয়া চলিতে পারিতেছে ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা শ্রমজীবী অপেক্ষা অতিশয় মিতব্যয়ী। যদি শ্রমজীবীরা মধ্যবর্ত্তীদিগের ন্যায় মিতব্যয়ী হইত, তাহা হইলে এতদিন কোন্ কালে মধ্যবর্ত্তী থাকটা ভাঙ্গিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত, অথবা মধ্যবর্ত্তীরা শ্রমজীবীদিগের ন্যায় ব্যয়ী হইলেও সেই ফল ফলিত। আয়ের পথ না খুঁজিয়া পাইয়া মধ্যবর্ত্তীরা ব্যয়ের সংক্ষেপের পরাকাষ্ঠা করিয়াছেন, একজোড়া জুতায় দুই বৎসর চালান, ৪ খানা কাপড়ে বৎসর কাটান। কমাইবার আরও যাহা যাহা আছে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

মধ্যবর্ত্তীর এই প্রকার অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য শাসনের বিষম ঘটিকায় এ দেশের পরিবর্ত্ত সকল স্বাভাবিক নিয়মে হইতে পারে নাই। তুমি পৃথিবীর যে কোন দেশে যাও, দেখিতে পাইবে যে খানে মজুরের দর দৈনিক ।৹ চারি আনা, সেখানে কেরাণীর দর ১৲ এক টাকা; কিন্তু এদেশের স্থূল শ্রমের মূল্য যেরূপ দ্রুতবেগে বৃদ্ধি হইয়াছে, সূক্ষ্মশ্রমের দর সেরূপ বৃদ্ধি হয় নাই, তাহার কারণ এ দেশের সূক্ষ্ম-শিল্পের অধিকাংশ কার্য্য ইংলণ্ডে নিষ্পন্ন হয়। এ দেশের সেই সমস্ত সামগ্রী কিনিতে হয়, সুতরাং যে সূক্ষ্মশ্রমের মূল্য এখানে বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইয়াছে ইংলণ্ডের অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের অবাধ বাণিজ্যের চরম ফল এ দেশের মধ্যবর্ত্তীর প্রাণ-ঘাতক হইয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণকার বিচার্য্য বিষয় এই যে মধ্যবর্ত্তীর এ দুঃখের অপনয়ন কি প্রকারে

হইতে পারে? যদি এ দেশের জাতিত্বের গঠন ইংলণ্ডের ন্যায় হইত তাহা হইলে এতদিন অসংখ্য মধ্যবর্ত্তী লোক শ্রেণী-জনিত পদ-মর্য্যাদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রমজীবীর শ্রেণীতে অবতরণ করিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ দেশের সংস্কার পৃথক রকমের, এ দেশে শ্রেণীত্ব ত্যাগ ঘোরতর কলঙ্কের কথা, কাজে কাজেই কতশত লোক ভিক্ষা আশ্রয় করিয়াছে, তথাপি শ্রমজীবীর শ্রেণীতে নাবিতে সম্মত হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন সময়ের আদেশানুসারে মধ্যবর্ত্তীদিগের নাবিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য ছিল; উহারা নাবিলে স্থূলশ্রমের মূল্য এরূপ বর্দ্ধিত হইত না; তাহাদিগের সুন্দর জীবিকা লাভ হইত ও অবশিষ্ট মধ্যবর্ত্তীরা সুখে কালক্ষেপ করিতে পারিত; কিন্তু যাহা হইতে পারে না, তাহা লইয়া আলোচনা করা বৃথা। জাতি সাধারণের রুচি পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা অপমান বোধক কার্য্য করান সম্ভাবনার অতীত; আরও পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, এ সম্ভ্রান্ত মধ্যবর্ত্তী ছত্রভঙ্গ হইলে, সেই সঙ্গে এ দেশের অনেক মহামূল্য ভাবী আশা বিলীন হইয়া যাইবে, সুতরাং এরূপ লোমহর্ষণ পরিবর্ত্তনের অনুমোদন করা কদাচ বিজ্ঞদিগের কর্ত্তব্য হইতে পারে না। তবে এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি?

গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি শ্রমজীবীদিগের প্রতি যতটা আছে, মধ্যবর্ত্তীদিগের প্রতি ততটা নাই; কারণ তাঁহাদিগের বিশ্বাস শ্রমজীবীরা রুষ্ট হইলে রাজ্যবিপ্লব ঘটে; এই গ্রামে শ্রমজীবীরা কষ্ট পাইতেছে শুনিলে গবর্ণমেণ্ট উৎকণ্ঠ হইয়া উঠেন। মধ্যবর্ত্তী তাঁহাদিগের নিকট বৃথা একটা থাক। কিন্তু সত্যসত্যই কি মধ্যবর্ত্তী থাকটা বৃথা? সত্য সত্যই মধ্যবর্ত্তী দেশের অনাবশ্যকীয়? আমি ইহা স্বীকার করিতে পারি না; আমার এই বিশ্বাস একান্ত দৃঢ় যে শ্রমজীবীগণ জাতির জড়দেহ মাত্র এবং মধ্যবর্ত্তীগণ সেই জড়দেহের প্রাণ। দেহ অসুস্থ হইলে মন যেমন অসুস্থ, মন অসুস্থ হইলেও দেহ সেইরূপ অসুস্থ হইয়া থাকে, এজন্য আমার বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকারে মধ্যবর্ত্তীকে মুমূর্ষু দশায় আনয়ন করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন করিতেছেন। গুলি গোলার ভিতর দিয়া বিপ্লবের চিত্র অঙ্কনের ক্ষমতা শ্রমজীবীর কদাচ হইতে পারে না। ফরাসী বিপ্লব যদি কেবল শ্রমজীবীর অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইলে তাহা কদাচ ইতিহাসের পত্রে উঠিতে পাইত না। ক্রুদ্ধ শ্রমজীবী অপেক্ষা ক্রুদ্ধ মধ্যবর্ত্তী বেশি শঙ্কার জিনিষ, কারণ শ্রমজীবী (বিশেষতঃ এদেশের) গভীর কল্পনা ও বিস্তারিত আয়োজনে অসমর্থ, এজন্য আমি বিবেচনা করি, গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তীদিগের প্রতিও সমধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে কোন অনুরোধ করা বৃথা, কারণ অশেষ বিষয়ে দেখিতেছি আমরা তাঁহাদিগের মতিগতি ফিরাইতে অসক্ত, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সকল এ দেশে প্রস্তুত হয় না। পৃথিবীতে এরূপ কোন দেশ নাই যে অবাধ বাণিজ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে; আমরা যে ইংলণ্ডের পক্ষমধ্যে অবস্থিতি করিতেছি, সেখানেও অবাধ বাণিজ্য নাই। আমাদিগের রূপার জিনিস, তামাকের উপর সেখানে রক্ষণ কর আছে।

অতএব এক্ষণ আমাদিগের উচিত, যে প্রকারে পারি ক্রমে ক্রমে সম্ভ্রান্ত শিল্পের

দিকে অগ্রসর হওয়া। সত্য বটে ইম্পোর্ট (Duty) ডিউটী উঠাইয়া দিয়া গবর্ণমেন্ট এ দেশের যান্ত্রিক বস্ত্র বয়নের ঘোরতর বাধা করিয়াছেন, সত্যবটে স্পিরিটের ডিউটী বাড়াইয়া আরকাদি প্রস্তুতের বাধা করিয়াছেন, কিন্তু যতদিন আমরা প্রত্যেক উদ্যমের চেষ্টায় এক একটী বাধা না পাইতেছি, ততদিন চেষ্টা ছাড়িব না, যত রন্ধ্র আছে প্রত্যেক রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া দেখিব, যত ইষ্টক আছে তাহার প্রত্যেক খানি উল্টাইয়া দেখিব।

এত দিন যেরূপ উদাসীনভাবে চলিয়াছ, এক্ষণ আর সেরূপ ভাবে চলিলে দিনপাত হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমরা প্রত্যেক দ্রব্য খরিদ করিবার সময় স্মরণ করা উচিত তাহার আদিম প্রস্তুত কর্ত্তা কে; যাহার প্রস্তুত কর্ত্তা বিদেশী, তাহা ক্রয় করিলে পয়সা নিশ্চয়ই বিদেশীর হাতে যাইবে। ঐ যে ক্ষুদ্র একটী দোকান্দার এক পয়সায় একটী করিয়া দেশলাই বেচিতেছে, ও কাহার প্রতিনিধি তুমি চিনিতে পার? উহার হাতে একটা পয়সা দিলে তাহা কি প্রকারে সাত-সমুদ্র পার হইয়া দেশান্তরে যায় তাহা বুঝিতে পার? একটা পয়সা তুমি তুচ্ছ করিতে পার, কিন্তু তোমার আদর্শে তোমার স্বদেশী পঁচিশ কোটী লোকে যখন একটী পয়সা তুচ্ছ করিবে তখন দেশলাইওয়ালা বিদেশী পাঁচলক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর হইবে: আর এইরূপ তুচ্ছ যদি বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ বার কর তাহা হইলে বিদেশী একটী কুবের, তুমি তেমন ধনী কখনও চক্ষে দেখ নাই। জাপানের লোকেরা বিদেশীর দ্রব্য ক্রয় করে কেবল শিখিবার নিমিত্ত, কিন্তু তুমি একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট, পরকীয় দ্রব্য ক্রয়ের অপ্রবৃত্তি দেবোপম মহাপ্রাণতার লক্ষণ। তোমার সম্মুখে লক্ষ লক্ষ ইংরেজ বাস করিতেছে, কখনও তোমার দোকানের মিষ্টান্ন খায় কি? খায় না কেন? যদিও তাহা খাইত তাহা হইলে তোমাদিগের কত লক্ষ টাকা আয় হইত, কিন্তু বিস্কুটওয়ালা বিদেশীর হানি হইত।

তুমি আত্মহানিকর ক্রয়ে আর উদাসীন থাকিলে নিশ্চয়ই দেশ দেউলিয়া হইয়া যাইবে। শিল্প-শিক্ষার যে আন্দোলন হইতেছে, উহা অবশ্যই বিদেশীয় শিল্প-জাত দ্রব্যের আমদানি নিবারক শিল্প; বিদেশের নিকট আমরা যে সকল বিষয়ের খরিদদার তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বর্ত্তমান শ্রমজীবীদিগকে স্থান চ্যুত করিয়া যদি শিল্প-শিক্ষার পরিচয় দিতে চাহ, তাহা পারিবে না, কারণ আমাদিগের শ্রমজীবীগণ (কর্ম্মকারই হউক আর ছুতারই হউক, আর অন্য কেহই হউক) সকলেই নেংটি পরিয়া শুধু ভাত খাইয়া মাসের উপজীবিকা লাভ করে; তুমি তাহাদিগকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা না করিয়া উচ্চ-শিল্প শেখ, বিদেশীর শিল্পীর রুজি কমাইয়া স্বদেশের অভাব পূরণ কর।

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গ মহিলা। (২য় প্রস্তাব)

বক্সার।

এই সেদিন দিল্লী পান্থশালায় অদ্য-আবার বক্সার,—ডুম্‌রান মহারাজ ভবনে আমরা অতিথি। কুসুম কানন পরিশোভিত পুণ্য-প্রবাহিনী ভাগীরথীর উপকূলে মহারাজের রমণীয় উদ্যান গৃহে সাব্‌ডিভিসান আফিসার বাস করেন। সরকার বাহাদুর অতি সামান্য অর্থে তাহা ভাড়া লইয়াছেন। এমন সুন্দর সমুদায়, ঠিক যেন প্রকৃতির স্বপ্নরাজ্য। বাঙ্গালার সহিত তাহার আকৃতি-গত সাদৃশ্য দেখিয়া আমার আরও ভাল লাগিত। লতা, পল্লবে, ফুলে ফলে এবং অবিরাম নিনাদিত জাহ্নবীর সঙ্গীত তরঙ্গ ভঙ্গে ও দীর্ঘ তরুরাজির নবপল্লবিত শাখায় শাখায় বালকণ্ঠ পাপিয়ার মধুর ললিত তানে কেমন এক অভিনব সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাস চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে। সে অপার্থিব শোভার কণিকা মাত্র অনুভবে কল্পনা-প্রিয় হৃদয় এমনি মুগ্ধ হইয়া যায়, যে সবটা একত্র উপভোগ করা হয় না। প্রিয়জনের সৌন্দর্য্য যেমন এক সঙ্গে নয়ন ভরিয়া দেখিবার সৌভাগ্য কখনও প্রেমিকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, সে রূপের সে অঙ্গে যখন নেত্র নিপতিত হয়, মোহিত মন তাহাতেই বিভোর হইয়া যায়, প্রত্যেক অবয়বের নূতন পৃথক সত্ত্বা ভোগ করিবার শক্তি থাকে না, এও যেন তেমনি।

দেখিতে না দেখিতে কোথায় দিয়া সে সপ্তাহ চলিয়া গেল, তাহা ত অনুমানও করিতে পারিলাম না। সে স্বপ্ন মাখা সাত দিন আমার নিকট সুখের এক মুহূর্ত্ত এখন। জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর অবসানে নিদ্রাভঙ্গে শুইয়াই মুক্ত বাতায়ন পথে পতিত-পাবনী জাহ্নবী দর্শনে যেন জীবন সার্থক হইত। আবার প্রবাস-সন্তাপহারী ও নিত্য বাঞ্ছিত সেই প্রিয়পাত্র, প্রত্যহ প্রভাতে হাস্যসখী প্রিয়তমা সখীর ন্যায় আমাকে আলিঙ্গন করিত, স্বদেশের হৃদয়ময় স্নেহ বিদেশের একাকতাকেও সুখময় করিত এবং প্রতি সমগ্র দিনের মাঙ্গলিক পূর্ব্বসূচনা বলিয়া আমার নিকট প্রতীত হইত।

দিবাভাগে গবাক্ষ দ্বারে অনন্যমনে দাঁড়াইয়া সেই মধ্যাহ্নের তীব্র রবিকরে ক্ষেপনী-বিক্ষিপ্ত কল্লোলিনী জাহ্নবী সলিলে রজত-রশ্মির লহরী লীলায় জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কোথায় ভাসিয়া যাইত। সে ঐন্দ্রজালিক অপূর্ব্ব দৃশ্য, সে কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং পবিত্রতার উচ্ছ্বসিত ভাব কেবল ভাগীরথীর পবিত্র প্রাণেই সম্ভবে। যখন দিনমণির অস্তাচল গমনে, সিন্দুর-শোভায় চারিদিক লোহিত হাস্যে চিত্রিত হইত, তখন গঙ্গাতীরে মলয়ানিল সেবনে, স্বাস্থ্যের পূর্ণতা লাভে জীবনের অতীত বৎসর যেন পুনর্লব্ধ হইত। সন্ধ্যা সমাগমে, নিদাঘালয়ে (Summer Home) চিন্তার বিশ্রামে, "জ্যোৎস্নার শ্বেত মোহে,"—আশা, স্বপ্নময় সুখানুভাবে, অজ্ঞাতে কোথায়

দিয়া যে বিভাবরী দর্শন দিত তাহা আমি ত স্মরণ করিতে পারি না।

গভীর নিশীথে সেই নিকেতন প্রান্তে দাঁড়াইয়া চন্দ্রকর-বিভাসিত জাহ্নবীর উথলিত নৈশশোভা সন্দর্শনে এবং পরপারের শিব মন্দির তটলগ্ন তরণী নিচয়ের নাবিকগণের সরল সঙ্গীত (লক্ষ্ণৌ ঠুংরি) শ্রবণে, আমাতে আমি কতবার হারাইয়া গিয়াছি। যে দেশে এমন মহিমাময়ী ভাগীরথী নিত্য প্রবাহিতা, শির উপরি এই শশি-মাখা তারকিত অনন্ত নভোমণ্ডল আশে পাশে প্রকৃতির এত মুক্ত সৌন্দর্য্য রাশি এবং প্রত্যেক ভাবুক প্রাণ তাহা উপভোগ করিতে চির সৌভাগ্যশালী, সে দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া কেন অদ্য বিলাপ করিব। কি জানি অন্যত্র স্বুবর্ণ সিংহাসনে রাজ রাজেশ্বর হওয়া অপেক্ষা গঙ্গাতীরে পর্ণকুটীরবাসী হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

জেলা না হইয়াও বক্সার একটী ক্ষুদ্র সহর। রাজপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রস্তরময়। পূর্ব্বকালের সৈনিক নিবাস বাঙ্গালো গুলি অতি পরিপাটী, আধুনিক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ তাহাতেই বাস করেন. ভাড়া অতি সুলভ। নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিছুরই অভাব নাই। স্কুল, ডাকঘর ও রেলগাড়ী প্রভৃতি সভ্যতার অংশরূপে যাহা যাহা মনুষ্যের প্রয়োজনীয়, তাহা সব আছে। দুইজন হাকিম ও একজন মুন্সেফ এই সাবডিভিশনের বিচার কার্য্যে নিয়োজিত থাকেন।

এখানকার প্রসিদ্ধ সরকারী অশ্বশালে বহুবিধ অশ্ব সুশিক্ষিত করিয়া নানাদিকে প্রেরিত হইয়া থাকে। এমন বৃহৎ অশ্বালয় ভারতবর্ষে আর নাই। দস্যুভয় এখনও এখানে বিলক্ষণ আছে। ভোজপুরীরা প্রায় অধিকাংশ ডাকাত। কোন একজন বড় ঘরানা নাকি গোপনে তাহাদিগের সহায়তাও করেন। ব্রিটিশ সুশাসনের অধীনেও প্রসিদ্ধ ডাকাত তাঁতিয়া ভিলের ন্যায় সুদক্ষ ডিটেক্টিভ পুলিসের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন কেহ কেহ এইরূপ মনে করে।

শ্রীনীহারিকা দেবী।

মোমবাতি।

আরোব্য উপন্যাসে আলাউদ্দিনের আখ্যায়িকা বোধ হয় সকলেই পড়িয়াছেন। সামান্য দরিদ্রের সন্তান হইয়া ঘটনাস্রোতে পড়িয়া কেমন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজাধিরাজ অপেক্ষা পরম শক্তিশালী হইয়াছিল তাহা পাঠকেরা অবগত আছেন। তাহার অধিকারে একটী অসামান্য মোমবাতি ছিল তাহাই তাহাকে অসাধ্য সাধনে সক্ষম করিত, তাহার ক্ষুধার সময় চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি রাজভোগ আজ্ঞা মাত্রেই আসিয়া উপস্থিত হইত। পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার যাহা পৃথিবীর অধিপতি কাহারও নয়ন গোচর হয় নাই, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে আলাউদ্দিনের পরিধানার্থে প্রস্তুত থাকিত।

বিলাসীরা যে সকল সামগ্রী কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহা আলাউদ্দিনের সেবার জন্য সর্ব্বদা উপস্থিত। রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণার্থে মণিমুক্তা রজত কাঞ্চন প্রভৃতি অমূল্য উপঢৌকন নিমেষের মধ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। এক রজনীযোগে অপূর্ব্ব রাজ-প্রসাদ নির্ম্মাণ সেই মোমবাতির আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয়। আলাউদ্দিন যত দিন মোমবাতির অধিকারী ছিলেন ততদিন তাহার গৃহে চঞ্চলা লক্ষ্মীও স্থির ছিলেন এবং সর্ব্ব সিদ্ধ দাতা গণেশও তাহার সেবার্থে প্রাণপণে নিযুক্ত ছিলেন। আলা-উদ্দিন এই মোমবাতি হারাইয়া কি দুর্দ্দশায় না পতিত হইয়াছিল তাহাও সকলে অবগত আছেন। ইহা ত উপন্যাসের কথা, ইহার সহিত ধনীর ঘরে এবং কখন কখন আমা-দের ঘরে যে মোমবাতি জ্বলে তাহার কি কোন সৌসাদৃশ্য আছে? এ মোমবাতির কি কোন ক্ষমতা আছে? রূপে গুণে কাহার সহিত ইহার তুলনা দিব? সমুদ্র পার হইতে যে শ্বেতকায় প্রতিভাশালী বীর্য্যবান পুরুষ ভারতবর্ষে বণিক বেশে আসিয়া অবস্থা চক্রে পড়িয়া আজ সমগ্র ভারতে দুই কোটী প্রজার উপর আধিপত্য করিতেছে, উহার সৌন্দর্য্যের সহিত কি ইহার তুলনা হয়, অথবা সুনীল নভোমণ্ডলের কলধৌত জ্যোৎস্নায় প্রস্রবণ যে নিশানাথ, উহার প্রফুল্ল মুখের সহিত কি ইহার তুলনা হয়! ইহাদের উভয়ের শরীরে কলঙ্কের চিহ্ন আছে কিন্তু এই মোমবাতিকে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। শক্তিতে ইহা কোটী কোটী শ্বেতাঙ্গদিগকে এক মুহূর্ত্তে বিনষ্ট করিতে পারে এবং উপকারে চন্দ্রের অপেক্ষা হীন নহে। ইহার জন্ম জীব শরীর হইতে হইয়াছে, মধুমক্ষিকা ইহা উৎপন্নের মূলীভূত কারণ; অন্য প্রাণীর শরীরস্থ মেদ হইতেও ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ যে তুষার বেষ্টিত তৃণশূন্য দ্বীপ মধ্যে লাপল্যাণ্ড বাসীরা বাস করিতেছে, উহারা বৎসরের মধ্যে অনেক দিনই সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না, উহাদের ইহা একমাত্র সম্বল। ইহার মধ্যে যে প্রবল শক্তি নিদ্রিত ভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহা সূর্য্যের ন্যায় উহাদিগকে আলোক ও উত্তাপ দিয়া থাকে। এই মেদই উহাদের একমাত্র খাদ্য; ইহাই উহা-দের পরিধেয়। পরিধেয় শব্দ ব্যবহার করাতে অনেকে হয় ত ভাল করে বুঝিতে পারিতেছেন না। পরিধেয়ও আমাদের এক প্রকার খাদ্য; খাদ্যের নূন্যতা হইলে পরিধেয়ের দ্বারা উহা কতক পরিমাণে পূর্ণ হইতে পারে। খাদ্যের উদ্দেশ্য শরীরের জীর্ণ সংস্কার করা ও উত্তাপ রক্ষা করা এবং অপূর্ণ বয়স্কদের বৃদ্ধি সাধন করা। যেখানে পরিধেয় অল্প সেই খানেই মেদময় বা শ্বেত-সারময় খাদ্যের অধিক প্রয়োজন হয়। দুগ্ধের মেদময় পদার্থ ভিন্ন শিশুরা উত্তাপ উৎপাদক অন্য মেদময় বা শ্বেতসার পদার্থ পায় না, সেই জন্যই শিশুদের গাত্র-বস্ত্রের অধিক প্রয়োজন। বহির্জগতে মেদ যেমন অগ্নি সংযোগে বায়ুর সাহায্যে জ্বলিয়া আলোক ও উত্তাপ দেয়, সেইরূপ উহা আমাদের শোণিতে প্রবিষ্ট হইয়া যখন বায়ুকোষে নীত হয় তখন অম্লজনের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে উত্তাপ শক্তি দিয়া থাকে।

ইহার রাসায়নিক উপাদানে আমরা অঙ্গার উদজন ও অম্লজন দেখিতে পাই। কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার উদজন ও অম্লজনের

সহিত রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব শ্বেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই মোমবাতি যখন জ্বলিতে থাকে তখন একটী আশ্চর্য্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। অগ্নি শিখার উত্তাপ প্রভাবে ইহার কঠিন দেহ গলিতে থাকে। সলিতার চারিদিকে একটী খাদ হইয়া বাটী আকারে পরিণত হয়। উত্তপ্ত তরল মেদ বা মোম কৈশিকাকর্ষণ শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সলিতার উপরে উঠিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়। যদি বাতিটী ফু দিয়া নিবাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উর্দ্ধে বাষ্প উত্থিত হইতে দেখা যায়। সলিতা স্পর্শ না করিয়া যদি একটী জ্বলন্ত কাগজ ঐ বাষ্পের উপর ধরা যায় তাহা হইলেও বাতিটী পুনরায় জ্বলিয়া উঠে ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে মেদ বা মোমের বাষ্পই প্রকৃতপক্ষে জ্বলিয়া থাকে। প্রজ্বলিত মোমবাতির শিখা দেখিতে গোলাকার, উপরাংশ সূক্ষ্ম সূচিকা অগ্রবৎ। শিখার চারিদিকের বহির্ভাগই জ্বলিয়া আলোক দেয়, মধ্য ভাগে মেদ বা মোমের উত্তপ্ত বাষ্প থাকে। যখন শিখা প্রকৃতরূপে জ্বলিয়া থাকে তখন বহির্দ্দেশস্থিত বায়ু মধ্য দেশস্থ বাষ্পে যায় না এবং মধ্য দেশস্থ বাষ্প শিখায় বহির্দ্দেশস্থ বায়ুর সহিত মিশিতে পারে না। যখন প্রচুর পরিমাণে বায়ু না থাকে তখন উহা নির্ব্বাপিত হয় অথবা ভাল করিয়া জ্বলে না। এই সময়ে আমরা অধিক পরিমাণে ধুম নির্গত হইতে দেখিতে পাই; মধ্য স্থলের বাষ্প কিয়ৎ পরিমাণে বহির্দ্দেশে আসিয়া থাকে, আমরা উন্মুক্ত কেরাসিনের বাতি জ্বালিবার সময় যে অধিক পরিমাণে ধূম নির্গত হইতে দেখিতে পাই তাহার কারণ যে পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে সে পরিমাণে বায়ু পাওয়া যায় না। এই ধুমে আঙ্গারের অণু সকল প্রচুর পরিমাণে থাকে। মোমবাতির শিখার বহির্দ্দেশে অধিক উত্তাপ, এই উত্তপ্ত স্থানেই মেদ-বাষ্প হইতে আঙ্গারের অণু পরমাণু সকল পৃথক পৃথক হইয়া যায় এবং পৃথক হইবামাত্রই উহা জ্বলিতে থাকে। কঠিন পদার্থের পরমাণুই শিখার উজ্জ্বলতা প্রদান করে; সেই জন উদজন শিখায় স্বভাবত উজ্জ্বলতা নাই কিন্তু কোন কঠিন পদার্থ ইহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অমনি শিখার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে, বাতি জ্বলিয়া প্রধানত তিনটী সামগ্রী উৎপন্ন করে। প্রথমত আমরা ঘরে যে ঝুল দেখি তাহাতে ইহার কিয়দংশ থাকে, দ্বিতীয়ত ইহার উদজন উপাদানটী বায়ুর অম্লজনের সহিত রাসায়নিক সংযোগে মিশিয়া জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। তৃতীয়ত ইহার আঙ্গার উপাদানটী বায়ুর অম্লজানের সহিত মিশিয়া কারবোনিক এসিড বা দ্রাম্ল আঙ্গার উৎপন্ন করে।

মোম বাতি জ্বলিয়া কি উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। উহার লোকোপকার কি নিঃস্বার্থ! কেমন তিল তিল করিয়া পুড়িয়া আমাদিগকে আলোক ও উত্তাপ দিতেছে। আমরা বুদ্ধি সম্পন্ন স্বার্থপর জীব আমাদের অহঙ্কারের সীমা নাই, আমরা কেন উহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব? আমাদের শরীরে একটুও আঁচড় লাগিবে না অথচ লোকে আমাদিগকে পরোপকারী বলিয়া সুখ্যাতি করিবে ইহাই আমাদের চেষ্টা। ইহা যে আমাদের বিষম ভ্রম তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, তাই মনুষ্য সমাজের এত দুর্দ্দশা। কিন্তু কীট পতঙ্গ সকল যাহাদিগকে আমরা

গণনার মধ্যেও আনি না, তাহারা আমাদের অপেক্ষা নিঃস্বার্থ ও বুদ্ধিমান, তাহারা এই মোমবাতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছে। ঐ দেখ শত শত পতঙ্গ বলিতেছে "একটী সামান্য মোমবাতি অচেতন হইয়া লোক-হিতার্থে নিজকে বিসর্জ্জন দিতেছে আমরা কেন না তবে পরহিতের আত্মোৎসর্গ করিয়া আলোক ও উত্তাপ বৃদ্ধি করি এই বলিয়া অবাধে ঐ প্রজ্জ্বলিত শিখায় ঝাপ দিতেছে।

তিল তিল করিয়া ঐ মোমবাতির ন্যায় পুড়িতে না পারিলে আমাদের কিছুই হইবে না, জীবন না দিলে জীবন পাইব না। ঐ যে মোমবাতি জীবন বিসর্জ্জন দিল উহা কি জীবন হারাইল না উহা অন্য প্রকার বায়ুবীয় জীবন পাইল। ঐ আঙ্গারিকাম্ল এবং জলীয় বাষ্প উদ্ভিদ শরীরে প্রবৃষ্ট হইয়া অবশেষে উদ্ভিদ হইতে প্রাণী শরীরের অংশ হইল। পৃথিবীতে যখন চেতন অচেতন উদ্ভিদ কিছুই মরে না তখন আমরা পরোপকারার্থে প্রাণ দিতে এত ভীত হই কেন। আমরা চিন্তা করি না একবার ভাবি না যে আমরা কেন আছি। যদি এ জীবনের আদি অন্ত একবার বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখি, কত রোগ কত শোক তাপ দুঃখ কষ্ট নিরাশা এবং কত অভাব সহ্য করিতে হয় তাহা হইলে অনেকে হয়ত জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। বাস্তবিক যদি এ জীবনের কোন আকর্ষণ থাকে তাহা সেই দেবদেব মহাপুরুষের সহিত সহবাস আর পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করা। যাহারা এই দুই কার্য্যে প্রাণ দিতে পারেন তিল তিল করিয়া পুড়িয়া জগতে আলোক ও উত্তাপ দিতে পারেন তাহারাই এ জীবনের ব্যবহার বুঝিয়াছেন। যে মহাবীর প্রজ্বলিত পোতের হাল ধরিয়াছিলেন, যিনি পোতস্থিত যাত্রিদের রক্ষার্থে নিজের দেহ পুড়াইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তিনি ধন্য, তাঁহাকে নমস্কার। আর সেই রাজা ঔশীনর প্রাণভয়ে ভীত কপোতরূপী অগ্নির প্রাণরক্ষার্থে শ্যেনরূপী ইন্দ্রকে যে নিজ শরীরের মাংস তিল তিল করিয়া কাটিয়া দিয়াছিলেন, তিনিও ধন্য, তাঁহাকে নমস্কার। যদিও ইহা আখ্যায়িকা তথাচ রাজা যে পরোপকারে কুণ্ঠিত হইতেন না তাহা কে অস্বীকার করিবে।

"কাল চামড়ার অনেক দোষ" আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি ও শুনিয়া থাকি। কয়লাও কাল মোমবাতির সাদা শরীরে মিশিয়াছে। উহা পুড়িয়াই আলো দিতেছে। আমাদিগকে "ব্ল্যাকনিগার" বলিয়া অনেক শ্বেতকায় পুরুষেরা ঘৃণা করেন। ঘৃণারও কারণ আছে, আমরা পুড়ে মাটী হইতেছি, আমরা যদি কয়লার ন্যায় পুড়িতে পারিতাম, এবং পুড়িয়া বিশ্বসংসারে আলোক ও উত্তাপ দিতাম, তাহা হইলে আজ যাঁহারা ঘৃণা করিতেছেন, তাঁহারাও আমাদের আদর করিয়া গৃহে লইয়া রাখিতেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

বিধবা বিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আচার্য্য আবার বলিলেন, এক ব্যবস্থা সকলের পক্ষে সমানরূপ খাটে না। কত পুরুষ বিবাহ না করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করত ভগবানের আরাধনায় জীবন যাপন করে। রমণীদের যদি বিবাহ না দিয়া অধিক বয়স পর্য্যন্ত রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বিবাহ না করিতে পারে। পাশ্চাত্য প্রদেশে, মিস নাইটিনগেল প্রভৃতি কত উচ্চমনা রমণী বিবাহ না করিয়া পরোপকার সাধনে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। বুদ্ধদেব তাঁহার মনের বেগ ধারণ করিতে না পারাতে রাজ্যসুখ ত্যাগ করত সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইলেন। চৈতন্যদেব পণ্ডিতদিগের চূড়ামণি হইয়াও অতুল যশঃ তুচ্ছ করত সাংসারিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। আবার জনক রাজা তাঁহার রাজকার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও বৈরাগী ছিলেন। পার্থিব সুখ অপবিত্র নহে—সংসারও অসার নহে। তবে প্রকৃতি অনুসারে নানালোকে নানাভাবে তাহা দেখিয়া থাকে। সাধু হাফেজ একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া রোদন করত বলিয়াছিলেন, আহা যে মহাপুরুষ এই রমণী-রত্নটীকে সৃজন করিয়াছেন, না জানি তিনি কত সুন্দর! আবার চৈতন্যদেব নারীকে দেখিলেই পলায়ন করিতেন। কোন কোন সাধু পুরুষ দারপরিগ্রহ করেন নাই, আবার কত লোক সস্ত্রীক ধর্ম্মালোচনা করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। সাংসারিক ব্যাপার সকল ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। যাঁহার ধর্ম্মের দিকে মতি আছে, তিনি বিষয় কোলাহলের মধ্যেই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। কেহ উপাসনা করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একটী শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিল। তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক হইলে ইহাতে বিরক্ত হইতে পারেন না। এই রোদন ধ্বনি শুনিবামাত্র তাঁহার মনে ভগবানের পালনীয় শক্তির ভাব উদিত হওয়াতে তাঁহার উপাসনা আরো অধিক ফলপ্রদ হইবে। তিনি মনোমধ্যে এই প্রকার আলোচনা করিবেন—আহা কি অনুপম কৌশলে এই শিশুটী সৃজিত হইয়াছে! কি সামান্য উপকরণেই এ জীবটী উদ্ভূত হইল! জরায়ু মধ্যে কি আশ্চর্য্য কৌশলেই জীবন ধারণ করিয়াছিল, আর ভূমিষ্ট হইয়া মাতৃস্তন নিঃসৃত সুধা পান করিয়া কেমন জীবন ধারণ করিতেছে! আহা তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই, রোদনই তাহার ক্ষুধা জানাইবার উপায়। শিশুটীর দন্ত নাই, সে কঠিন দ্রব্য খাইতে অক্ষম, এই জন্য বিধাতা শিশুটীর জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতার বক্ষস্থলে

সুধাপূর্ণ একটী ভাণ্ডার সৃজন করিলেন! ধন্য তিনি, ধন্য তাঁহার করুণা! কেহ ময়দানে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, কতক গুলি পল্লব পড়িয়া আছে। তিনি প্রেমিক হইলে সেই সামান্য তৃণের মধ্যে বিধাতার অপার করুণা অনুভব করিয়া অবাক্ হইবেন। জীব সকল এই ধরাধামে উদ্ভূত হইয়া জীবন ধারণ করিবে, এই বিবেচনা করিয়া সেই মহাপুরুষ কত পূর্ব্বে এই সামান্য তৃণের মধ্যে শস্যের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার সামান্য করুণার চিহ্ন! এইরূপে যে পদার্থ দেখি, তাহাতেই ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিতৃপ্ত হই। কেবল পদার্থ কেন? মনের বৃত্তিসকলও তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। যে কামরিপু প্রবল হইলে মনুষ্যকে পশুরূপে পরিণত করে, সেই রিপুর পরিমিত ব্যবহার এই প্রকাণ্ড জীব রাজ্য রক্ষণের একটী উপায় হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের সম্মিলনে এই সৃষ্টির ব্যাপার ধারাবাহিক চলিতেছে। সুতরাং বিবাহ সম্পর্কীয় ব্যাপার সকল অপবিত্র নহে। যিনি সংসারে থাকিয়া সহধর্ম্মিণীর সহিত ধর্ম্মালোচনায় জীবন যাপন করেন, ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছেন ভাবিয়া সকল বৈষয়িক কার্য্য সমাধা করেন, এবং সকলের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করেন, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যে তাহা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, এ কথা বলা যাইতে পারে না। বিধবা রমণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া যে তিনি পতিপরায়ণা ধার্ম্মিকা সধবা রমণী অপেক্ষা পুণ্যবতী, এরূপ নহে। বিপত্নিক পুরুষ পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবেন বলিয়াই যে তিনি অন্যায় করিলেন, ... আবার বিধবা নারী কাহাকে ... বরণ করিলে তিনি যে অপবিত্রা হইলেন, তাহাও নহে। বিধবা রমণীগণ তাঁহাদের সৎকার্য্যের দ্বারা যেমন আমাদের সমাজকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, পতিব্রতা সতীও কি সেইরূপ কার্য্যের দ্বারা নারীকুলের গৌরব বৃদ্ধি করেন না? যে বিধবা নারী বিবেচনা করেন যে, যে পতির সহিত একবার আধ্যাত্মিক সম্মিলনে মিলিতা হইয়াছিলেন তিনিই তাঁহার একমাত্র স্বামী, তাঁহাকে হারাইয়া তিনি কখন অপর পুরুষকে বরণ করিতে পারেন না, এবং এই প্রকার ভাব অন্তরে পোষণ করত যিনি সেই পরলোকগত স্বামীর ধ্যান করেন এবং তাঁহার সহিত পরকালে সম্মি[illegible]র প্রতীক্ষা করেন, তিনিই প্রকৃত বিধবা। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। তিনিই আদর্শ বিধবা রমণী। তাঁহাকে এ উচ্চ আসন হইতে যিনি নামাইতে চেষ্টা পান, তিনি অতি গর্হিত কার্য্য করেন। যে সকল বিধবা রমণী তাঁহাদের মনকে সংযত করিয়া অতি পবিত্রভাবে জীবন্ কাটাইতেছেন, অধিক বয়স্কা হউন কিম্বা অল্পবয়স্কা হউন, তাঁহাদিগকে লওয়াইয়া বিবাহ সূত্রে বন্ধন করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত নহে। আবার, বিধবা হইলেন বলিয়াই যে রমণী মাত্রকেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে, শিশু বিধবাকেও এই কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইবে, পতি মর্য্যাদা না বুঝুন, পার্থিব সুখ ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল থাকুক, তথাপি সকল সুখ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, এবং পত্যন্তর গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে মহা পাপ, ইহা বিচার-সঙ্গত হইতে পারে না।

শাস্ত্রের উপদেশ এই যে কন্যা যত দিন পতি মর্য্যাদা বুঝিতে না পারে এবং ধর্ম্ম শাসন অজ্ঞাত থাকে, পিতার উচিত যে ততদিন তাহার বিবাহ না দেন। এই উপদেশ লঙ্ঘন করাতে যদ্যপি কোন বালিকা বিধবা হয়েন, তাহা হইলে এই শাসন বাক্য অবহেলা করিবার জন্য সেই নির্দ্দোষী শিশু কেন ক্লেশের একশেষ ভোগ করিবে—কেন সে অন্যান্য বালিকার ন্যায় আমোদ প্রমোদ না করিবে—কেন সে পুনরায় পরিণয় সূত্রে বদ্ধ না হইবে? এই শাস্ত্রীয় উপদেশটী সুপ্রমাণ করিতেছে যে, যাহাতে কন্যা পতি মর্য্যাদা বুঝিতে পারে এবং ধর্ম্মের শাসন অবগত হয়, তৎপক্ষে পিতার যত্নবান হওয়া উচিত। প্রাচীনকালে যেমন পুরুষের পক্ষে গুরুগৃহে বাস করত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার নিয়ম ছিল, তেমনি রমণীগণও পিতামাতা কর্ত্তৃক উপদেশ লাভ করত তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন। এইরূপে জ্ঞানলাভ করিবার পর, কি যুবক কি যুবতী, পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হওয়া উচিত কি না, তাহা তাঁহারা আপনারাই স্থির করিতেন। কত পুরুষ সংসার আশ্রম গ্রহণ না করিয়া বৈরাগী হইতেন, আবার কত নারী বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মবাদিনীরূপে ভগবানের ধ্যান সাধনায় জীবন যাপন করিতেন। এই উত্তম নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে বলিয়াই ত বর্ত্তমান সময়ে এত অত্যাচার দেখা যাইতেছে। এই জন্যই ত শিশু বিধবাদের ক্লেশ দেখিয়া আমাদিগকে ব্যথিত হইতে হইয়াছে, এই জন্যইত আমরা প্রকৃত অবিবাহিতা ব্রহ্মবাদিনী দেখিতে পাই না। আজ কাল এমন ভাব দাঁড়াইয়াছে যে, কি পুত্র, কি কন্যা তাহাদিগকে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করিতেই হইবে পুত্র কন্যাগণকে ধর্ম্মশিক্ষা না দিবারই ইহা ফল। পূর্ব্বকার পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে আর আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন কি করা উচিত? শিশুবিবাহ রহিত করা কর্ত্তব্য। এই কুনীতিটী আমাদের সমাজ মধ্যে স্থান পাওয়াতেই বালবিধবার সংখ্যা অধিক হইয়াছে। ইহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া বিশেষরূপে ব্যথিত হইতে হয়। যাহারা পতি মর্য্যাদা ও ধর্ম্ম শাসন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, এরূপ বালবিধবাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য করা অতীব অন্যায়, আমার বিবেচনায় যতদিন না তাহারা জ্ঞান লাভ করে, ততদিন তাহাদিগকে বিধবাদলের মধ্যে গণ্য করা উচিত নহে। তাহাদের জ্ঞান হইলে, পিতা মাতার উচিত তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করেন এবং তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তাঁহাদের বৈষয়িক অবস্থা ভাল হইলে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া শিশু বিধবাকে ধর্ম্মকথা শুনাইলে বড় ভাল হয়। এইরূপে শিশু বিধবাগণ যখন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবে এবং তাহাদের অবস্থা অবগত হইবে, তখন তাহাদের অভিপ্রায় লইয়া তাহাদিগকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া উচিত কি না, তাহা স্থির করা বিধেয়। যাঁহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে বিবাহ দেওয়া হউক, আর যাঁহারা তাহাতে সম্মত না হইবেন, তাঁহারা সেই সময় হইতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ব্রতী হউন। যেমন পুণ্যবতী শরৎসুন্দরী তাঁহার অতুলনীয় গুণ ও পবিত্রতায় রমণীকুলকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, এই ব্রহ্মবাদিনীগণও সেই প্রকার করুন। পরি-

বার মধ্যে ইহঁারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজ করিতে থাকুন। তাঁহাদের সকল ব্যবহারে সংসারকে মধুময় করিয়া তুলুন। তাঁহারা বালক বালিকাদের জননী হউন, রোগী, শোকীদের শান্তিদাতা হউন, ক্ষুধার্ত্ত-দিগের অন্নপূর্ণা হউন এবং সকল সৎকার্য্যে যোগ দিয়া সাধারণের নিকট সুখ্যাতির ভাজন হউন। পরিবার মধ্যে থাকিয়া সাংসারিক কার্য্যে যোগ দিলেই যে তাহারা অপবিত্র হইবেন, তাহার কোন কারণ নাই। ঈশ্বরের কার্য্য সমাধা করিতেছেন বলিয়া সমুদায় আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ করুন। গৃহস্থের উচিত যে তাঁহাদের প্রতি সমধিক যত্ন প্রকাশ করেন। লোকের যে একটী ভ্রম আছে যে বিধবাগণ হতভাগিনী এবং অপয়া, এ ভ্রমটী যেন মনে স্থান না পায়। ধর্ম্মের পবিত্র আনন্দ যাহারা ভোগ করিতে না পারে, তাহারাই দুর্ভগা ও অপয়া। যাহারা এই পাপপূর্ণ ধরাধামে স্বর্গীয় ভাব আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম ভাগ্য আর কাহার হইতে পারে? পার্থিব স্বামীকে হারাইয়া যাঁহারা জগৎস্বামীকে পাইয়াছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে?

শিশু বিধবার সম্বন্ধে আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত করিলাম। এখন দেখা যাউক, যে সকল রমণী অল্প কিম্বা অধিক কাল স্বামী সম্ভোগ করিয়া বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য। যাঁহারা সম্ভোগ সুখ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভোগ ইচ্ছা প্রবল থাকে। পতি সঙ্গে যে ভোগনদী সরল পথে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা পতির অভাবে বিপথগামিনী হইবার সম্ভাবনা। এই সকল রমণীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। যাঁহারা সংযত ভাবে থাকিতে পারেন, তাঁহাদের মনকে আন্দোলিত করা উচিত নহে। তবে গৃহের অন্যান্য রমণী যদি বুঝিতে পারেন যে, কোন বিধবার মন সুখ ভোগের দিকে প্রধাবিত, তাহা হইলে বাটীর কর্ত্তাকে তাহা জানাইয়া তাহার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ, কুপথগামিনী হইয়া কুলকে কলঙ্কিত করা অপেক্ষা, এরূপ বিধবা রমণীর পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহ পরামর্শ-সিদ্ধ। কিন্তু, বয়স্থা বিধবাদের বিবাহ না হওয়াই ভাল। তাহাদের পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বে যাহাতে তাহারা ধর্ম্ম আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে পারে, তাহার উপায় করা উচিত। শূন্য মনকে শয়তান অধিকার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোন না কোন কার্য্যে সদা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, কুচিন্তা তাহার মনে স্থান পাইতে পারে না। বিধবা রমণীর উপর যদি নানা কার্য্যের ভার দেওয়া হয়, এবং উত্তম উপদেশ ও আলোচনার দ্বারা তাহার মনকে ধর্ম্ম ভাবে পূর্ণ করা যায়, তাহা হইলে কোন প্রলোভন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। লোকের প্রথম বিবাহই প্রকৃত বিবাহ। ইহাই দুই আত্মার পবিত্র মিলন। দ্বিতীয় বারের বিবাহ সে পবিত্র ভাব আনয়ন করিতে পারে না। ইহা কেবল ভোগ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে। যখন প্রণয় সূত্র একবার ছিন্ন হইল, তখন আর তাহাকে যোড়া দিয়া কত রাখা যায়। বিধবা রমণী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিল। কিছুকাল পরে সে স্বামীও পরলোকগত হইল। রমণীর ভোগ ইচ্ছা তখনও মিটে নাই। আবার তাহার বিবাহ হইল। আবার সে পতি

হারাইল। এ প্রক্রিয়া অপেক্ষা,যাহাতে বিধবা রমণী তাহার পতির স্মৃতি অন্তঃকরণে ধারণ করত তাহার অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্ম আলোচনায় অতিবাহিত করিয়া পরলোকে পতি সম্মিলন প্রতীক্ষা করে, তৎপক্ষে যত্নবান হওয়াই উচিত। পুরুষগণ যাহা ইচ্ছা করেন বলিয়াই যে রমণীগণকে তাহাদের অনুসরণ করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। কত পুরুষ পত্নী হারাইয়া পর পর তিন চারি বার বিবাহ করিতেছেন। এ দৃশ্য কি ভাল? ভোগ ইচ্ছা পূর্ণ করাই এ বিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু এরূপ করিয়াও তাঁহাদিগকে তৃপ্ত হইতে দেখা যায় না। ভোগ ইচ্ছা ক্রমশই প্রবল হইতে থাকে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, প্রথম পরিণয়ের ভিতরেও ত এই ভাব নিহিত থাকে? থাকিতে পারে। কিন্তু, বিবাহের উদ্দেশ্যই তাহা নহে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, দুই আত্মা আধ্যাত্মিক ভাবে মিলিত হইয়া ধর্ম্ম আলোচনায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এবং এই সংযোগ হইতে সন্তান উৎপাদন হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবে। আমাদের পূজনীয় শাস্ত্র-প্রণেতাগণ এই ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। এই জন্যই স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী। পতির জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত অভিন্নহৃদয় হইয়া থাকিবেন, সকল সৎকার্য্যে তাঁহার সহিত যোগ দিবেন এবং মনের আনন্দে সাংসারিক কার্য্য সমাধা করিবেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ পতিকে হারাইলে তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিবেন, যে আধ্যাত্মিক মিলনে মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা বিচ্ছিন্ন হয় নাই,এরূপ বিবেচনা করিবেন এবং পরকালে তাঁহার সহিত স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিবেন, এই আশা তাহাকে সকল সময়ে উৎফুল্ল করিবে। পত্নীকে হারাইলে পুরুষেরও এই ভাবে জীবন যাপন করা উচিত। কি পুরুষ কি স্ত্রী, যিনি এরূপ উচ্চ ভাব পোষণ করিতে সক্ষম হইবেন না, ভোগ বাসনা যাঁহাকে উত্তেজিত করিবে, তাঁহার পক্ষেই পুনরায় বিবাহ করা উচিত। কিন্তু, এ বিবাহ প্রকৃত বিবাহ নহে, ইহা ব্যভিচারের স্রোত রোধ করিবার উপায় মাত্র।

নিয়মিত ভোজন করা, একবার মাত্র আহার করা এবং একাদশী-ব্রত পালন করা, বিধবাদের ক্লেশ দিবার জন্য ব্যবস্থা করা হয় নাই। এ প্রকার নিয়ম, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলের পক্ষেই অবলম্বন করা উচিত। তবে একাদশীতে নিরম্বু থাকিবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এ প্রকার কঠোর নিয়ম নাই। অধিক দূর যাইতে হইবে কেন, পূর্ব্ব বাঙ্গালার বিধবাগণ একাদশীতে জলযোগ করিয়া থাকেন। এই নিয়ম বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যাহাতে প্রচলিত হয়, তৎপক্ষে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। আমরা দেখিতে পাই যে, বিধবাগণ তাঁহাদের পবিত্র আহারের গুণে নিরোগী হয়েন, তাঁহাদের শরীর সবল হয় এবং তাঁহারা অধিক কাল জীবিত থাকেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে হিন্দুস্থানীরা নিয়মিত ভোজন করেন এবং একাহারে থাকেন। তাঁহাদের ন্যায় কোন জাতি দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ? আমরা ভোগ সুখটী উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। কোন মতেই ভোগের ত্রুটী হইতে দিব না। মাসের মধ্যে দুইবার করিয়া একাদশীর ব্রত অবলম্বন করিলে ভাল হয়, কিন্তু তাহাও করিব না, এই জন্যই ত আমরা এত হীনবল।

আমার বিবেচনায় যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা তোমাদের সমক্ষে ব্যক্ত করিলাম। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার সার মর্ম্ম কয়েকটী কথায় বুঝাইয়া দিতেছি। কন্যা যাহাতে অল্প বয়সে পরিণীতা না হয়, তৎপক্ষে পিতা মাতার লক্ষ্য রাখা উচিত। বঙ্গদেশে আজ কাল বিবেচক ব্যক্তিগণ ১২।১৩ বৎসর বয়ক্রমে তাঁহাদের কন্যাদিগকে পাত্রস্থ করিয়া থাকেন। এ পদ্ধতিটী যত অধিক পরিমাণে অবলম্বিত হয়, তত ভাল। তাহা হইলে শিশু বিধবার সংখ্যা ক্রমে কমিতে থাকিবে। ইহা অতীব বাঞ্ছনীয়। সমধিক চেষ্টা সত্ত্বেও শিশু বিবাহ যে শীঘ্র রহিত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। কারণ সকলেই যে বিবেচনার সহিত চলিবেন, ইহা সম্ভব নহে। শিশু বিধবাদের যতদিন হিতাহিত জ্ঞান না হইবে, ততদিন তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করান না হয়। পিতামাতা যে তাঁহাদের বিধবা কন্যার দুঃখে বিশেষরূপ ব্যথিত হয়েন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কাহার কাহার জামাতা বিদেশে প্রাণত্যাগ করিলে তাহারা এ সমাচার গোপন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদের কন্যা বিধবা হইয়াও সধবার ন্যায় অবস্থিতি করেন। যখন এরূপ দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে নয়নগোচর হইয়া থাকে, তখন সকলে সমবেত হইয়া এরূপ নিয়ম করিলে ভাল হয় যে, যতদিন শিশু বিধবাদের ভাল মন্দ জ্ঞান না জন্মে, ততদিন তাহাদিগকে সধবার ন্যায় রাখা হয়। পণ্ডিত মণ্ডলীকে লইয়া এ বিষয়ে একটী ব্যবস্থা করা উচিত। শিশু বিধবাগণ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে এবং শিক্ষা ও ধর্ম্ম আলোচনার দ্বারা উন্নত হইবে, তখন তাহাদের সমবয়স্কাদের দ্বারা তাহাদের অভিপ্রায় জানিতে হইবে। তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে তাহারা বিবাহ করিতে পারে, অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে পারে। যখন অধিকাংশ বিধবা আমাদের সমক্ষে একটী উচ্চ আদর্শ ধারণ করিয়াছেন, যখন তাঁহাদের পবিত্রভাবে আমাদের সমাজকে উজ্জ্বল করিয়াছে, তখন ইহা বাঞ্ছনীয় নহে যে, এই দেব কন্যাগণকে, এই ব্রহ্মবাদিনীদিগকে সাংসারিক সুখের দিকে লইয়া যাই। তবে এই সংসারে ভাল মন্দ উভয়ই বিদ্যমান। বিধবা মাত্রেই যে দেবতার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে, এমন আশা করা যায় না। আর সকলেই যে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবে, এরূপ সম্ভব নহে। আবার এমনও ঘটিয়া থাকে যে, কোন কোন বিধবার পক্ষে জীবন যাপন করা ভার হইয়া উঠে। এমন আত্মীয় স্বজন নাই যে, তাহাদের প্রতিপালন করে। এরূপ স্থলে তাহাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত। ফল কথা এই যে, যখন দেখা যাইবে যে, বিবাহ না দিলে কোন বিধবার কুপথগামিনী হইবার সম্ভাবনা, এবং কোন প্রকার আশ্রয় ব্যতীত কাহারও পক্ষে জীবন ধারণ করা অতীব কষ্টজনক, তখনই তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদের ইচ্ছা নহে যে বিধবা-রূপ দেবতার দর্শন লাভ হইতে আমরা বঞ্চিত হই। যাঁহারা অধিক বয়সে বিধবা হয়েন, তাঁহাদের পক্ষেও এই ব্যবস্থা অবলম্বনীয়। তবে আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার যে সকল বিধবা নারীগণের সন্তান হই-

য়াছে, তাঁহাদের পুনরায় বিবাহ না হওয়াই উচিত। এবং এরূপ নিয়ম যাহাতে পুরুষ-দের প্রতি প্রয়োগ হয়, তৎপক্ষেও যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজা মুকুট রায়।

যাঁহারা কবি নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, উক্ত পুস্তকের নায়ক বীরেন্দ্রের পিতাও এক মুকুট রায়। বীরেন্দ্রের নাম কবির কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু মুকুট রায় ঐতিহাসিক নাম এবং তাঁহার প্রাদুর্ভাব কাল ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি চট্টগ্রামের রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান প্রস্তাব উক্ত মুকুট রায় অবলম্বনে নহে; ইহাঁর উদ্দেশ্য বাড়ীবাথানের মুকুট রায়। মুসলমানেরা ইহাঁকে মুকুট রাজা বলে।

যশোহরের অন্তর্গত ঝিনেদহ মহকুমার অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে একটা স্থান আছে; উহার নাম বাড়ীবাথান। তথায় মুকুট রায় রাজত্ব করিতেন। কোন ইংরেজ-লেখক ইহাঁকে স্পর্শ করেন নাই, বোধ হয়, সেই জন্যই ইঁহার নাম অজ্ঞাত। যেমন বাঙ্গালায় মোগল প্রভুত্বের আদি সময়ে প্রতাপাদিত্য, তেমন স্বাধীন পাটানদিগের প্রভুত্বের প্রারম্ভে মুকুট রায়।

মুকুট রায় বৈদিক ব্রাহ্মণ। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত জাহাঙ্গিরাবাদ পরগণার পূর্ব্বস্থলী গ্রামে তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান ছিল। ইনি রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, ও বৈদিক তিন শ্রেণী হইতে দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা উত্তরকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কোটচাঁদপুরের নিকট জয়দিয়া, পোড়াহাটী মধুপুরের নিকট জয়পুর এবং ছত্রজিৎপুরের নিকট বারুইখালী গ্রামে তাঁহাদের বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

মুকুট রায়ের অভ্যুদয় সম্বন্ধে "ডাল চাপ্‌রা পাঞ্জার" কথাই প্রসিদ্ধ। তিনি পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট পারস্য দেশ হইতে এক পত্র আসিয়াছিল। সম্রাটের সভায় কোন ব্যক্তি উহার অর্থ করিতে পারে নাই; অবশেষে মুকুট রায় সেই পত্রের অর্থ করেন; এজন্য সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মুকুট রায় পূর্ব্বে বাঙ্গালার গঙ্গার দক্ষিণে কয়েকখানি জমির বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহিলে, সম্রাট হৃষ্টচিত্তে তাহা প্রদান করেন। অবিলম্বে সনন্দ লেখা হইল, কিন্তু যে সময়ে সনন্দ সহি হইবে, তখন সম্রাট ভোজন করিতে ছিলেন এবং ডাল হাতে সনন্দে পাঞ্জার ছাপ দেওয়া হইল। এজন্য প্রসিদ্ধ যে, মুকুট রায়ের সম্পত্তি "ডালচাপরা পাঞ্জা" মূলক।

এটী কিম্বদন্তি। কিন্তু ইহা একেবারে অসত্য নহে। সে কথা পরে বলিব; সম্প্রতি মুকুট রায়ের সময় ঠিক করা যাক্।

পূর্ব্ব বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান প্রায়

সকলেই গাজীর গীত কি, তাহা জানেন। যেরূপ হিন্দুর মধ্যে কৃষ্ণলীলা, সেইরূপ মুসলমানের মধ্যে গাজীর গীত। কিন্তু এই গীতগুলি পূর্ব্ব বঙ্গের সীমা অতিক্রম করে নাই। শুনা যায় যে, যে বর্দ্ধমানে মুকুট রায়ের পূর্ব্ব বাসস্থান ছিল, সেখানেও গাজীর গীত নাই। কিন্তু এই গাজীর গীতেই মুকুট রায়ের পরিচয় ও সময় পাওয়া যায়। মুকুট রায়ের কন্যাকে গাজী বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বতরাং গাজী তাহার সমকালবর্ত্তী।

আমরা নিম্নে গাজীর গীত বন্দনাটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

পোড়া রাজা গয়েসদি (১)
তার পুত্র সমাজাদি (৩)
তার পুত্র সাইসেকেন্দর। (৩)

তার বেটা বর্‌খান গাজী
খোদাবন্দ্ মুহুকের রাজি
কলি যুগে যার অবতার ॥

বাদসাই ছাড়িল রঙ্গে
কেবল ভাই কানু সঙ্গে (৪)
নিজ নামে হইল ফকীর।

বার বাজারে আশ (৫)
বাঁচালে শিমুল গাছ
দোওয়া দিল জামানের তরে ॥

জামানেরে দোওয়া দিয়ে
সেখ সলিমন নাম রেখে (৬)
আসন কল্লে দরিয়ার কিশরে।

খুস্তি আরনি সার
যাখির কল্লে মামুদবাজ (১)
ছিরাম তাঁতির নিজ ঘরে ॥ (২)

ছিরামের ভাগ্য ভাল,
দেওয়ানের দিল হল
ঘোড়া দিঘী করিল হাজত।

সাতশ গাড়ল নিয়ে
ধরার ঘাট পার হয়ে (৩)
তবে যাখির খুনিয়া নগর ॥

খুনিয়া নগরে ধন্যে
মুকুট রাজার কন্যে
বিয়ে কল্লে স্বশীলা স্বন্দরী।

স্বশীলারে বিয়ে করে
বিবি চাম্পা নাম রেখে
রেখে গেলেন আপনার সাক্ষাতে ॥

তথায় উড়ানি যেয়ে (৪)
বিবি চাম্পায় গোর দিয়ে
ত্রিভুবনে হলেন উদাসীন।

আঠার ভাটির দূরে (৫)
পীর দর্প নামে ধরে
সেই দেশে ছিল বলিরাজ ॥

---

(১) গয়েসদ্দিন, (২) সামস্বুদ্দিন, যিনি পূর্ব্ব বঙ্গে স্বাধীন পাঠান বাদসাহ ছিলেন এবং পশ্চিম বঙ্গও জয় করিয়াছিলেন। (৩) বঙ্গের বিখ্যাত সেকেন্দর বাদসাহ। (৪) সম্ভবতঃ হিন্দু ফকীর। ইনি বাগেরহাটের অন্তর্গত পড়িখালী দরগার কালাচাঁদ ফকীর নহেন। (৫) যশোহর হইতে ১০ মাইল উত্তরে। (৬) ছরিনা কুণ্ডে এক সলিমন বাজার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইনি কি সেই ব্যক্তি?

(১) বার বাজারের নিকটবর্ত্তী একটা গ্রামের নাম। (২) বার বাজারের রাজা বলিয়া কথিত। এই রাজবাটীর চিহ্ন আছে। (৩) ধরা একজন পাটনীর নাম। ইহার নামে যশোরে ভৈরব নদীতে ধরা [দড়া] টানার ঘাট। (৪) উড়ানী—গ্রামের নাম। (৫) আঠার

সে দেশে ছিল বলি
না দেয় হাজতে ছিন্নি
তাঁরে মাল্লেন ইহার কারণ ।।
গাজির • মহিমা বানি
হাওয়ার বচন শুনি
হাজত মাঙ্গাল মহাজন ।।

কোন কোন পাঠক হয়ত মুসলমান-লিখিত অরুচিকর এত বড় সঙ্গীত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু ইহা আমাদের বলিতে হইল, আমাদের বঙ্গের ইতিহাস অন্বেষণ করিতে হইলে, উহাদের মুখপানেই চাহিতে হয়। বিশেষতঃ মুসলমানদিগের বিষয় আমরা যত জানিতে পারিব, তত তাহাদের সহিত আমাদের সদ্ভাবের সম্ভাবনা। পার্লেমেন্টের মেম্বর স্যার উইলফ্রিড লছন একবার বলিয়াছেন, আমাদের চক্ষু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায়; দূরের বস্তু দেখি, নিকটের বস্তু দেখি না। এই কথাটা আমাদের হিন্দু-দেশহিতৈষীদিগের উপর বেশ প্রযুক্ত হইতে পারে। আমরা জর্ম্মনি, আমেরিকার বিষয় আন্দোলন করিতে পারি; তাহাদের পুস্তক অনুবাদ করিতে পারি, তাহাদের মতে দেশের লোকের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি; কিন্তু কয়জন কৃতবিদ্য হিন্দু মুসলমানের বিষয় চিন্তা করে? বাঙ্গালা ভাষায় যে মুসলমানে লিখিত "আমির হামজা," "কাছা ছল হাম্বি-য়া," "হাতেম তাই" ইত্যাদি গ্রন্থ আছে, তাহা কি কোন দেশহিতৈষী হিন্দু পাঠ করেন? আমাদের যাহারা পাড়াবাসী, যাহাদের জীবন আমাদের জীবনের সহিত, স্বীকার করি আর নাই করি, জাতীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইতেছে, সেই মুসলমান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীতে, বাঙ্গালায় লিখিত গ্রন্থাবলীতে যে সকল ভাব লিখিত আছে, তাহা কি আমরা জানিতে ইচ্ছা করি? যত দিন দেশের কৃতবিদ্য সমাজ এই বিষয়ে মনোযোগ না করিবেন, জাতীয়সমিতি ও স্থানীয় সমিতি ও আত্ম-শাসন সমিতি কেবল অগাধ সলিলে সন্তরণ করিবেন মাত্র, কিনারা অনেক দূরে।

কি বলিতে কি বলিলাম। যাহা হউক, উক্ত গীতে জানা যায়, সেকন্দর সাহার পুত্র বরখান গাজী মুকুট রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রামশঙ্কর রায় বলেন, যে ব্যক্তি মুকুটরায়ের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি গাজী বলিয়া প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু তিনি পাবনায় শুনিয়াছিলেন যে, সাহ মুকুহুম ও গাজি এক ব্যক্তি। সাহ মুকুহুম জরিপ করার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই হাতের গঞ্জ "সেকন্দরী গঞ্জ" বলিয়া বিখ্যাত। গাজীর নাম সাহমুকু-হুমই হউক, আর বরখানই হউক, ইনি কম ব্যক্তি নহেন। পাবনা, ফরিদপুর, যশোহর, কৃষ্ণনগর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় ইঁহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। মুকুট রায়ের রাজ্যও এই সকল জেলায় বিস্তৃত ছিল। গাজির নামে অদ্যাপি সিন্নি হয়। হিন্দুরাও বিভীষিকার সহিত "ও গাজি!" ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে। গাজির এই প্রভাবের মূল কারণ, তিনি মুকুট রায়কে হত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন।

কেবল এও নহে। গাজী শব্দের একটী গূঢ় অর্থ আছে, মুসলমানেরা বিশ্বাস করে,

ভাটি অর্থাৎ আঠার বাকি নদীর অপর পারে। সম্ভবতঃ ফরিদপুরে কিম্বা আঠার ভাটী নৌকা বাহিয়া দক্ষিণে গিয়া বলিরাজাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মারা যায়, তাহারা সহিদ (martyr) হয়। আর যাঁহারা মারা না যেয়ে কৃতকার্য্য হইয়া আইসে, তাঁহারা গাজী। সুতরাং গাজী মুকুট রায়ের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ। মুকুটরায় একজন ধর্ম্ম যোদ্ধা।

খ্রীষ্টাব্দের ১৩৩৯ হইতে ১৩৫৮ পর্য্যন্ত সামসুদ্দিন বঙ্গদেশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই পাঠান-দিগের স্বাধীন রাজত্ব বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পুর্ব্বে তিনি পুর্ব্ব বাঙ্গালার লব্ধ-প্রবেশ হন নাই, তখন সোণার গাঁয় অন্য মুসলমান বাদসহ ছিলেন। পুর্ব্ব বাঙ্গালায় আসিয়া তাঁহাকে বরদ করা ভিন্ন আর কিছু তিনি করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ সময়ও গঙ্গার বা পদ্মার দক্ষিণ তীরস্থ ভূভাগ স্বাধীনতা-বলম্বনে ছিল। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং পদ্মা বা গঙ্গার দক্ষিণ পাড় যাহাকে প্রকৃত বাঙ্গালা বলে, তাহা তাঁহার অস্পৃষ্ট থাকিয়া যায়। কিন্তু তথাচ তিনি সমুদয় বাঙ্গালার স্বাধীন বাদসহ বলিয়া আপনাকে ঘোষিত করেন এবং শ্বেতছত্র ধারণ পুর্ব্বক বঙ্গেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হন। তাঁহার সময়ে ও তৎপুত্র সিকন্দরের সময়ে মুকুটরায় বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রাদুর্ভাব কাল, ১৩৩৮ হইতে ১৩৬৮ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে।

অর্দ্ধোন্মত্ত মহম্মদ তোগলকের সময়েই বাঙ্গালায় স্বাধীনপাঠান রাজ্য স্থাপিত হয়। তখন বাঙ্গালা বিপ্লবে পরিপুর্ণ। সামসুদ্দিন সোণার গাঁ হইতে গৌড় এবং গৌড় হইতে গণ্ডক নদী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া লইলেন। মুকুটরায় একজন প্রতিভাশালী পুরুষ। তিনি মহাম্মদ তোগলকের নিকট হইতে "ডাল চাপড়া" পাঞ্জার অনুবলে গঙ্গার দক্ষিণে সমস্ত ভূভাগের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ইতি পূর্ব্বেই, পারস্য ভাষায় দক্ষতা বশতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় জমীদারী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসস্থল পুর্ব্বস্থলীতে ছিল এবং সেখানে অদ্যাপি প্রবাদ আছে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে "নবাব বাঁধা গাছ" বলিয়া কতকগুলি পুরাতন বৃক্ষ চিহ্নিত হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয়, যখন বাঙ্গালার নবাবেরা প্রথম প্রথম মস্তক উন্নত করিতেছিলেন, তখন মুকুটরায় তাহা-দিগকে বিলক্ষণ শাস্তি দিয়া থাকিবেন।

যে প্রকারেই হউক, মুকুটরায় অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। শুনা যায়, তাঁহার ২৫৬টী যুদ্ধ হস্তী, ৩২০ টা যুদ্ধ অশ্ব এবং ২,২০০ বেলদার বা কোরা ছিল।* পরবর্ত্তী কালে প্রতাপাদিত্যেরও ২৫৬টী যুদ্ধ-হস্তীর অধিক ছিল না। ভারত-চন্দ্রে আছে

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে বাদশায়, কেহ নাহি আটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥

---

* Whenever he marched, he was accompanied by 16 halkas of elephants (one halka is equal to 10),20 halkas of horses and 2,200 saffers or miners (Beldars or koras). *Report on Jessore by Babu Ram Sunker Sen.*

বড় পুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ন্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

মুকুটরায়েরও ষোড়শ হলকা হাতী ছিল। তাহার ঢালী সৈন্যও ৫২০০০ হাজারের কম না হইতে পারে। প্রত্যুত, তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ততোধিক হইবার সম্ভাবনা যত অধিক, কম হইবার সম্ভাবনা তত অধিক নহে।

যখন বঙ্গদেশে পাঠান স্বাধীনতার আরম্ভ হইল, তখনই পূর্ব্ব পশ্চিম বাঙ্গালায় মুসলমান রাজাদিগের আত্ম কলহ আরম্ভ হইল। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মুকুটরায় এ সময়ে বাড়ীবাথানে বাস করিতেছিলেন। তখন তিনি দিল্লীর অধীন, এই কথা বলিয়াই হউক, অথবা তিনি স্বাধীন এই রূপ ভাবেই হউক, এ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। বোধ হইতেছে যে, সামসুদ্দিন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে যেমন স্বাধীন ভাবে রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন, তেমন তিনিও উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখী রাজত্ব বিস্তার করিতেছিলেন। সামসুদ্দিনের গতি গঙ্গা বা পদ্মার উত্তর তীর দিয়া, ইঁহার গতি গঙ্গার দক্ষিণ তীর হইতে সুন্দর বনাভিমুখে। বোধ হয়, মুকুটরায় মহম্মদ তোগলকের কোন সহায়তা পায় নাই, তাহা হইলে তাঁহার নাম গোপন থাকিত না, এবং হয়ত বাঙ্গালার পাঠান রাজত্ব স্বাধীন ভাবে স্থাপিত হইত না। ইহাতেই বোধ হইতেছে, মুকুট রায় স্বাধীন ভাবেই রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন।

যত দিন সামসুদ্দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মুকুট রায়ের উপর কোন বিপদ পাত হয় নাই। কিন্তু তৎপুত্র সেকন্দর বঙ্গে অদ্বিতীয় লোক। এইজন্যই মুসলমানের মধ্যে সেকন্দর বাদসাহের এত নাম। তিনি এক হস্তে খড়্গ অপর হস্তে কোরাণ লইয়া পিতৃরাজ্য বিস্তারে ও শাসন প্রণালী গাঢ়তর ভাবে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। দেশে জরিপ আরম্ভ হইল। যে স্বাধীন, তাহার জমীও জরিপ হইতে লাগিল; যে অধীন তাহার ত কথাই নাই। এই সময়ে ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজা (যাহাদের অধিকার একটী মহকুমার মত স্থান ব্যাপক;) দলে দলে আত্মহত্যা করিয়া গঙ্গাজলে সপরিবারে ডুবিয়া মরিতে লাগিলেন। রামশঙ্কর বাবু বলেন যে, তিনি অনুসন্ধানে ছয়টী ভগ্ন রাজবাটীর ইতিহাস সম্বন্ধে শুনিয়াছেন যে, মুসলমানদের সময় সেই সেই বাটীর রাজা সপরিবারে জলে মগ্ন হইয়াছেন। আমাদের কর্ণগোচরে যত কিম্বদন্তী আসিয়াছে, তাহাতে উক্ত সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হয়।

যখন তোগলক বংশের ক্ষমতা বাঙ্গালা হইতে তিরোহিত হইয়াছিল, তখন যেমন বঙ্গীয় পাঠানেরা মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, তেমন পূর্ব্ব বঙ্গীয় হিন্দুরাও চুপ করিয়া থাকেন নাই। হিন্দুদেরও তখন প্রভূত ক্ষমতা ছিল। সেকন্দর এই ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার পুত্র বরখান নিজে ধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দ্বাদশ ফকির জুটিল। তাঁহারা প্রায় সকলেই জাতিভ্রষ্ট হিন্দু। এই সকল ফকিরের মধ্যে কালুপির, সুর মল্লিক, সত্যপীর, মাণিক পীর বড়পীর ইত্যাদি * নাম শুনা যায়। কেহ কেহ

* কেহ কেহ বলে, সত্যপীর, মানিকপীর,

খানজিহান আলিকে গাজীর অনুচর বলেন। কিন্তু খানজিহান আলি ইহার পরবর্ত্তী লোক। তবে পীরবদর, যাহার কবর চাটিগাঁতে আছে, এই সময়ের লোক হওয়া অসম্ভব নহে। পীরবদরের সহিত গাজির সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। যেরূপ গাজী যশোর প্রদেশে, সেই রূপ পূর্ব্বাঞ্চলে পীর বদর। ইহারা সশস্ত্র মুসলমান মিশনরী।

এই সময় হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নানা কার্য্য হইতেছিল। শত শত ব্রাহ্মণ শূদ্র,ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মুসলমান হইতেছিলেন। দেখা যাইতেছে যে, পীরের নামাবলির মধ্যে হিন্দুর নাম কম নহে। গাজীর সহচর প্রধান কালুও * হিন্দু ছিলেন। যাঁহারা মুসলমান হইতে অনিচ্ছুক, দারা পুত্র পরিবারসহ তাহারা জলে ঝাপ দিয়া মরিতেন, এমন সময় মুকুট রায়, গো বধের জন্য গয়েস কাজী নামে এক ব্যক্তিকে প্রাণে দণ্ডিত করেন। হিন্দুধর্ম্মের দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল এবং তিনি গয়েসের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করিলেন। আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল।

গাজী কোন্ পথে আগমন করেন, ঠিক বলা যায় না। কিন্তু তাহার সহিত নৌসৈন্য ছিল। বোধ হইতেছে, ভৈরব নদী দিয়া তিনি প্রথমতঃ বার বাজারে উপস্থিত হন। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম বাঙ্গালায় অর্থাৎ ঢাকা হইতে গৌড়ে, যাওয়ার নৌকাপথ যশোহরের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। বারবাজার মটুক রায়ের ছিল। শ্রীরাম তাঁতী নামে এক ব্যক্তি গাজীর সহায়তা করিয়া উক্ত বাজার তাঁহার হস্তগত করিয়া দেয়। এই ব্যক্তিই শেষে বার বাজার শ্রীরাম রাজা উপাধিতে খ্যাত। বার বাজারে কতকগুলি পুরাতন কীর্ত্তি চিহ্ন আছে। মুসলমানেরা বলে, উক্ত বাজারে গাজী বার আওলিয়া অর্থাৎ ফকিরকে অবস্থানের স্থান দেন, এ জন্য নাম বারবাজার। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের ইতিহাসে বার বাজারের পূর্ব্ব ইতিহাস নাই। তবে মোগল সম্রাটদিগের সময় রামচন্দ্র খাঁ * নামে মানসিংহের একজন অনুচর বার বাজারে বাড়ী করিয়া ছিলেন। ইহাতে আমাদের কথার কিছুই ব্যত্যয় করে না।

মুকুট রায়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ কেবল বাড়ী বাথানে আছে, এমন নহে। বাঘুটিয়া, খুনিয়ানগর এবং ঢোল সমুদ্রের নিকটে ফরিদপুরেও তাঁহার বাড়ীর চিহ্ন পাওয়া যায়। * তদ্ভিন্ন, পূর্ব্ব স্থলে তাঁহার যে বাড়ী ছিল, তাহা ভাগীরথী গ্রাস করিয়াছেন। কুমারখালীতে তাঁহার এক বাড়ী ছিল, এরূপ শুনিতে পাই, যাহা হউক,এ অঞ্চলে তাঁহার বাড়ী বাথানের বাড়ীই প্রসিদ্ধ। মুকুট রায় বাড়ীবাথানে থাকিয়া, পরিবার খুনিয়া নগর প্রেরণ করিয়াছিলেন। খুনিয়া নগর যশোহরের দক্ষিণে, এইক্ষণে খুলনা জেলার অন্তর্গত। গাজী বার বাজার নামক

বড়পীর,—ইহারা পাঁচ পীরের মধ্যে পরিগণিত।

* এ কালু মোরলগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বাড়ই খালির কালাচাঁদ ফকির নহেন। ১৭৭২ সালের রেনেলের ম্যাপে বাড়ইখালী ফকিরের আবাস বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু গাজী তাহার অনেক পূর্ব্বে।

* নপাড়া জমিদারদিগের আদি পুরুষ।

* এই বাড়ীগুলি বৃহৎ পরিখা বেষ্টিত এবং কোন কোন বাড়ীতে ভগ্ন ইষ্টকাদি রাশীকৃত হইয়া আছে।

তাঁহার কারবারের স্থল খনন করিয়া, সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। একদল সৈন্য পীর স্থর মল্লিকের অধীনে বাড়ীবাথানে যাত্রা করিল, অপর দল কালু ও গাজী উভয়ের অধিনায়কতায় খুনিয়ানগর গমন করিল।

মুকুট রায় পরিবার রক্ষার কি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিছুই জানা যায় না। পীর স্থর মল্লিকের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মদেহ জলমগ্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার মৃত্যুর কিম্বদন্তী দেপাঙ্গ রাজার মৃত্যুর কিম্বদন্তীর ন্যায়। তাহার পুনরুক্তি করিয়া আমরা পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না। অদ্যাপিও বাড়ীবাথানে পীর স্থর মল্লিকের দরগা আছে, তথায় হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সিন্নি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন গয়েদপুর কাটছাথরা প্রভৃতি গ্রামে পীর স্থর মল্লিকের দরগা দৃষ্ট হয়। রাম শঙ্কর বাবুর রিপোর্টে এই সকল দরগার সবিশেষ বর্ণনা আছে, আমরা তাহা, বোধ হয়, উপেক্ষা করিতে পারি।*

এই ধর্ম্ম-যুদ্ধোন্মত্ত বরথান নবযৌবন-সম্পন্ন ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বালক কালেই ফকির হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই ধর্ম্ম রণমত্ত ফকির স্বয়ং খুনিয়ানগর অবরোধ করিলেন। হিন্দুদিগের নিকট হইতে কিছুই শুনা যায় না, সুতরাং সে স্থান কিরূপ ভাবে রক্ষিত হইতেছিল, তাহা জানা যায় না। যুদ্ধ করিয়াই হউক, বা যুদ্ধ না করিয়াই হউক, খুনিয়ানগর গাজী সাহেব হস্তগত করিলেন। মুকুট রায়ের কন্যা সুশীলা তাহার হস্তগত হইলেন। কিন্তু গাজীর গীতেই শুনা যায়, তাহাকে অবিলম্বে কবর দিতে হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হইতেছে, সুশীলা মুসলমান করস্পৃষ্ট হইয়াই আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। গাজী আর খুনিয়া নগরে (খুনের নগর) থাকিতে পারিলেন না, সুশীলার উপর অত্যাচারে সমস্ত হিন্দু উন্মত্তপ্রায় হইল। গাজী সুশীলার মৃত দেহকে লইয়া চলিলেন এবং উড়ানী গ্রামে গিয়া তাঁহাকে কবরস্থ করিলেন। সুশীলার রূপে তাঁহার মস্তিষ্ক বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তিনি উদাসীন হইলেন। যে হিন্দু ললনা গাজীর ন্যায় রাজপুত্রকে টীটকারী দিয়া শমন ভবনে চলিয়া গেলেন, তাঁহার শোকে অধীর হইয়া গাজী আরও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সঙ্গীয় ১২ জন জাতিভ্রষ্ট হিন্দু ফকিরের সহায়তায় গ্রামের পর গ্রাম, বন্দরের পর বন্দর মুসলমান করিতে লাগিলেন। তিনি আঠার ভাটীর দিকেও গিয়াছিলেন। যে সকল হিন্দুরা, সুন্দরবনে ও জলা জমীতে জাতি, ধর্ম্ম ও স্ত্রীলোকের সম্মানের ভয়ে পলাইয়াছেন, তাঁহারাও গাজীর হাত হইতে এড়াইতে পারে নাই।

আমাদিগের সুযোগ্য ঐতিহাসিক রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন ;—

"পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মুসলমান ধর্ম্ম সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে লিখিত একখানি বিদেশীয় গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সুবা বাঙ্গালায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মুসলমান। মুসলমান ধর্ম্ম কিরূপে এদেশে এত বহুদূর ব্যাপী হইয়াছে, জানা যায় না।"

ইহার পরে তিনি কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন ;—

"এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, অনার্য্য জাতিগণ পশ্চিম

হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং তন্নিমিত্ত তৎপ্রদেশস্থ অধিবাসীরা বহু পরিমাণে অনার্য্য সম্ভূত বলিয়া হিন্দু সমাজে অতি নীচ শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। এরূপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগের সময়ে দেশের রাজার সহিত সমধর্ম্মা হইতে তাহারা উৎসাহ সহকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে।"

রাজকৃষ্ণের উক্ত উপপত্তি স্পষ্টতঃ অন্যের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু আমরা উহা গ্রহণে প্রস্তুত নহি। আমরা ইহা বুঝি না যে, পূর্ব্ব বঙ্গের অনার্য্য সম্প্রদায় এত বুদ্ধি দেখাইল যে, রাজার সঙ্গে সহধর্ম্মা হইয়া অবস্থার উন্নতি করিয়া লইল, আর পশ্চিম বঙ্গীয় অনার্য্য জাতি পুনঃ পুনঃ মুসলমানদিগের নিকট থাকিয়াও তাহা করিল না। এ বিষয়ের বিস্তারিত উত্তর দিতে স্বতন্ত্র একটী প্রস্তাবের আবশ্যক, পারি যদি সময়ান্তরে তাহার চেষ্টা করিব। এ স্থলে বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, অনার্য্য জন সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গে অধিক নহে এবং পূর্ব্ব বঙ্গে যে মুসলমানধর্ম্ম এত বিস্তারিত হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, মুসলমানদিগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনায় সাতিশয় যত্ন। অল্প পরিমাণ কার্য্যক্ষেত্র পাইয়া সেকেন্দর সাহ অতিশয় গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে যে, জাহাঙ্গীরের সময়ের পূর্ব্বেই মুসলমান ধর্ম্ম আসমুদ্র বিস্তারিত হইয়াছিল। এই বিস্তার কার্য্যে জাতিভ্রষ্ট আর্য্য সন্তানই অধিক সহায়তা করিয়াছে। প্রথমতঃ কতকগুলি আর্য্য সন্তান প্রাণপণে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আর কতগুলি আর্য্য সন্তান সপক্ষতা করিয়াছেন। এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ বশতঃ সমধিক বল প্রয়োগের আবশ্যক হইয়াছিল এবং সহায়তার কারণেও অনেকে প্রলুব্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা মুসলমানদিগের মানসিক শক্তি, চেহারা ও তেজ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাদিগকে অনার্য্য সন্তান বিবেচনা করিতে পারিবেন না। অন্ততঃ চাটিগাঁ, নোয়াখালী, বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর ও যশোহরের মুসলমানগণ আমাদের কথার সপ্রমাণ করিবে।

সংক্ষেপতঃ সেকেন্দর বাদসাহের সময় ধর্ম্মোন্মত্ত তৎপুত্র বরখান গাজী অপ্রতিহত বেগে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তার করেন এবং তিনি যে উত্তেজনা সঞ্চারিত করিয়া যান, তাহা খাঞ্জাআলির * সময়েও থাকে। মোটামুটী বলিতে গেলে, ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ধর্ম্মবিপ্লব চলিয়াছিল।

মুকুট রায় এই ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত এবং তাঁহার কন্যা পবিত্রা সুশীলা বীর্য্যবতী সতীর ন্যায় জলে ঝাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন।

গাজী তৎপরে আঠার ভাটীর দূরে গিয়া বলী রাজাকে নিহত করেন, তখন আর কোন গোল রহিল না। বোধ হইতেছে, জরিপ কার্য্যের সহযোগী সৈন্য নিচয় কর্ত্তৃক মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই কাজ করিয়া লইয়াছিলেন।

মুকুট রায়ের কৃত কতকগুলি রাস্তা আছে এবং (১) নটীপুকুর (২) মিঠা পুকুর ও

---

* ইহার অনেকগুলি রাস্তা ও মস্‌জিদ বাগেরহাট মহকুমায় আছে (Vide Westland's history of Jessore.) কথা সত্য, আমরা দেখিয়াছি। ন, স,

(৩) ঢোল সমুদ্র তাহার খনিত বলিয়া কথিত হয়। নিম্নে তাহার বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

ঢোল সমুদ্র ফরিদপুরে। ইহা ৫২ বিঘা জমি পরিসর। কিম্বদন্তী এই যে, ইহা এত গভীর করিয়া কাটা হইয়াছিল যে, নীচে ঢোল বাজাইলে উপর হইতে শুনা যাইত না। ইহাও বলা হইয়া থাকে, উক্ত সমুদ্র গভীর করিয়া কাটা হইলেও, উহাতে জল উঠিল না। তখন দেবার্চ্চনা আরম্ভ হইল, ৭ দিন ৭ রাত্রি দেবার্চ্চনা হয় এবং তদুপলক্ষে ঢোল বাজিতে থাকে, তজ্জন্য নাম ঢোল সমুদ্র। ঢোল সমুদ্রের দক্ষিণ দিকে মুকুট রায়ের বাটীর ভগ্নাবশেষ আছে। উহা পরিখা বেষ্টিত। অন্যান্য বাড়ী গুলিও সেইরূপ।

নটী পুকুর ও মিঠা পুকুর বাড়ী বাথানে। নটী পুকুরে নটীরা স্নান করিত বা রাজা কেলি করিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বিদ্যাস্থন্দর লিখিত হয়, তৎপূর্ব্বে রুচি যে কি প্রকার ছিল, সহজেই বোধ হয়। বাঙ্গালা পতনের মূল কারণ, জাতীয় চরিত্রের অধঃপাত। মুসলমান রাজত্বের অধঃপতনও তাহাদের জাতীয় চরিত্রের অধঃপাত হইতে সূচিত হইয়াছিল। যদি প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা থাকে, চরিত্রের উন্নতি কর, রুচি মার্জ্জিত কর ও সাহস বৃদ্ধি কর।

মিঠা পুকুর কথাই লবণাক্ত জলের প্রাবল্য প্রমাণ করে। সমুদ্র তখন অনেক উত্তরে ছিল এবং তখন এ অঞ্চল বর্ত্তমান মোরলগঞ্জ কি মটবাড়ীর থানার ন্যায় সমতি নিম্নভূমি ছিল। বঙ্গে যে ১২ ভুঁয়া রাজার নাম শুনা যায়, তাঁহাদেরও বোধ হয় উৎপত্তির সময় সামস উদ্দিনের সময় কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে। মুসলমান কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, সামুদ্রিক প্রদেশে আর্য্যজাতি বহুসংখ্যায় উপনিবেশিত হন। তখন এ অঞ্চল নল, খাগ প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রদেশীয় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নলডাঙ্গা প্রভৃতি নাম তাহার প্রমাণ সূচক; তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও ইহার অনেক প্রসঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছেন।

মুকুট রায়ও একজন এই প্রকারের উপনিবেশী এবং তদানীন্তন ভুঁয়াগণের একজন ভুঁয়া কি না,এ বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিতে না পারিলেও আমাদের অনুমান এই, তিনি তদপেক্ষা কিছুই কম ছিলেন না।

মুকুট রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ পাঠান জমীদারদিগের হস্তে পড়ে। ইহারা বাড়ীবাথানে বাস করিলেন না, ইহারা কোটচাঁদপুরে বাস স্থান নির্ম্মাণ করিলেন। কোটচাঁদপুর হইতে তাহাদিগকে রণবীর খাঁ (নলডাঙ্গা রাজার আদি পুরুষ) বহিস্কৃত করিয়া দেন এবং মোগলদিগের নিকট হইতে বিস্তৃত জমীদারীর অধিকারী হন। এই নলডাঙ্গা জমীদারী ৩১টী পরগণার সমষ্টি। সেই ৩১টী পরগণার নাম দেওয়া অনাবশ্যক, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, তন্মধ্যে বাড়ীবাথান নামে একটী পরগণা দৃষ্ট হয়। কালের কি শক্তি! এই বাড়ীবাথান একজন স্বাধীন রাজার আবাসভূমি ছিল; তাহার পরও একটী পরগণা বলিয়া পরিচিত ছিল। এক্ষণে উহা একটী ধ্বংসপূর্ণ গ্রাম হইয়াছে। আবার ধ্বংসগুলিও চাকলার কাছারী * নির্ম্মাণার্থে আনীত হওয়ায় সেখান

* মামুদসাহীর জমীদার নলডাঙ্গা রাজার চাকলার সদর কাছারী খিদেদহে ছিল। ১৮৮০ সালে নড়ালের বাবু রামরতন রায় উক্ত জমীদারীর

হইতে সকল চিহ্ন লোপ করিয়া দিয়াছে।

মুকুট রায়ের কার্য্যক্ষেত্র প্রধানতঃ বর্ত্তমান যশোহর ও ফরিদপুরে। কিন্তু বর্দ্ধমান ও নদীয়ার ভিতর তাঁহার অধিকার ছিল। ২৪ পরগণায় ছিল কিনা, জানি না। বোধ হয়, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও ২৪ পরগণার গ্রাম গুলিতে অনুসন্ধান করিলে, নূতন তত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। যেমন পাঠানেরা স্বাধীন হওয়ার যত্ন করিয়াছিলেন, তিনিও বোধ হয় সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সফলমনোরথ হন নাই। তদানীন্তন জাতিভ্রষ্ট ও মোগল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হিন্দুরাই তাহার বিনাশের প্রধান কারণ। রাজপুত্র গাজী উপলক্ষ মাত্র।

উপসংহারে আমরা এই বলিতে চাই যে, ঘোড়ানাচের ভগ্নাবশেষ শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে,দেপালের পর এ অঞ্চলের অবস্থা কতক সময় কিরূপ ছিল, জানা যায়না। এখন বোধ হইতেছে যে, দেপালের অল্পকাল পরেই মুকুটরায়, এবং তৎপরে পাঠান বংশ ও তৎপরে মুকুন্দ রায় সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার পরে সংগ্রাম সাহ। সংগ্রাম সাহার পরে "ছত্রপুর * দিগর" যাহাদিগকে ছয় চৌধুরী বলিত। তাঁহারা নবদ্বীপের পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়াছিল এবং সীতারামের পিতা "উদয়নারায়ণ রায়" নবগঙ্গা নদীর পূর্ব্বাংশে অধিকার ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। সীতারাম শির্ষক প্রস্তাবে এ সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ হইতে পারে।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ সমীপে বিনীত নিবেদন।

ভাই, ভগিনীগণ? তোমরা কি জান না, আমাদিগের কি ভয়ানক নিন্দা উঠিয়াছে! "ব্রাহ্মসমাজে শান্তি নাই! ব্রাহ্মগণ যেরূপ সামাজিক অনুষ্ঠানে রত, তাহার উপযোগী আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে তাহাদিগের নিষ্ঠা নাই! লব্ধজ্ঞান জীবনে পরিণত করিবারজন্য তাঁহাদিগের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা নাই! তাহাদিগের সাহায্যে প্রাণেশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হয় না!" একি অসহনীয় কলঙ্ক!! এ কলঙ্ক দূর করিবার নিমিত্ত যদি তোমরা বদ্ধপরিকর না হও, তবে কিসের জন্য জীবন ধারণ? কি নিমিত্তই বা বৎসর বৎসর উৎসবানন্দ ভোগের এত আয়োজন, এত উদ্যম, এত চেষ্টা! তোমরা কি জান না যে, ভারতবর্ষে ব্রহ্মোপাসনা উপনিষৎ কালাবধি যেরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহা

কতকাংশ খরিদ করেন। রতন বাবু ঝিনেদহ চাকলার কাছারীতে নলডাঙ্গার জমীদারদিগকে আর দখল দিলেন না; এজন্য নলডাঙ্গার জমীদারেরা মহিষাকুণ্ড গ্রামে নূতন কাছারী নির্ম্মাণ করেন। এই কাছারী নির্ম্মাণে বাড়ীবাথানের ভগ্নগুলি আনীত হয়। বোধ হয়,এই কারণে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বাড়ীবাথানের কোন অনুসন্ধান পান নাই।

* ইহাদের নাম হইতে ছত্রপুর গ্রামের নাম হইয়াছে, পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে শত্রুজিৎ পুর বলা হইয়াছে, উহা সম্ভবত ভ্রম। এই ছত্রজিৎ দিগর হইতে শত্রুজিৎ সিংহ পরিবারের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন।

গুপ্ত, ধর্ম্মগ্রন্থ বিশেষে বদ্ধ ও ব্যক্তিগত। যাহাতে ব্রহ্ম সন্তানগণ মিলিত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ও মুক্ত ভাবে, অর্থাৎ জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও কোন একবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্র নির্ব্বিশেষে পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আপনাদিগের উন্নতিশীল নিত্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তাহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। তোমরা কি জাননা যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সারসংগ্রহ" ও "ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থান, কাল, গ্রন্থ, ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে। যাহা যখন, যেথানে ও যাহাতে সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।" তোমরা কি বিদিত নও যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম মার্জ্জিত-বুদ্ধিসম্পন্ন উন্নতমনা ও প্রেমিক হৃদয়বান ঋষিদিগেরই গ্রহণোপযোগী ধর্ম্ম।" আর "ঋষিজীবন স্থান, কাল ও সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে, সকল দেশে ও জাতিতে উহা দৃষ্ট হয়। যিনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া মঙ্গলময়ের সত্য, নিত্য, মঙ্গলপূর্ণ অভয় চরণে বাস করিয়া আপনার শরীর মনের সুস্থতা ও নির্ম্মলতা ও তাঁহার জ্ঞান, জ্যোতি, আনন্দ, অমৃত, শান্তি, মঙ্গল, পবিত্রতা ও শোভা ভোগ করেন; আর পরের নিত্যোন্নতি ও মঙ্গল সাধনে যত্নশীল থাকেন, তিনিই ঋষি।" ঈদৃশ মহৎ, উদার, ব্যাপক, উন্নতিশীল ও নিত্য ব্রাহ্মধর্ম্মানুগত জীবনে শান্তি নাই? সে জীবন লব্ধ সত্যে সত্যময় হয় না? তাহাতে ব্রহ্মযোগ সাধন হয় না? একি ভয়ানক কথা! এ দুর্ব্বিষহ শোচনীয় কলঙ্ক কেন উঠিল! ইহারই জন্য যে দেখিতেছি, আমাদিগের কতিপয় ভ্রাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি, বীতরাগ হইয়া নিজ নিজ নিত্য মঙ্গলোন্নতি সাধন নিমিত্ত উপায়ান্তর গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন! আর কত ভ্রাতৃগণ যে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, কে জানে? ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ এই বিষম নিন্দাবাদের কারণ একবার অনুসন্ধান করুন দেখি। আমার যেন মনে হইতেছে যে, আমরাই ইহার কারণ। আমরা কি পবিত্র ও উন্নত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি? আমারা কি বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু ও তৃণের ন্যায় বিনীত হইতেছি? আমরা কি আমাদিগের পাশব জীবনকে দেব জীবনে পরিণত করিতে পারিতেছি? আমরা কি প্রাণেশ্বরের বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম নাম সদা জপ করিয়া থাকি? কি গৃহে, কি বাহিরে, কি স্বজনে, কি নির্জ্জনে, কি কার্য্যালয়ে, কি উপাসনালয়ে, কি শয়নে, কি স্বপ্নে, কি ইচ্ছানুসারে, কি অভ্যাসগুণে, কি আহারে কি বিহারে আমরা কি তাঁহার শত শত নামের মধ্যে কোন না কোন প্রাণের প্রিয় নাম স্মরণ বা মনন করিয়া থাকি? প্রাণেশ্বরের নাম-সুধা কি আমরা আমাদিগের প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করিয়া থাকি? তাঁহার সর্ব্বত্র সর্ব্ব কালীন বিদ্যমানতা ভোগ জন্য কি আমরা ব্যাকুলিত হইয়া থাকি! অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় আমরা কি আমাদিগের নয়ন, মন, প্রাণ তাঁহার পবিত্র ও মঙ্গলপূর্ণ চরণে স্থির রাখিবার অভ্যাস করিতেছি? আমাদিগের অশন, বসন, ও আহারীয় দ্রব্যাদি কি আমাদিগের শরীর মনের সুস্থতা ও পবিত্রতা সম্পাদনের উপযোগী? আমাদিগের দৈনিক জীবন কি সুনিয়মিত ও সুশাসিত? আমরা কি আমাদিগের অহংজ্ঞান দূর করিবার জন্য প্রাণেশ্বরের নিকট এই বলিয়া দিবানিশি প্রার্থনা

করিয়া থাকি যে, "ইচ্ছা, জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা ও চিন্তা বাক্য, কার্য্য, ও ব্যবহার, সকলই সম্পূর্ণরূপে ও নির্ব্বিশেষে তব পবিত্রতম চরণাধীন কর।" আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর আমাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই দিতে সাহসী হইবেন না। এত দিনের পর আমরা এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থায় দণ্ডায়মান হইলাম! এত ব্রহ্মোপসনা, এত ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন করিবার পরও আমাদিগের এই দুর্ব্বিষহ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল!! হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়, প্রাণ যে ফাটিয়া যায়!! প্রাণের ভাই শিবনাথ, রামকুমার, নগেন্দ্র, উমেশ, গৌরগোবিন্দ, উমানাথ, ত্রৈলোক্য ও হেমচন্দ্র, তোমরা থাকিতে আমাদিগের এ বিষম দুর্দ্দশা কেন ঘটিল? তোমরা যে আমাদিগকে পিতার নিত্য আনন্দধামে আস্তে আস্তে লইয়া যাইবার জন্য, আমাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে তোমাদের পবিত্র আকর্ষণে আকর্ষণ করিবার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছ। তবে কেন আমাদিগের এ পাষাণ-ভেদী আর্ত্তনাদ করিবার দুর্গতি হইল? তোমরা কি তোমাদের গুরুভার বহনে শিথিল-যত্ন হইয়াছ? তোমাদের বিবেক শক্তি এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়, শোন দেখি? তোমাদিগকে দেখে শুনে যে আমরা বল পাব। তোমরা কি ভক্ত জীবনের সংগৃহীত সুধা আমাদিগকে ভাল করিয়া পান করিতে দাও? তোমরা কি তাহা তোমাদের প্রাণ-গত যত্নে সংগ্রহ করিয়া থাক? প্রাণনাথের সঙ্গে আমাদিগের যোগসাধনের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উত্থান করা যাহাতে আমাদিগের অভ্যাস হয়, তোমরা তাহার উপযোগী সহায়তা আমাদিগকে করিতেছ না কেন? তোমাদের জীবনের প্রভা আমাদের জীবনে প্রতিভাত হয় না কেন? সম্মানীয় ভ্রাতা রাজনারায়ণ বসুর "ব্রহ্মসাধন" গ্রন্থখানি তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা পাঠ করিতে বল না কেন? তোমরা কি জান না "পবিত্রস্বরূপের পবিত্রতম চরণ ছাড়া হইলেই জীবন নিশ্চয়ই অপবিত্র হইবে"? আমাদিগকে তাঁহার পবিত্রতা নিরন্তর ভোগের জন্য সহায়তা কর না কেন? যে উপয়াবলম্বনে আমরা তাঁহার পবিত্র সত্ত্বা-সাগরে অবিচ্ছেদে মগ্ন থাকিতে পারি, তাহা পাইবার জন্য তাঁহার নিকট কি অনন্যগতি হইয়া ব্যাকুলিত প্রাণে ক্রন্দন কর? তদ্বিষয়ে তাঁহার উত্তর-বাণী কি শুনিয়াছ? তোমাদিগকে আর কত বলিব! তোমরা থাকিতে আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইতে চলিল!!

শ্রদ্ধাস্পদ প্রধান আচার্য্য মহাশয়! যে ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির জন্য আপনি চল্লিশ বৎসরাবধি প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন; প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয়, নানা ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা, ঘোরতর তর্ক বিতর্ক, নানা সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন, নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ, বহুবিধ লোক নিন্দা ও স্বার্থত্যাগ জনিত দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিলেন ও প্রগাঢ়তর রূপে হৃদয় ও মস্তিষ্ক চালনা করিলেন এত দিনের পর আপনার প্রাণের সেই প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের নামে পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বিষহ কলঙ্ক উঠিল!! আপনি কি এই নিদারুণ কথা শুনিবার জন্য জীবিত আছেন! কোথায় আপনি আপনার জীবনের শেষাবস্থায় আপনার বহু দিনের পরিশ্রম, কষ্ট ও আন্তরিক যত্নের মধুময় ফললাভ ব্রাহ্মদিগে

জীবনে ভোগ হইতেছে, ইহাই শুনিবেন, কোথায় আপনি আপনার দীর্ঘ জীবনের উন্নতি ও মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের উন্নতি ও মঙ্গল লাভের কথা অবগত হইয়া প্রভূত আনন্দ ভোগ করিবেন; কোথায় আপনি দেখিবেন যে, বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মযোগ সাধনে সমর্থ হইতেছেন ও তজ্জনিত তাঁহাদিগের হৃদয়ের গভীর দেশে তাঁহারা নিত্য শান্তি,আনন্দ, পবিত্রতা ভোগ করিতেছেন; কোথায় ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মপ্রীতি-শৃঙ্খলে দিন দিন অধিকতর বদ্ধ হইবেন; কোথায় তাঁহারা "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরস পান" করিয়া ব্রহ্মসত্ত্বা সাগরে আমাদিগের মন প্রাণ সদা নিমগ্ন রাখিতে সমর্থ হইবেন; কোথায় তাঁহারা ঋষিদিগের অবলম্বিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে ঋষিগণ সম তাঁহাদিগের দেহ মন প্রাণ পবিত্র করিয়া নিত্য শান্তি, আনন্দ ও মঙ্গল ভোগ করিতে করিতে দুর্ব্বলমনা ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে ব্রাহ্মসমাজের শান্তিময় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবেন; না বিচ্ছিন্নতা, একদেশ-দর্শিতা, সাধারণ মঙ্গলজনক বিবিধ কার্য্যে যত্ন-শিথিলতা, অপ্রসারিত প্রেম ও ব্রহ্মসন্তানগণের নিত্য ভোগ্য লব্ধ ধন বিতরণে অনুদারতা!! হায়! হায়! এ দুর্দ্দশা কেন ঘটিল? অহো! এই অনিত্য অমঙ্গলের মূলে দেখিতেছি, সেই নিত্য মঙ্গলময়ের মঙ্গলপূর্ণ হস্ত। তিনি এই অনিত্য অমঙ্গল নিত্যমঙ্গলে পরিণত করিবেন বলিয়াই এত বিয়োগ, এত শোক বিলাপ! আর্য্য! আপনি অধিকতর জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা লাভের জন্য আর কিছু দিন আমাদিগের নিকট এই মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিতি করিবেন। আপনার সেই নূতন লব্ধ জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা আপনি একা কখনই ভোগ করিতে পারিবেন না। আপনার উদার ও প্রসারিত প্রেম, ঐ নূতন লব্ধ ধন আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের মধ্যে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতে আপনাকে বাধ্য করিবে। ইহা ধ্রুব ও অচল সত্য। ইহার অন্যথা কখনই হইবে না। আর্য্য! এক্ষণে আপনার নূতন গুরু ভার বহনে যত্নযুক্ত হউন। দেখিবেন, আমরা যে সকল সত্যমূলক জ্ঞান ব্রাহ্মসমাজে লাভ করিয়াছি ও করিব, তাহা যেন আমাদিগের জীবনে পরিণত হয়, তাহা যেন জীবন্ত ভাবে আমাদিগকে ধর্ম্মের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উত্থিত করিতে থাকে। এই অতি প্রার্থনীয় ফললাভ হয় নাই বলিয়াই প্রাগুক্ত নিন্দাবাদের অশ্রান্ত রব আমাদিগের কর্ণগোচর হইতেছে। অতএব আপনি আপনার কর্ত্তব্য জ্ঞান ও প্রেমানুরোধে আপনার অতি যত্নের ও প্রাণসম প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক মোচনে কৃতসঙ্কল্প হউন। আবার বলি, যাহাতে আমাদিগের বারম্বার লব্ধ জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার স্থায়ী ভাব আমরা আমাদিগের জীবনে ধারণ করিতে সমর্থ হই, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে আপনার শ্রেয়স্কর সহায়তাপ্রদানে যত্নশীল হউন।

হে নিত্যমঙ্গলময়! তোমার মঙ্গলের গভীরতর ভাব মানব কি বুঝিবে, তোমার সন্তানগণ প্রকাশ্যরূপে জাতি, বর্ণ, ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তোমার শান্তি ও অমৃতময়, আনন্দ ও মঙ্গলপূর্ণ পবিত্র ও শোভনতম চরণ পূজা করিয়া তাহাদিগের দেহ মন প্রাণ সার্থক করিবে বলিয়া তুমি এই মহানগরীতে ৫৮ বৎসরাধিক হইল ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছ। এই দীর্ঘকাল তোমার কত কত সন্তান ইহার আশ্রয়ে

থাকিয়া কতই উন্নতি ও মঙ্গল ভোগ করিয়াছেন। আমরাও পুনঃ পুনঃ তোমার নিত্য মঙ্গলময় চরণে গভীরতর গভীরতর সত্য প্রেম ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। কিন্তু সে সকল তব অনুপম স্নেহ বর্ষণ আমাদিগের ক্ষীণ হীন মন প্রাণে অনুক্ষণ ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না বলিয়া, আমরা আমাদিগের জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করিতে পারিতেছি না। আমরা আজও বাসনার ঘূর্ণায়মান জলে ঘূর্ণিত হইতেছি! আমরা এখনও অক্রোধী, অকামী ও নির্লোভী হইতে পারিলাম না! আমাদিগের অহং ও ভেদাভেদ জ্ঞান আমাদিগকে কতই অসত্য, অন্ধকার ও মৃত্যুতে লইয়া যায়! তোমার জন্য আমরা প্রশান্ত চিত্তে এই অনিত্য সংসারের অনিত্য অমঙ্গলের স্রোতে অবাত-কম্পিত দীপশিখার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতে পারি না! প্রাণনাথ, এই দুর্ব্বিষহ দুঃখ আর যে প্রাণে সহ্য করিতে পারি না। তুমি জান, এই জন্য, কি আর কোনও কারণে আমাদিগের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের প্রাণের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক উঠিয়াছে। তুমিই জান, কিদৃশ অমঙ্গল হইতেছে। তব মঙ্গল গুণে তুমি এ অমঙ্গল হইতে মঙ্গলই উদ্ভাবন করিবে! কিন্তু আমরা যে অতি দুর্ব্বল! আমাদিগের দুঃখ হইলে আমরা তোমার নিকট কাঁদিব না ত আর কাহার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিব! কে আমাদিগের উপস্থিত দুঃসহ যাতনা দূর করিবে! কাহারও সাধ্য নাই। প্রাণনাথ, তোমার এ কাঙ্গাল সন্তানগণের প্রতি সদয় হও, সদয় হও। তোমার ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান কলঙ্ক দূর কর, আমাদিগকে তব পবিত্র ও শোভনতম মঙ্গল পূর্ণ চরণে অবিচ্ছেদে থাকিবার জন্য তব অমোঘ সাহায্য প্রদান কর। তব মঙ্গলময়ী ইচ্ছা আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনে পূর্ণ হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীকানাই লাল পাইন।

ইন্দ্র-চন্দ্র সংবাদ।

যাত্রা।

ভাই! ভারতের অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি; এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমাজ মধ্যে বিভিন্ন ভাব দেখি নাই। আসামের শেষ সীমা ডিহিং নদীর অপর পার হইতে কচ্ছ দ্বীপ পর্য্যন্ত, এবং হিমালয়ের কোল হইতে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত যে যে স্থান পরিদর্শন করিয়াছি, সর্ব্বত্র সেই এক হিন্দু, মুসলমান, সেই এক প্রকার লোকের ভাব—সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; সেই শিয়া সুন্নি মোল্লা হেদাতি; সেই মঠ, মন্দির, শিব, গণেশ; সেই দরগা, মসজিদ, পীর, প্যাগম্বর। সুতরাং ভারতবর্ষ পর্য্যটনে ভারতীয় ভাবে লোক চরিত পরিজ্ঞান ও নানারূপ অবস্থাবগত হওয়ার জন্য বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ হয় বটে; কিন্তু আমাদের সম্মুখে এমন অভিনব কিছু উপস্থিত হয় না, যাহা দেখিতে আমরা একেবারে অনভ্যস্ত বা সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত। এই কারণে, অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালীর মনে, ইউরোপ ভ্রম-

দের—পাশ্চাত্য লোকমণ্ডলীর রীতি নীতি কাণ্ড কারখানা দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিবার বাসনা স্বতঃই জাগিয়া উঠে। বহুকাল হইতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, একবার এ দেশে কিছুদিন বাস করিয়া যাই। নানা কারণে উহা ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে তোমাদের কল্যাণে ও বিধাতার বিশেষ কৃপায়, কোন প্রকারে শরীরটা লণ্ডনে আনিয়া ফেলিয়াছি। (মনটা অনেকদিন হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ফিরিয়াছে।) পথের বৃত্তান্ত শুনিতে উৎসুক আছ, প্রথমে তাহাই শুনাইব।

বিগত ২৩শে জানুয়ারি তোমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া কলিকাতায় আসিয়া অনৈক গ্রাজুয়েট বন্ধুর উপলক্ষে একটী কালেজের বাসায় আশ্রয় লই। এই স্থলে কতকগুলি ভদ্রলোকের কথা না উল্লেখ করিলে নিতান্ত অভদ্রতা ও অকৃতজ্ঞতা হয়। ইঁহারা সকলে উক্ত বাসায় ছিলেন। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক। এই যুবাদল আমাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন। ইঁহাদের সরল প্রেম ও বিশেষ শ্রদ্ধা আমি কখন ভুলিতে পারিব না। নিঃস্বার্থ প্রীতি সম্বন্ধে এই উন্নত যুবকদলের কাছে আমি অনেক উপদেশ পাইয়াছি। কয়দিন ইঁহারা পড়া শুনা ছাড়িয়া সর্ব্বদা আমাকে লইয়া থাকিতেন। ২৮শে তারিখ সন্ধ্যার সময় সকলে হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া আমাকে মেলট্রেনে তুলিয়া দেন। এই দ্বাদশটী যুবার কথা আমি যখন মনে করি, তখনই আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসে। প্রেমময়ের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এই প্রেমের পুতুল কয়টীকে আরও উজ্জ্বল রূপ প্রদান করুন। ইঁহাদের প্রেম-জ্যোতিতে বঙ্গদেশ আলোকিত হউক।

গাড়ীতে ৬১ঘণ্টা কাটাইয়া ৩১শে তারিখ প্রাতে ৯টার সময় বোম্বাই ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছি। পথে দুই জন মাত্র ইংরেজের সহিত আলাপ হয়। মেথডিষ্ট চর্চ্চের অধিনায়ক বিখ্যাত রেভারেণ্ড থোবর্ণ ও বোম্বাই পাইলট সার্বিসের ইউরিজ। পাদরি থোবর্ণের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। প্রতাপ বাবুর "প্রাচ্য খ্রীষ্ট" Oriental Christ" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন "Mr Mozoomdar has taken a wrong view of Christ "প্রতাপ বাবু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন" "Christ lives among us as a reality, but the other saints and great men do not"—"খ্রীষ্ট প্রকৃত সত্তারূপে আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন; অন্যান্য সাধু ও মহাত্মাগণ নয়।" তাঁহার কথার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিলাম—"আমি ত সাহেব এই বুঝি—যে-খানে পিতা সেখানে পুত্রের নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা পিতা বলিয়া সম্বোধন করে কে? পিতা যখন নিত্য, তখন পুত্রের নিত্যতা অনিবার্য্য।" এই কথাতে সাহেব হাসিয়া বলিলেন "ঠিক, এ ভাব তুমি কোথা হইতে পাইলে?" আমি বলিলাম "আমার স্মরণ হয় না, ইহা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি, বোধ হয়, ইহা আমার নিজের।"

বোম্বাই নগরে এক রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন ১লা ফেব্রুয়ারি বেলা ৪টার সময় ইটালির ষ্টিমার সিঙ্গাপুরে উঠিলাম। কলিকাতায় যখন কুকের বাড়ী একেবারে লণ্ডন পর্য্যন্ত টিকিট কিনি, তখন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, এক জনের

একটী ক্যাবিন যেন আমার জন্য ঠিক করা হয়। কিন্তু তাহা হয় নাই, কারণ প্রত্যেক ক্যাবিনে দুই বা ততোধিক জনের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। বন্দর হইতে নৌকাযোগে জাহাজে যাইবার সময় বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, কি প্রকারে এক ক্যাবিনে ইউরোপীয়ের সহিত বাস করিব! বিধাতার কৃপায় জাহাজে গিয়া দেখি, প্রথম শ্রেণীতে ১০।১২ জন মাত্র যাত্রী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমি একা—কোথায় একটা ক্যাবিনের জন্য ব্যস্ত ছিলাম, এ দিকে সমস্ত সেকেণ্ড ক্লাস আমার জন্য "রিজার্ভ।" সেইদিন পি এণ্ড ও কোম্পানির মেল ছাড়াতে অনেক লোক উহাতেই যায়। সুতরাং আমাদের জাহাজ খালি। জাহাজে সমস্ত কর্ম্মচারী ইটালীয়, এক জন অফিসার ব্যতীত আর কেহ ইংরেজী জানে না। বিষম ফাঁফরে পড়িলাম—আমি যাহা বলি কেহ বুঝে না, উহারা যাহা বলে আমি কিছু বুঝি না। আফিসরটীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর তিনি আপনার কাজে গেলেন। ডেক প্যাসেঞ্জর ৮ জনই ভারতীয়, ৬ জন কাটিয়াওয়াড় প্রদেশের বৈষ্ণব ও জৈন বণিক, এক জন শ্রীহট্টের বৃদ্ধ খালাসী ও তাহার পুত্রবধূ। ইহারাই তখন আমার দেশের লোক হইল। ৪॥০ টার সময় জাহাজ ছাড়িল, বাতাসও ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিল, শেষে আহারের সময় এমন তুফান যে, কিছুমাত্র উদরস্থ করিতে পারিলাম না। ক্যাবিনের দরজায় ডেকের উপরে চেয়ার লইয়া বসিলাম। ষ্টুয়ার্ড এক খানা রুটী ও ৪টা কলা আনিয়া দিল, তাহাই খাইলাম। ডেকের উপরে ঢেউ আসিয়া আরোহীগণের সমস্ত ভিজাইয়া দিতে লাগিল। যাত্রীদের সমূহ কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হইল, কিন্তু উপায় নাই, আমাদের সেলুনে বহু স্থান থাকিতেও তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে পারিলাম না। রাত্রি ৮ টার সময় ক্যাবিনে গিয়া শুইলাম।

পরদিন প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া দেখি, জল স্থির, যেন সে সমুদ্রই নয়। কাফি খাইয়া সম্মুখের উপর ডেকে গিয়া বসিলাম। চারিদিকে অকূল পাথার দেখিয়া চিত্ত পুলকিত হইল। খনিক হু হু করিয়া চক্ষের জল ফেলিলাম। যখন প্রাণ ঠাণ্ডা হইল, তখন একটী গান বাঁধিয়া মনের আনন্দে গাইলাম। গানটী এই—

রাগিনী কানাংড়া—তাল একতালা।

নাচিছে হৃদয় হে হরি, তোমার কৃপা-
সুধা পানে।
কাঙ্গাল ব'লে কত দয়া করিলে হে এ
জীবনে॥
কল্পনায় ভাবিলাম যত, দেখাইলে কত শত,
আবার যে দেখাও হে কত, আর ত দেখিতে
পারিনে॥
উথলি হৃদয় ফুয়ারা. চক্ষে বহে প্রেমধারা,
অন্ধ হ'লাম আঁখি নীরে, আর যে সুঝে না
নয়নে॥
যখন যা চেয়েছি প্রাণে, দিয়েছ হে
সংগোপনে,
কখন বঞ্চিত প্রভু কর নাই এ পাপীজনে॥
সমুদ্র বিহার বাসনা; বহুদিনের কামনা
ভেবে ছিলাম লয় হইবে, পুরিবে না কোন
দিনে।
(শেষে) অসম্ভব করিয়ে সম্ভব, পূরা'লে
দাসের অভাব,
পাঠা'লে সমুদ্র পারে দুঃখী ভারত সন্তানে॥

(একবার) বিধান নিশান উড়াইয়ে, ভ্রাতা
বন্ধু সঙ্গে লয়ে,
সমুদ্র মন্থন করিয়ে যা'য় হে অর্ণবযানে;
শেষ বাসনা এ সংসারে, পুরা'বে কি দয়া
ক'রে,
কাঙ্গাল চন্দ্রের এই ভিক্ষা নাথ তব
শ্রীচরণে॥

কয় দিন জাহাজে এক ভাবে কাটাইয়া ৭ই তারিখ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আদেন (এডেন) বন্দরে পৌঁছিলাম। এ জীবনে কখন উদ্ভিদহীন পাহাড় দেখি নাই। এডেন প্রবেশ করিবার সময় ঐরূপ মরু পাহাড় দেখিয়া প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। পাহাড় অনেক দেখিয়াছি, এ পাহাড় দেখিয়া প্রাণ হু হু করে কেন? খানিকক্ষণ কিছু বুঝিতে পারি না; শেষে টের পাইলাম, এরূপ বিশ্রী শুষ্ক পাহাড় এই প্রথম দেখিতেছি বলিয়া এরূপ হইতেছে। আমরা যে সময় বোম্বাই ছাড়ি, তখন সেখানে ওলাউটার প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া আমাদের জাহাজ (Quarantine) কোয়ারাণ্টাইনের ভিতর ছিল, অর্থাৎ আরোহীগণ ইচ্ছামত কোন বন্দরে নামিতে পারিবেন না, কোন নিয়মিত সময় ঘাটে একখানি জাহাজে বাস করিয়া পরে গম্য স্থানে যাইতে পারিবেন। এই কারণে কোন বোট জাহাজের নিকট আসিল না, যাত্রীগণকে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া নামিতে হইল। ভারতীয় লোকগুলি চলিয়া গেল, আমার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। এই কয় দিনে লাটিনের সাহায্যে ইটালীদের কথা, বার্ত্তা কতক বুঝিতে ও দুই একটা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। ফল কথা, এক দিনও কোন বিষয়ের জন্য তিলমাত্র ক্লেশ পাইতে হয় নাই; বিধাতার কৃপায় প্রথম হইতেই কাজ চালাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

৮ই প্রাতঃকাল—উঠিয়া দেখি জাহাজে মাল বোঝাই হইতেছে। তীর হইতে ডোঙ্গায় করিয়া খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণকায় কাফ্রিগণ জাহাজের নিকটে আসিল। তাহারা ডুবুরি। সিকি, দোয়ানি সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে তাহারা ডুব দিয়া মুখে করিয়া তোলে।

এডেন হইতে সাক্কোনি নামক একজন ইটালীয় যুবক জেনেয়ো যাইবার জন্য সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিল, এখন হইতে দুইজন হইলাম। ৮টার সময় জাহাজ ছাড়িল। ৩া০টার সময় বাব্ দরওয়াজা (বাবেল মাণ্ডেব প্রণালী) প্রবেশ করিলাম। ইহা লোহিত সাগর প্রবেশের দ্বার। দুই ধারে প্রবল প্রতাপ ইংরেজের দুই আড্ডা। বামদিকে পেরিম দ্বীপে রীতিমত কেল্লা। দুই দিক হইতে নিশান দ্বারা প্রশ্ন হইল, আমাদের কাপ্তেন ৪।৫ টা নিশান উড়াইয়া আপনার জাহাজের সম্যক পরিচয় দিল। ভাই দেখ, পথ কেমন সুরক্ষিত, কোন দিকে ফাঁক পাইবার জো নাই। যত জাহাজ লোহিতসাগরে প্রবেশ করিবে, বা উহা হইতে বাহির হইবে, সকলকে পরিচয় দিতে হইবে; এবং পরিচয় পাইবামাত্র এডেনের রেসিডেণ্টের নিকট তারে সংবাদ যাইবে। ইউরোপ হইতে ভারত যাইবার পথের দ্বার গুলির চাবি সমস্ত ইংরেজের হাতে। গোপনে কাহারও যাইবার যো নাই। পেরিম একটী ক্ষুদ্র মরুদ্বীপ। শুনিলাম, অনেকগুলি বোম্বাইবাসী ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে। ৫।৬ শত লোকের বাস। প্রণালীর দুই ধারের দৃশ্য অতি ভয়ানক ভীষণ উদাস ভাব। (ক্রম

ধর্ম্ম ও সমাজ।

পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীর লোকই পৌত্তলিক ছিল। পৌত্তলিকতার সৃষ্টিকর্ত্তা বোধ হয় বেদ-প্রণেতা ঋষিবংশ, কারণ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বেদকেই মনুষ্যের আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জার্ম্মাণি, ফরাসী, রুস প্রভৃতি আজকালকার উজ্জ্বল রাজ্য সকল যখন অরণ্যময়, তখন ইউরোপে গ্রীস দেশ সুসভ্য। তাঁহারা জুপিটার (ইন্দ্র) প্লুটো (যম) প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজা করিতেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠিতা ডায়ানা (কালী) দেবীর কৃপা পাইবার জন্য যুদ্ধার্থীরা কত বলি ও পূজা দিতেন।

ইজিপ্টে যখন ফ্যারোয়াদিগের রাজত্ব, তখন ইজিপ্টবাসীগণ ঘোর পৌত্তলিক, অতি তদ্গদচিত্তে গোবুরে পোকার পর্য্যন্ত পূজা করিত, অথচ সে সময়ে তাঁহারা পাশ্চাত্য প্রদেশের সভ্যতার আদর্শ ছিলেন; তাঁহাদিগের সময়ের পিরামিড সকল এক্ষণও পৃথিবীর বিস্ময়জনক।

এসিয়ায় তখন পৌত্তলিকতার ঘোরতর প্রাদুর্ভাব। এক্ষণ আমরা যাহা দেখিতেছি, ইহা অপেক্ষা সেই সময়ে মূর্ত্তি পূজার শতগুণে অধিক বিস্তার হইয়াছিল। কিন্তু এই এসিয়া হইতে যে পৌত্তলিকতার প্রথম সূচনা হয়, আবার এই এসিয়া হইতেই তাহার ক্ষয় হইয়াছে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক এ বিষয়ের দর্শক মাত্র।

যিশুর জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে পৌত্তলিকতায় যখন দেশ একেবারে প্লাবিত, গো বরাহ মীন ইত্যাদি ইতর জন্তুর পূজায় সমস্ত জনপদ আচ্ছন্ন, তখন কপিলবস্তু নগরে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি অতি প্রখর মস্তিষ্ক ও উন্মাদিনী বক্তৃতার প্রভাবে ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, চীন ও জাপান হইতে মূর্ত্তিপূজা নিষ্কাশিত করিয়া, "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"—অহিংসা যে পরম ধর্ম্ম, ইহা প্রচার করেন। * কিন্তু ইহাতে অবশিষ্ট পৃথিবীর কোন সংস্কার হয় নাই, তাহারা যে পৌত্তলিক, সেই পৌত্তলিকই ছিল। বুদ্ধের পাঁচ শত বৎসর পরে, জেরুজ্যালেমের অন্তর্গত বেতহেলেম নগরে মহাত্মা যিশু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মহিমায় ইউরোপের পৌত্তলিকতা লুপ্ত হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার স্বদেশ তুরস্ক ও আরব তাঁহার যুক্তি সকল গ্রহণ করিল না; তথায় যিশুর অপেক্ষা তেজস্বী মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা রহিয়া গেল।

মুসলমান ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে মানব জাতির আদি পুরুষ আদম হইতে ৬৭৫০ বৎসর পরে, ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে আব্দাল্লার ঔরসে সৈমানার গর্ভে মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়া মক্কানগর পবিত্র করেন। তখন আরব তুরস্ক ঘোর পৌত্তলিকতায় নিমগ্ন। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ কাবামন্দিরের ৩৬০টী দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া, মাতৃভূমিতে মুসলমান ধর্ম্মের মুক্ত পতাকা উড্ডীন করেন। সুতরাং সেই হইতে

---

* আজ প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) প্রচারক কমটি সভ্য জগতের পূজ্য, কিন্তু তাঁহার জন্মের অনুমান দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে ও ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

আরব দেশে হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়। ভারতবর্ষে যে মুসলমানেরা আছেন, ইঁহারা সেই হিন্দুদিগের বংশাবতংস, এরূপ অবস্থায় এই ভারতবর্ষীয় জাতিকে "হিন্দুজাতি" শব্দ দ্বারা অভিহিত করিলে শব্দটা মিথ্যা হয় না।

হিন্দু ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের পার্থক্য এই যে, (১) মুসলমান ধর্ম্মে মূর্ত্তি পূজা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ; (২) কোন প্রকার জাতিভেদ নাই; (৩) স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির বিবাহ-স্বাধীনতা তুল্য। রোজা, নামাজ ও কল্মার প্রতি যদিও মুসলমান সমাজের আস্থা আছে, কিন্তু উহার অপালনে কাহাকেও সমাজচ্যুত বা অন্য প্রকারে দণ্ডিত হইতে দেখি নাই। ত্বকচ্ছেদ ও কর্ণবেদ কোন গণনার মধ্যে আনিবার যোগ্য নহে, কারণ শিক্ষা বিস্তারের সহিত এই নৃশংস প্রথাটী অবশ্যই অন্তর্দ্ধান হইবে। যদি শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান সামর্থ্য সত্ত্বে এই সকল পাশব ব্যবহারের পোষকতা করেন, তাহা হইলে বুঝিব, বিদ্যা শুষ্ক কাষ্ঠের উপর পতিত হইয়াছে।

মুসলমান ধর্ম্মে বরাহ ও যে সকল জন্তুরা নখের দ্বারা আহার গ্রহণ করে, তাহার মাংস ভোজনের নিষেধ আছে। কিন্তু চিংড়ী মাছে নখের দ্বারা আহার গ্রহণ করে, উহা প্রচলিত আছে। জীবিত গো বধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন হিন্দু জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই, কিন্তু মুচীরা মরা গোরুর ছাল তুলিবার সময় যদি সেই মৃতদেহটা অরুগ্ন বা অপর্য্যুষিত দেখে, তাহা হইলে তাহার কিছু লইয়া খাইয়া থাকে। মুসলমানেরা গোরু জবাই করিয়া ছালের সহিত মাংসাংশ দিলে মুচী তুষ্ট হয়। কাওরা, মুচী, চাড়াল, পোদ ও বাঁশ কোড়া এই কয়েকটা হিন্দু জাতি শূকর মাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু সামাজিক ভোজনে দেয় না, ও কাওরা ভিন্ন অন্য কোন জাতি উহার ব্যবসায় করে না। হিন্দু বেদে ও বুনা জাতি কুক্কুট, বাদুর, শৃগাল ও মূষক মাংস ভক্ষণ করে। অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই আহার বিষয়ে যথেষ্ট উদারতা আছে, বরঞ্চ মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর নিষেধ বিধি অল্প ও শিথিল।

হিন্দু মুসলমানের যে তিনটী গুরুতর পার্থক্যের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার একটীও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিদ্যমান নাই, কিন্তু তথাপি মুসলমানেরা ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইলেন না; ইহার কারণ কি,?

(ক) ব্রাহ্মেরা বরাহ মাংস ভোজনে আপত্তি করেন না। ইউরোপ প্রত্যাগত মুসলমান বিলাতে বরাহ মাংস ভোজন করেন, এই সন্দেহে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। অথবা,

(খ) ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ উচ্চক্ষেত্রে অবস্থিত, মুসলমান সমাজ তদপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত। উভয়েই নিরাকার একেশ্বরবাদীত্ব বশতঃ যে অভিন্ন সাম্য ভাবাপন্ন, মুসলমান সমাজ তাহা পরিগ্রহ করেন নাই। কিংবা,

(গ) হিন্দু সমাজের ধর্ম্মযাজকগণ যেমন পরিবর্ত্ত বিরোধী, মুসলমান সমাজের ধর্ম্মযাজকগণও সেইরূপ; তাঁহারা মুসলমান সমাজকে সজোরে চাপিয়া রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিতে দেন নাই। কিংবা,

(ঘ) মুসলমানদিগের আরবী ভাষায় উপাসনা করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু ব্রাহ্মের মাতৃ ভাষায় উপাসনা করিয়া থাকেন।

বরাহ মাংস যখন পৃথিবীর বহুসংখ্যক লোকের তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ, তখন মুসলমানগণ কালক্রমে এ আপত্তি পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। মুসলমানদিগের মধ্যে আমিরআলি, বদরুদ্দিন তয়াপজী প্রভৃতি কতকগুলি ব্যক্তি শিক্ষায় ও সভ্যতায় ব্রাহ্মদিগের সমশ্রেণীতে উঠিয়াছেন, আরও কতকগুলি লোক এইরূপ উন্নতিলাভ করিলে মুসলমানের নিম্নক্ষেত্রের দোষ দূরীভূত হইবে। ধর্ম্মযাজকদিগের পরিশুদ্ধি হওয়াটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কারণ তাঁহারা কেবল যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া সামান্য একদেশদর্শী জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন : যদি তাহারা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও রাজকীয় ব্যবস্থা সকল পাঠ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমদর্শী হইতে পারেন। ধর্ম্মযাজক শোধিত হইলে আরবী ভাষারও প্রাদুর্ভাব কমিতে পারে।

ভাষা বিশেষের প্রতি অপরিসীম আসক্তির দোষ যে কেবল মুসলমান সমাজকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, এমন নহে, হিন্দু সমাজেও ঐ দোষ সম্পূর্ণ প্রবল দেখা যায়। হিন্দু ধর্ম্মযাজকগণ সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলেন, ঐ ভাষায় উপাসনা করিলে ঈশ্বর না কি শীঘ্র প্রসন্ন হন ; আরবি ভাষা সম্বন্ধেও মুসলমানদিগের সেইরূপ বিশ্বাস, কিন্তু এ সকল বিশ্বাস অত্যন্ত অলীক, বিশেষতঃ যে ভাষা তোমার নিজের বোধগম্য নহে, তুমি গালি দিতেছ কি স্তব করিতেছ তাহা নিজেও অবগত নহ, কোন্ বিশ্বাসে এরূপ ভাষায় ভজনা করিতে চাও, কাহার ভয়ে নিজের স্বাভাবিক ভাষা পরিত্যাগ কর? রোগে, শোকে, বিপদে সন্তাপে তুমি যে ভাষায় বিলাপ করিয়া থাক, তাহাই তোমার হৃদয়ের ভাষা—মাতৃভাষা ; সেই ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় উপাসনা করা কদাচ বিধেয় হইতে পারে না। উপাসনা মন্ত্র যে ভাষায়ই রচিত থাকুক না কেন, তাহাকে মাতৃ-ভাষায় অনুবাদিত করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

কেহ হয়ত বলিবেন যে, ব্রাহ্মগণ নানা প্রকারে মুসলমানদিগের তুল্য হইয়াও যখন মুসলমানকে পাইলেন না, তখন হিন্দুর সহিত তাহাদিগের সম্মিলন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? হইতে পারে এই কারণে যে, সামাজিক জীবনে হিন্দুর সহিত অশেষ প্রকারের মান্যের ও সহানুভূতির সম্বন্ধ আছে, যথা (১) জন্মাশৌচ। (২) স্ত্রীদিগের অবরোধ ও অবগুণ্ঠন। (৩) উভয়ে গাঁতা করিয়া কৃষিকার্য্য করে ও অংশীদারীর নিয়মে ব্যবসার কার্য্য চালায়, বাল্যবিবাহ দেয়, তীর্থ ভ্রমণ করে, ধর্ম্মার্থে উপবাস করে, দিনের মধ্যে ৩ বা ৫ বার উপাসনা করে। (৪) রোগ শোক ও বিপদে পরস্পরে, পরস্পরের প্রাণ ভরিয়া সাহায্য করে। কত হিন্দু মুসলমানের প্রতিপালক, কত মুসলমান হিন্দুর অভিভাবক। এই সকল কারণে উভয় জাতিতে যথেষ্ট সদ্ভাব আছে, এক্ষণ ইহাতে যদি পূর্ব্বোক্ত প্রধান ৩টী বাধার কোন সদুপায় যদি অবধারণ করা যায়, আর তাহা সাধারণে অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মিলনের জন্য আর আমাদিগকে এমন করিয়া অকূল পাথারে ভাসিতে হয় না। আবার কেহ হয়ত বলিবেন, মুসলমান সমাজ কখনও কোন পরিবর্ত্ত গ্রহণ করিবেন না। এক সময়ে হিন্দু সমাজও পরিবর্ত্ত গ্রহণে অসম্মত

ছিলেন। কেহ প্রস্রাব করিয়া জল না লইলে, সন্ধ্যা না করিলে আগুন উঠিয়া যাইত; স্ত্রীলোকের হস্তে পুস্তক দেখিলে কর্ত্তারা জলিয়া উঠিতেন, এখন সে সব ঘুচিয়া গিয়াছে; সেই কর্ত্তারাই এক্ষণ বালিকা স্কুল স্থাপন করিতেছেন। সুতরাং এমন দিন শীঘ্রই আসিবে, যখন মুসলমানগণ উন্নতি লাভের জন্য সমস্ত কুসংস্কার জলে ভাসাইয়া দিবেন।

বিশেষতঃ সমন্বিত হিন্দু মুসলমানের সম্মুখে অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রসারিত রহিয়াছে। ইহা আমার অটল বিশ্বাস, যে যেমত প্রহার সহ্য করিতে পারে, তাহার প্রহার ক্ষমতাও তত্তুল্য। যে ষ্টাম্প আইনের শব্দে আমেরিকাবাসীরা উন্মাদ হইয়া ছিলেন, ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান তাহা নিঃশব্দে বহন করিয়াছেন, সুধু তাহা নহে, তদুপরি একটা রেজিষ্ট্রি আইনও অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়াছেন। ইহা হইতে এ মীমাংসা কি অভ্রান্ত নহে যে, ভারতবাসীগণ যদি আমেরিকাবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে সম্মুখীন হন, তাহা হইলে আমেরিকা ভারতবর্ষের এক চপেটাঘাতও সহ্য করিতে পারে না। ঘাত-সহিষ্ণুতা যে ঘাত দান ক্ষমতার আনুপাতিক, তাহা সহস্র সহস্র প্রাকৃতিক উদাহরণ হইতে প্রমাণ করা যায়।

ভাবিয়াছিলাম, এই জাতীয় সমন্বয় কল্পে ব্রাহ্মগণ হইতে সুমহৎ ফল সকল লাভ করিব, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া সে বিষয়ে বড়ই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি। যখন তাঁহারা মুসলমানকেই মা পাইলেন, তখন তাঁহাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন বিশেষ উপকার হইল না। তাঁহারা যে আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার উপমেয় কিছু পৃথিবীতে নাই, একথা সত্য; কিন্তু ভারতবাসীর জগৎকে শিক্ষা দিবার দিন নহে, শিক্ষা করিবার দিন; তুমি পর পদ-লুণ্ঠিত, তোমার মস্তক পর পদ-ধূলায় ধূসরিত, এখন তোমার জগৎকে শিখাইতে যাওয়া বাতুলতা।

তুমি (ব্রাহ্মসমাজ) বলিবে যে, আমি শত শত হিন্দু মুসলমান সমাজের মহাপুরুষদিগের আশ্রয়-ভূমি হইয়াছি; আমি না থাকিলে তাঁহারা খ্রীষ্টান হইতে বাধ্য হইতেন। সত্য বটে, ইউরোপ-প্রত্যাগত মুসলমানগণ তওবা ও কল্মা পাঠে অস্বীকার হওয়াতে মুসলমান সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই; সত্য বটে ইউরোপ-প্রত্যাগত হিন্দুগণ নিয়মিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার হওয়াতে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা সকলেই কি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন? যদি তোমার আশ্রয় লইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি বোধ করি, তুমি না থাকিলে, তাঁহারা খ্রীষ্টান না হইয়া কল্মা বা প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সমাজে প্রবেশ করিয়া এত দিনে পতিত সমাজদ্বয়কে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিতেন। তোমার হাতে পড়িয়া তাঁহারা যে হতশ্রী হইয়াছেন, কি তুমি তাঁহাদিগের সদ্ব্যবহার জান না, একথা আমি বলিতেছিনা, আমি বলিতেছি যে, যে মহাপুরুষের সন্নিকর্ষে আমরা কোটি কোটি লোকে সৎশিক্ষা লাভ করিতাম, তাঁহাকে তোমরা তিনজন লোকে লইয়া ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছ। তোমরা যদি ব্রাহ্মনামক পৃথক একটা থাক না করিয়া বৈষ্ণব বাউল শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে দেশের অনেক মহে

কার সাধিত হইত। তুমি যদি আপনার স্বদেশীকে না ভালবাস, তোমাকে স্বদেশী ভালবাসিবে কেন? তোমার জন্য সে কাঁদিবে কেন? ঘরে আগুন লাগিলে বিপদ বোধ করিয়া যেমন বলবান লোকেরা দুর্ব্বলদিগকে ফেলিয়া চলিয়া যায়, তোমারাও ঠিক তাই করিয়াছ; নিতান্ত পরমায়ু ছিল তাই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি। যখন দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও সহানুভূতি পাইলে না, তখন পুনরায় বিরাট দেহ একটু খর্ব্ব করিয়া সমাজে প্রবেশ করিলে ভাল হয় না কি? এমন করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া কতকাল বেড়াইবে ভাই?

হিন্দুরা ইচ্ছা করিলেই মুসলমান হইতে পারেন, কিন্তু মুসলমানেরা ইচ্ছা করিলেই হিন্দু হইতে পারেন না; বাউল বৈষ্ণব হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে মুসলমানদিগের প্রবেশের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রবেশ করিলে ভাল হয়, কি মন্দ হয়, সে কথা পৃথক্, আমি সেরূপ অনুরোধ করিতে প্রস্তুত নহি। যে বংশ কেবল কাল এসিয়ার উজ্জ্বলতম সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীদিগকে লালন পালন করিয়াছেন, সেই রাজচক্রবর্ত্তীর বংশাবতংসকে কেমন করিয়া একটা নগণ্য সমাজে পূরিব? তাহা পারিব না। তবে এক্ষণ সমন্বয়ের সদুপায় কি?

সমন্বয় সাধন করিতে হইলে উভয় পক্ষেরই বিদ্বেষ ভাবকে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত। পৌত্তলিক বলিয়া হিন্দুরা পৃথিবীর নিকট যেরূপ অশ্রদ্ধেয়, মুসলমানদিগের সেরূপ অশ্রদ্ধা করা বিধেয় নহে। বোধ পূজাটা তখনই উন্মাদ-বিজৃম্ভিত নহে। এই নিখিল জগতের প্রত্যেক বস্তুই যে পরমেশ্বরের বিকাশ, তাহার কোন একটী বস্তুকে তাঁহার উদ্দেশ্যে পূজা করিলে তাহা কদাচ বাতুলতা হইতে পারে না। আর যদি সিদ্ধপুরুষ উৎপাদনের ক্ষমতা ধরিয়া ধর্ম্ম সকলের ফলোপধায়িতার বিচার করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুর পৌত্তলিক ধর্ম্ম নিতান্ত হেয় হইবে না; যদি পাপ ও অপরাধ দমনের ক্ষমতা অনুসারে ধর্ম্ম সকলের উপকারিতা নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলেও পৌত্তলিক ধর্ম্ম অশ্রদ্ধেয় হইবে না।

আমি কোন মূর্ত্তি বিশেষের পক্ষপাতী নহি; হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণ সাকার উপাসনার সমর্থনে এই যুক্তি ব্যবহার করেন যে, যেমন নিরাকার সুগন্ধের প্রয়োজন হইলে সাকার পুষ্পের আরাধনা করিতে হয়, নিরাকার মিষ্টতার অভিলাষ হইলে সাকার মিছরি কিম্বা শর্করার আশ্রয় লইতে হয়, তেমনি নিরাকার ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে তাহার আধার স্বরূপ কোন মূর্ত্তি বা পদার্থের প্রয়োজন। হস্তপদাদি যুক্ত মূর্ত্তিই যে উপাস্য হইতে পারে, অন্য পদার্থ হইতে পারে না, হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের এরূপ উদ্দেশ্য নহে; নিত্য পূজ্য শিব একটু মৃত্তিকা খণ্ড মাত্র; গৃহ দেবতা নারায়ণ একটু প্রস্তর খণ্ড বৈ নয়। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি একটী পত্র বা একখণ্ড কাষ্ঠকে পূজা করিতে পার। এরূপ পূজককে পৌত্তলিক বলিয়া জগৎ উপেক্ষা করে করুক। কিন্তু মুসলমানের করা উচিত নহে।

জাতিভেদ-দোষ যদিও হিন্দুতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, কিন্তু একারণে হিন্দুকে জগৎবাসীরা যেরূপ দোষারোপ করেন, তাহা কদাচ সঙ্গত নহে। সকলেই জানেন অত্যন্ত সুশিক্ষা সত্ত্বেও একজন ইউরোপিয়ান

জজ একজন ইউরোপিয়্যান মুটিয়ার সহিত এক টেবিলে কদাচ আহার করেন না, তাহাকে কখনও কন্যা দান করেন না, এবং তাহার কন্যাকেও বিবাহ করেন না, অতএব জাতিভেদ খ্রীষ্টান সমাজেও আছে। তারপর এদেশের সাম্যের উজ্জ্বল আদর্শ যে মুসলমান সমাজ, তাহাতেও জাতিভেদ আছে। সেখ ছোয়েদ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণেরা নিম্ন বর্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট নিম্নেরা ভোজন করেন। সমন্বয়ের অপ্রাপ্তি বশতঃ আছরাবেরা কন্যাদিগকে আযৌবন কুমারী অবস্থায় রাখেন। সাধারণ মুসলমানেরা বেদে ঝাড়ুদারের হুঁকা পর্য্যন্ত খান না; নিকারী, দাই, কাহার, কলু, ধোপা প্রভৃতির সহিত আহার করেন না। এই সকল বর্ণ-পার্থক্যের ইতিহাস আমি অবগত নহি, কিন্তু সাধারণ মুসলমান সমাজ কর্ত্তৃক ইহারা যে বৃত্তি কিম্বা অপরাধ বশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তের শত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মল মুসলমান সমাজে যদি এতগুলি বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ বিস্ময়ের বিষয় না হয়, তবে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অষ্ট সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সমাজের উৎপত্তি, তাহাতে অত্যন্ত বর্ণভেদ দেখিয়া আমাদিগের লোম-হর্ষণ উপস্থিত হইবে কেন? বর্ণভেদের দোষ যখন পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে লক্ষিত হইতেছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, বর্ণভেদটা মানব প্রকৃতির একটা অখণ্ডনীয় যুক্তিমূলক; কথকটা কার্য্যদৌকার্য্য, কথকটা দুষ্কৃতির শাস্তি বিধান।

বিবাহের অন্যায্য দোষে হিন্দু সমাজ একান্ত কলুষিত রহিয়াছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না; এ প্রথার সমর্থকেরা বলেন যে, ইহা ব্যতিরেকে স্ত্রীলোক সতী থাকিতে পারে না। আমি বলি, সমস্ত পৃথিবী যদি সতী শূন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের সেইরূপ হওয়া শ্রেয়স্কর। দেবতা সদৃশী সতী নারী কখনও হিন্দুর একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; সকল দেশে সকল সমাজে সতীর বর্ত্তমানতা উপলব্ধি হয়। আমাদিগের সম্মুখে অসীম বিবাহ-স্বাধীনতা যে মুসলমান সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতেও স্বাধ্বীসতী দুষ্প্রাপ্য নহে; অন্বেষণ কর দেখিতে পাইবে, পরম পবিত্রা মুসলমান-রমণী পতি-দেবতার অনুধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, অসংখ্য বিবাহপ্রার্থীদিগের রূপ-রত্নের প্রতি একবারও জক্ষেপ করিতেছেন না। সতী জীবন সত্য সত্যই লোকান্তর পদার্থ; বৈবাহিক সুবিধা বা অসুবিধা উহার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না। শাসন কিম্বা প্রলোভনের দ্বারা তুমি (হিন্দু) যে কৃত্রিম সতী প্রস্তুত করিতে চাও, সে বারব্য দুর্গ নির্ম্মাণ প্রয়াসের উপমেয়। জীবিত অবস্থায় যে স্বামীকে ভালবাসিত না, তুমি জীবনান্তে তাহাকেও ভালবাসাইতে ছাড় না। নারীর নিকট হইতে বুকে বাঁশ দিয়া যেরূপ পতিভক্তি আদায় করিয়া লইতেছ, তদ্রূপ পত্নীভক্তি দিতে যদি তোমাকে বাধ্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার ব্যবস্থা যে কিরূপ যন্ত্রণাজনক, তাহা বুঝাইতে পারিতাম। তোমরা অবলাদিগকে যেরূপ কঠোর ব্যবস্থায় চালাইয়াছ; সমস্ত পৃথিবীতে সৃষ্টির আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কেহ সেরূপ করে নাই। ঈশ্বর এই দোষে রুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে পরাধীনতা শৃঙ্খল পরাইয়াছে কি না, তাহা আমি জানি না। কিন্তু ক

পুরে যেরূপ বিক্রম দেখাইয়াছ, ইহার অর্দ্ধেক বিক্রম যদি রণক্ষেত্রে দেখাইতে, তাহা হইলে আজ হিন্দু মুসলমানের অশ্রুজলে ভারতভূমি ভিজিত না।

তোমার ব্যবস্থার দোষে বৈবাহিক অসুবিধা হিন্দু সমাজে এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, অর্থাভাবে অর্দ্ধ-সম্পন্ন লোকে বিবাহ না করিতে পারিয়া জঘন্য ব্যভিচার বৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করিতেছে; পরিশেষে শৃগালাদি পশু পক্ষীকে বাস্তবাটী সমর্পণ করিয়া নিঃশব্দে ধ্বংস পাইতেছে। আবার পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষ বল প্রকাশে চির অনভ্যস্ত বিধবা নারীগণ সামাজিক কারাগারে সুখ শান্তির একান্ত অভাব দেখিয়া, প্রকাশ্যে হউক অপ্রকাশ্যে হউক, স্বেচ্ছাচার আশ্রয় করিতেছেন। এই প্রকারের গুপ্ত প্রণয়-সম্ভূত কত যে নির্দ্দোষী শিশু প্রত্যেক নিশিতে ভারতবর্ষীয় বসুমতীকে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কুরুক্ষেত্রের মহাবীর কর্ণ ও ইউরোপের ধর্ম্মবীর যীশু যখন গুপ্তপ্রণয়ের সন্তান, তখন আমাদিগের লক্ষ লক্ষ বিধবা সন্তানের মধ্যে সেরূপ কত মহাপুরুষেরও নিপাত হইয়াছে। আবার নগর সকল বিধবা অভাগিনীর দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা বিবাহ-প্রতিবন্ধক না থাকিলে সুসন্তানের জননী হইয়া গৃহ উজ্জ্বল করিত, তাহারা এক্ষণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ যুবকদিগের, মূত্রত্যাগের স্থানের ন্যায়, শুক্রত্যাগের স্থান হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। প্রবঞ্চকের কুহকে পড়িয়া এই সকল পতিত ললনারা কত যে দুঃখ পায়, তাহা বলা যায় না। যৌবনান্তে যুবকের প্রীতি-বর্দ্ধনের যোগ্যতা বিনষ্ট হইলে অভাগিনীরা দাস্য বৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

এই সর্ব্বপ্রধান সামাজিক দোষের প্রতি সুশিক্ষিত হিন্দু সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে; বহুদিন না যাইতে যাইতে এ অংশের সংস্কারে যে হস্তক্ষেপ করা হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেই শুভদিন সমাগত হইলে আমরা আমাদিগের মুসল... স্বদেশীদিগকে সাম্যের পবিত্র ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহৎ লোকের জীবনের বিশেষত্ব।

এই পৃথিবীতে যাঁহারা নিজ নিজ কার্য্য-কলাপের দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগের জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকল এখনও বহুসংখ্যক লোককে জীবনী শক্তি দান করিতেছে, যাঁহাদিগের যশ-সৌরভ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া মনুষ্যের ...নস-কাননকে সুগন্ধযুক্ত এবং আমোদিত ...য়াছে এবং যাঁহাদিগের অমিত বিশ্বাস এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা শত শত লোককে জীবনগত কর্ত্তব্যের দুর্গমাবর্ত্তে প্ররোচিত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, তাঁহাদিগের জীবনের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে যে কতকগুলি বিশেষ ভাব দেখা যায়, তাঁহাদিগের জীবনের ভিত্তি তাহ...রই উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সকল বিশেষ ভা... এবং তাহার ফলাফল বিবৃত করাই ...

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। মহৎ লোকের জীবন-চরিত পাঠ করিলে দেখা যায়, তাঁহাদিগের বাল্যলীলা এবং সেই সময়ের কথা বার্ত্তাই তাঁহাদিগের ভাবী মহত্ত্বের পরিচায়ক। তাঁহারা এই সময়ে এমন সকল কার্য্য করেন যে, তাহা সাধারণ লোকের মধ্যে অতি বিরল। থিয়োডর পার্কার যখন চারি বৎসর বয়স্ক বালক, তখন এক দিবস তিনি যষ্টির দ্বারা একটী কূর্ম্মকে মারিতে যান, মারিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় আর তাঁহার মারিতে ইচ্ছা হইল না; তিনি তৎক্ষণাৎ মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ অনিচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতা উত্তর করিলেন "'ইহাকে কেহ বলে বিবেক, কিন্তু আমি ইহাকে ঈশ্বরের বাণী বলি।" পিট যখন সপ্তমবর্ষীয় বালক, তখনই তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় পার্লিয়েমেণ্ট সভায় বক্তৃতা করার ইচ্ছা তাহার মাতার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এবং তিনি একবিংশ বৎসর বয়সের সময় ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী এবং বাগ্মীকুল-ধুরন্ধর হইয়াছিলেন। নিপোলিয়ন শৈশবাবধিই একটী ছোট কামানকে তাহার ক্রীড়ার বস্তু করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় অন্যান্য খেলা অপেক্ষা দুর্গ নির্ম্মাণাদি কার্য্য তিনি অধিকতর ভালবাসিতেন। আমাদিগের প্রহ্লাদ 'ক' বলিতে 'কৃষ্ণ' নাম বলিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনাম শুনিলেই ক্রন্দন সম্বরণ করিতেন, এবং ম্যাটসিনি শৈশবাবধিই তাহার পরাধীনা মাতৃ ভূমির দুঃখে "কৃষ্ণ পরিচ্ছদ" পরিধান করিতেন। উপরোক্ত কার্য্যগুলি ইহার প্রত্যেকের ভাবী জীবনের একরূপ আভাস দিয়াছিল। মহৎ লোকের চাল চলতি সাধারণের নিকট বেয়াড়া বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ রূপে দেখিলে নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিবে যে, ঈশ্বরের গূঢ় নিয়মানুযায়ী তাঁহারা জীবনকে পরিচালিত করেন।

মহৎ লোকের জীবনে যে সকল বি[illegible] ভাব দেখা যায়, তাহার মধ্যে "অ[illegible] বিশ্বাস" একটী প্রধান। তাঁহারা যাহা স[illegible] বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা তাঁহারা নিশ্চয় বলিবেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। তাহাতে যদি পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যায়, বা নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা প্রস্তুত। এই বিশ্বাসের দরুণ সক্রেটিসকে বিষপান করিতে হইয়াছিল, এই বিশ্বাসের জন্য লুথারের জীবন সংশয় হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। হরিভক্তির জন্য প্রহ্লাদকে কতরূপ নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল; তিনি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু 'হরিনাম' ছাড়িতে তিনি কখন স্বীকৃত হন নাই। শ্রীচৈতন্য যখন এই দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন এদেশ মুসলমান রাজার অধীনে ছিল। এক দিবস সেই সময়ের কাজী, যে হরিনাম প্রচার করিবে, এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে, তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে, এইরূপ এক আদেশ দেশে ঘোষণা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই দিবস অধিকতর জাঁক জমকের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সেই কাজীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কাজী তাঁহার ভক্তি এবং প্রেম দেখিয়া গলিয়া গেলেন, এবং প্রণত মস্তকে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে দীক্ষিত করি[illegible] অনুরোধ করিলেন। এই সকল দৃষ্টা[illegible] একদিকে যেমন বিশ্বাসের জলন্ত ছবি

হইতেছে, অপর দিকে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতেছে যে, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রদর্শিত থ চলেন, তাঁহারা অনেক প্রকার বাধা পত্তির মধ্যে পড়িলেও অবশেষে যে জয়ী বেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ই সকল লোকই ঈশ্বরের প্রেরিত সন্তান এবং তাঁহাদিগকে অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলিয়াও তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধন করেন। বিধাতা সহায় ছিলেন বলিয়াইপ্রহ্লাদ অগ্নিতে পড়িয়াও মরেন নাই, লুথার বিপদে পড়িয়াও বিশ্বাস বলে বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন, ডেনিয়েল সিংহ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়াও প্রাণে মরেন নাই। অহো, ঈশ্বরের নিয়মের কি আশ্চর্য্য কৌশল। তাঁর কি অপরাজিত করুণা।

মহৎ লোকের আর একটী ভাব তাহাদিগের "সরলতা"। কারলাইল বলিয়াছেন, "I should say sincerity, a deep, great, genuine sincerity, is the first characteristic of all men in any way heroic" কপটতা কি তাঁহারা তাহা জানেন না। তাঁহারা কখন কোন কথা বলিতে অথবা কোন কার্য্য করিতে পরমুখাপেক্ষী হন না। যাহা সত্য বলিয়া জানেন, তাহা বলিবেন এবং করিবেন, তাহাতে যদি সকল লোক তাহাদের বিরোধী হয়, তজ্জন্যও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহাদের জীবনের মূল মন্ত্র এই "If an offence come out of the truth, better is it that the offence come than the truth be concealed." তাঁহারা যে যে পদে আছে, সে পদের উপযুক্ত সে না হইলে, তাহার প্রতি কেবল পদের কোন মর্য্যাদা দেখাইতে চান । তাঁহাদের মতে, ভ্রাতা যদি ঠিক ার ন্যায় ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রাতা, রাজোচিত কার্য্য যিনি করেন তিনিই রাজা, এবং মনুষ্যত্ব যাহার মধ্যে আছে, তিনিই মনুষ্য। ইহাকে কনফিউসিয়াস্ (Confucius) নামের সার্থকতা (Rectification of names) বলিয়াছেন। তাঁহার মত এই, যিনি যে পদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাকে সেই পদোচিত গুণ এবং ক্ষমতা দেখাইতে হইবে, তাহা হইলে তিনি সেই পদের উপযুক্ত, নতুবা নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অন্ধের মত চলে। যাহাতে লোকের সঙ্গে সংঘর্ষণ হইবে, যে কথা বলিলে বা যে কার্য্য করিলে অত্যন্ত নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে, তাঁহারা কখন সে কথা বলেন না, বা সে কার্য্য করেন না। তাঁহারা স্রোত যে দিকে চলে, সেই দিকেই আপনাকে ছাড়িয়া দেন। বিশেষ রূপে দেখিলে নিশ্চয় বোধ হইবে যে, স্বাভাবিক কপটতা বা সমাজ ভয় ও কাপুরুষতাই এইরূপ দুর্ব্বলতার কারণ এবং এই দুর্ব্বলতা নৈতিক বলের অভাব হইতে প্রসূত হইয়াছে। সাধারণ লোকের ন্যায় অন্ধভাবে চলেন না বলিয়াই পৃথিবীর বীর পুরুষগণের জীবন বিপদ-পরিপূর্ণ। ঈশ্বর যেন তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাদের জীবনের পথ কণ্টকিত করিয়া রাখেন। যিনি এই বাধা বিঘ্ন সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্য-সাধনে তৎপর হন, ভগবান তাঁহাদিগকে তাঁহার "প্রিয় সন্তান' বলিয়া ক্রোড়ে করেন। বিপদে অটল নির্ভরের বল তাঁহাদিগের মধ্যে আছে বলিয়াই তাঁহারা একাকী কোটী কোটী লোকের সমান। এই পৃথিবীতে যতগুলি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই দৃঢ় বিশ্বাসী অল্প কয়েকটী লোক দ্বারা প্রথম সূত্রপাত হইয়াছে। ভল

টেয়ার এবং রুসো তাঁহাদের তেজস্বিনী লেখনী দ্বারা যে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব তাহারই ছায়া মাত্র।

বীর পুরুষদিগের স্বভাবের মধ্যে আর একটী প্রধান ভাব এই যে, তাঁহাদের স্বভাবে বজ্রের কাঠিন্য এবং কুসুমের কোমলতার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহারা ইন্দ্রের বজ্র, স্নেহময়ী জননীর অশ্রুজল, প্রণয়িনীর কাতর আর্ত্তনাদ সকলই তুচ্ছ করিতে পারেন। আবার অন্য দিকে পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহাদের প্রাণ একেবারে দুঃখে গলিয়া যায়। ইহাই দেবতার প্রকৃতি। গুণমণি যীশু মাতার আর্ত্তনাদ অক্লেশে তুচ্ছ করিলেন, কিন্তু পাপভারাক্রান্ত মানবজাতির জন্য প্রাণ দিতে একটু মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। থিয়োডোর পার্করের বিষয় এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি বন্ধুগণের নিকট অত্যন্ত বিনয়ী, কিন্তু শত্রুর নিকট অত্যন্ত কঠিন ছিলেন।

মহৎ লোকের আর একটী গুণ নিঃস্বার্থপরতা। এই পৃথিবীতে যিনি কোন মহৎ কার্য্য করিতে চান, তিনি সর্ব্বাগ্রে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে অবশ্যই প্রস্তুত হইবেন। হাওয়াড (Howard) কারাগারের নির্যাতন কমাইবার জন্য এবং কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত লোকদিগের ক্লেশ প্রশমনের জন্য কি চেষ্টা না করিয়াছিলেন! উইলবার ফোর্স (Wilberforce) দাসত্ব প্রথা উঠাইবার জন্য শরীরের রক্ত জল করিয়াছিলেন। শাক্য মুনি রাজার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রের কুটীরে বাস করিয়াছিলেন। যাঁহার শরীর পুষ্পাঘাতে কষ্ট পাইত, রাজমুকুট যাঁহার শিরোভূষণ ছিল, পৃথিবীর সকল ভোগ্য বস্তু যাঁহার পদে বিলুণ্ঠিত, তিনি অনায়াসে সকল পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিলেন, এবং কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। ইহা হইতে নিঃস্বার্থপরতার আর উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত কি হইতে পারে? এই সকল কার্য্যের প্রতি স্বর্গের দেবতাগণ পুষ্প বৃষ্টি করেন।

উপরোক্ত গুণগুলি যাহার মধ্যে আছে, তিনিই পৃথিবীতে মহৎকার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইবেন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে যত আন্দোলন চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই জীবনশূন্য বলিয়া বোধ হয়। যিনি যে সত্য প্রচার করিলেন, তাঁহার গুপ্ত জীবনে তদনুরূপ কার্য্য পাওয়া যায় না। এইরূপ কপটতা মহৎকার্য্যের পথে একটী বিশেষ অন্তরায়। যিনি দেশের কল্যাণ সাধন জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তিনি বিন্দু মাত্র স্বার্থত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত! কিন্তু যিনি এই পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইতে চান, তিনি নির্ম্মল চরিত্রের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেখাইবেন। তাঁহার মধ্যে কতকগুলি দেবতার প্রকৃতি ও গুণ চাই, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহার প্রিয় সন্তান বলিয়া খ্যাত হইবেন, এবং মনুষ্য জীবনের যে প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা সাধন করিতে পারিবেন।

শ্রীকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী।

দুই সীমার মধ্য।

মানুষ মধ্য পথে যাইতে চায় না। যেমন ধর্ম্ম জগতে একদিকে নাস্তিকতা, অপর দিকে কুসংস্কারের অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, মানব ঘুরিতে ঘুরিতে একটায় প্রহত হইয়া আবার অন্য দিকে ফিরিয়া আইসে, মধ্যে যে সরল মুক্তির সোপান ধর্ম্মপথ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই; সেইরূপ সকল দিকেই দেখিতে পাই, একদেশদর্শী মানব এক প্রান্ত ভিন্ন মধ্য পথ অবলম্বন করিতে জানেনা। জগতে এই জন্যই সকল বিবাদ বিসম্বাদ, এই জন্যই সকল ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ও শোণিতপাত। মানব ইতিহাস এইরূপ একদেশদর্শিতা দোষে চিরদিন কলঙ্কিত।

কি ইতিহাস, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্ম জগত, যেদিকে চাই, সেই দিকেই এই এক-দেশদর্শিতার জলন্ত দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান সভ্যতার লীলাভূমি ইংলণ্ডে যেমন একদিকে মহাপ্রাণ উদার হৃদয় গ্লাডষ্টোন কেবল আয়র্লণ্ড ভূমির মঙ্গল ও শত শত বাক্য-হীন দুঃখ-ভগ্ন আত্মার ক্লেশ নিবারণের জন্য প্রাচীন জীবনের সকল শক্তি বিনিয়োগ করিয়াছেন, অপর দিকে আবার উচ্চবংশা-ভিমানী ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব প্রমত্ত লর্ড সলিসবরি আইরিশগণকে হটেণ্টট ও ভারতবাসীকে কৃষ্ণ-নর (Black man) বলিয়া অভিহিত করিয়া সুরুচির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। রোমের অতীত ইতিহাসে যেমন সর্ব্বগ্রাসী জুলিয়াস সীজর দুর্দ্দম উচ্চাভিলাষের দাস হইয়া রোম সাম্রাজ্যের সাধা[illegible] তন্ত্রকে [illegible] অন্য দিকে তেমনি মহামনা স্বাধীনচেতা ক্রুতস্ দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মজীবন ও বন্ধুজীবন বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ফরাসী ইতিহাসে একদিকে যেরূপ শোণিততৃষ্ণা-লোলুপ উৎসাহ-প্রমত্ত বিপ্লবী দল রাজশক্তি, রাজসভা, উচ্চকুল ও রাজ-শাসনে পদাঘাৎ করিয়া সাম্যের মহা মন্ত্র ঘোষণা করিবার জন্য ভীষণ লোমহর্ষণ সমর-তরঙ্গে নৃত্য করিতেছিল, অপর দিকে তেমনি পরকীয় স্বাধীনতা-বিনাশী, রাজ্য-লোভী, পৃথিবী-বিজয়াভিলাষী বোনাপার্ট নেপো-লিয়ান একদিন সমস্ত ইউরোপ করতলস্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, কি অতীত ইতিহাসে, কি বর্ত্তমান ইতিহাসে, মধ্য পথে বিচরণ করিতে কেহই চায় না। অথচ যিনিই সীমান্ত প্রদেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহারই পতন অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্ম জগতেও তাহাই। যদি নরমেধ, গো-মেধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ শত শত নর ও পশু বিনষ্ট হইয়া শোণিত-কলঙ্কে এবং ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের স্রোতে ভারতভূমিকে নিমজ্জিত না করিতেন, তবে দয়া-পরবশ, সাম্য-গুরু শাক্যসিংহের আবির্ভাবের কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার যদি শাক্যমুনি কঠোর শুষ্ক জ্ঞান প্রচার দ্বারা লোককে নিরীশ্বর বা ঈশ্বর সম্পর্ক-বিহীন না করিতেন, তবে জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইত না। যদি শাক্ত ধর্ম্মের ও কাপালিক ক্রিয়ার [illegible]

না করিত, তবে চৈতন্যের আবির্ভাব হইত না। যদি প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য প্রেম ও ভক্তির অনলে জীবনকে পূর্ণাহুতি প্রদান না করিতেন, তবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এত শীঘ্র পতন হইত না। তাই বলি, প্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ে যিনি আরোহণ করিবেন, তাঁহারই পতন অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষণে এ দেশে এক সম্প্রদায়ের মূল মন্ত্র গাঢ় নিদ্রা-নির্ব্বাণ। ধর্ম্মসংস্কার বল, সমাজ-সংস্কার বল, তাঁহারা বলিবেন, আবশ্যক নাই। যাহা আছে, তাহাই ভাল, বাল্যবিবাহ দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, বিধবা বিবাহ ঘোরতর পাপ, ইংলণ্ডে গমনে ঘোর অমঙ্গল, এমন কি, ইংরাজী শিক্ষাও তাহাদের নিকট ঘোর অনিষ্টের আকর। এই সম্প্রদায়ের প্রধান নীতি, খাও, দাও, আহার কর, গাঢ় নিদ্রা যাও, অহিফেন সেবন করিয়া চৈতন্য বিসর্জ্জন কর, কিন্তু সাবধান, দেশের, কি সমাজের, কি ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিও না। যদি কর, তুমি ঘোর পাষণ্ড, ভণ্ড, তুমি নাস্তিক, তুমি অনার্য্য। যদি তোমার যথেষ্ট অবকাশ থাকে, রসিকতা কর, আমোদ আহ্লাদ কর, আর যদি পার বল "নমো গণেশায়"।

আর এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, জীবন উন্নত, লক্ষ্য উচ্চতর কিন্তু তাঁহারা বড় অসহিষ্ণু। তাঁহাদের মূল মন্ত্র—"যাও সিন্ধুতীরে ভূধর শিখরে,
পর্ব্বতের গুহা তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধরে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

তাঁহাদের ইচ্ছা, আজিই দেশের সকল অভাব বিদূরিত হউক, একদিনে ভারতের সকল জাতি এক হইয়া যাউক, দেশের সকলই ম্যাটসিনি হইয়া যাউক, সকলেই চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বর প্রেমে মত্ত হউক, সকলেই লুথার ও পার্কারের ন্যায় ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক হউক, সকলেরই জীবন নিষ্পাপ, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, হৃদয় দেশানুরাগে উন্মত্ত, হস্ত দেশোদ্ধারে নিরত, রসনা নিত্য সত্যপ্রিয়, বাসনা স্বজাতির মঙ্গল সাধনে তৎপর, কামনা দেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন হউক। একদিনে ভারত উদ্ধার হউক।

প্রথম শ্রেণীর নিকট বিনীত অনুরোধ, ভাই, চক্ষুরুন্মিলন কর, নিদ্রা কি যথেষ্ট হয় নাই, শত শত বৎসর কি গাঢ় সুষুপ্তির ক্রোড়ে জীবনের মহৎ লক্ষ্যকে সমর্পণ কর নাই? নিশ্চেষ্ট জীবন বশতঃ নরকের গাঢ়তর অন্ধতম কূপে আসিয়া নিমগ্ন হইয়াছ, একবার কি চাহিয়া দেখিতেছ না? জাতি রক্ষা করিবে, ধর্ম্ম অমিশ্রিত রাখিবে কি? অচিরে যে তোমাদের জাতি ধরাতল হইতে উৎসন্ন হইয়া যাইবে, তাহার কি পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিতে পাইতেছ না? এইরূপে কি সমগ্র জাতি, সমগ্র মহাদেশের সম্পূর্ণ বিনাশের কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে না? প্রাচীন আমেরিকার দিকে চাহিয়া দেখ। সে দিন টাসমানিয়ার শেষ জীবিত আদিম নিবাসীর মৃত্যু হইয়াছে। টাসমানিয়ার পূর্ব্ব ইতিহাস, পূর্ব্ব অধিবাসী আজি বিলুপ্ত, এরূপ অবস্থা কি জগতের ইতিহাসে শত শত দেখা যাইতেছে না। একবার চাহিয়া দেখ, সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্যের কঠোর দংষ্ট্রে চর্ব্বিত হইয়া আজি ভারতসন্তান চির-দুর্ভিক্ষ-জ্বালায় হাহাকার করিতেছে, রোগে শোকে জর্জ্জরিত স্বদেশবাসীগণ দিন দিন ক্ষীণকায়, হীনশক্তি, হীন জীবন হইতেছে, ধর্ম্মও নীতির মস্তকে পদাঘাৎ করিয়া আর্য্য সন্তান

পবিত্র আর্য্য নামকে সুরাপান, ব্যভিচার, ভ্রূণ হত্যা ও দুর্নীতি সাগরে ডুবাইয়া দিতেছে. আজিও বাল্য-বিবাহ সমাজের অস্থি মজ্জা শোষণ করিতেছে, মানবকৃত জাতিভেদ জগৎপাতার পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করিতেছে, এক্ষণেও কি জাগ্রত হইবে না? মৃত্যুর পূর্ব্বেও কি একবার নয়ন উন্মীলন করিবে না? যদি এক্ষণেও অবহেলা কর, তবে অবনতি, দুঃখ ও দারিদ্র্যের অতলজলে তোমার জন্মভূমি, তোমার পবিত্র আর্য্য নাম চিরতরে নিমজ্জিত হইবে, সেদিনের আর অধিক বিলম্ব নাই। তাই বলি ভাই, এক্ষণেও তোমার স্থিতিশীলতা, তোমার অর্থনীতিপ্রিয়তা ও সত্যে অনাস্থা পরিত্যাগ করিয়া এক পদ অগ্রসর হও, স্বজাতির অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং স্বকার্য্য-সাধনে বদ্ধপরিকর হও।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নিকট বিনীত নিবেদন, শ্রদ্ধেয় বন্ধু, তোমার উপদেশ, তোমার তিরস্কার মস্তক পাতিয়া লইতে পারি, কিন্তু অসহিষ্ণুতায় কোন কার্য্য হয় না। রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। কোন জাতিই একদিনে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হয় নাই, সকলেরই আরম্ভ ও পরিণতি আছে। শিশু একদিনে চলিতে পারে না, যদি জোর করিয়া লাঠি ধরিয়া চালাইতে চাও, তাহার কোমল মেরুদণ্ড মস্তক ও দেহের গুরুতর ভার বহন করিতে না পারিয়া কুব্জভাব ধারণ করিবে। তাহার পদনলাস্থি বক্রভাব প্রাপ্ত হইবে। সকলেরই সময় অসময় আছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি আমাদের জাতির অকাল-বার্দ্ধক্য বিদূরিত করেন। দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, আকাশ-কুসুমের সন্ধানে ঊর্দ্ধ দিকে চক্ষু নিক্ষেপে কোন ফল নাই, যে মধ্য ভিত্তিতে চিরদিন চলিতে হইবে, তাহারই দিকে দৃষ্টিপাত কর। যদি মাতৃ-ভক্তি অকৃত্রিম হয়, যদি দেশানুরাগ কপটতা পূর্ণ না হয়, যদি ধর্ম্মপথে মতি বিচলিত না হয়, যদি মাতৃভূমির দুর্দ্দশা দূরের আকাঙ্ক্ষা জীবনের ব্রত বলিয়া ভারতবাসী বুঝিয়া থাকে, ঈশ্বর একদিন তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।" আবার বিদ্যা, জ্ঞান, সভ্যতা তাহাদের পূর্ব্বতন বাসস্থান] ভারতকে আশ্রয় করিবে, আবার ভারতমাতার হাস্যমুখ দেখিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারিবে। তাই বলি ভাই, একেবারে উচ্চচূড়ে না গিয়া মধ্য পথ অবলম্বন কর।

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাসগুপ্ত।

প্রায়শ্চিত্ত।

যাহার যেরূপ উত্তেজন-শক্তি, তাহার অবসাদ ক্রিয়াও সেইরূপ। বিষ পান করিলে, শিরায় শিরায় শোণিত দ্রুত সঞ্চারিত হইতে থাকে, চক্ষু জবা ফুলের মত রক্তিমা বর্ণ ধারন করে, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠে। তৎপর উত্তেজনার হ্রাস হইতে থাকিলেই রক্তের ক্রিয়া ক্রমে শিথিল হইয়া যায়, শরীরে আর উত্তাপের লেশ

মাত্র থাকে না, সে তখন মৃত অথবা মৃতবৎ।

আর্য্যজাতি বহু পূর্ব্বে ভেদ নীতি প্রচলন করিয়া, জাতীয় জীবনে যে বিষের প্রলেপ দিয়াছিলেন, এখন তাহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাই আজ উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার তার-স্বরেও আর্য্যসন্তানগণ জাগ্রত হইতেছে না।

একবার আর্য্য জাতির সেই পূর্ব্বতন অবস্থা স্মরণ করুন। আসিয়ার মধ্যস্থল হইতে দীর্ঘাকার, শ্বেতবর্ণ, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, পৃথিবীর আদি-সভ্য কতকগুলি নর-নারী পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। তাঁহারা ভারতের প্রকৃতি-প্রদত্ত অতুল সম্পদরাশি অবলোকন করিয়া, জন্মভূমি, নর কুলের আদি সূতিকাগার, তুষারাবৃত মধ্য-আসিয়ার মায়া পরিত্যাগ করতঃ, সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, নগ নদী পরিপূর্ণা ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন।

ভারতের আদিম অধিবাসীগণ সে সময়ে ঘোর অসভ্য ছিল। এমন কি, পশুদিগের সহিত আকৃতি-গত পার্থক্য ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন পার্থক্য ছিল না। আর্য্য সংসর্গে এই উলঙ্গ আম-মাংস-ভোজী অসভ্যগণ ধীরে ধীরে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল।

আর্য্যজাতির বংশধরগণ যখন দেখিতে পাইলেন যে, অসভ্যগণও ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে, তখন তাঁহারা সমবেত হইয়া সমাজস্থ লোকদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। যথা—

(১) অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণা নাম কল্পয়ৎ॥
(ব্রাহ্মণদিগের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহণ এই ষট্ কর্ম্ম নিরূপণ করিলেন।)

(২) প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বিষয়েষ্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
(ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে প্রজা পালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, মাল্য চন্দন ও নিয়ত স্ত্রী সম্ভোগ এই কয়েকটী নির্দ্ধারিত হইল।)

(৩) পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশস্য কৃষিমেবচ॥
(বৈশ্যদিগের পক্ষে পশু পালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এবং কুসীদ গ্রহণ, এই কয়েক কার্য্য নিরূপণ করিলেন।

(৪) একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥

শূদ্রদিগের পক্ষে এই কর্ম্মের ভার দিলেন যে, তাহারা যেন অসূয়া-বিহীন হইয়া এই বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা করে।

পাঠক! বলিতে হইবে কি যে, আর্য্যবংশধরগণই গুণানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য; এবং তাৎকালিক অর্দ্ধ সভ্য ভারতের আদিম অধিবাসীরাই অধমাধম শূদ্র।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নেরও আবশ্যকতা উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণগণই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ব্যবস্থা প্রণয়নের ভারও তাঁহারাই গ্রহণ করিলেন। সাম্যের মূলোচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মধ্যে তীব্র গরল প্রবৃষ্ট হইল।

আমরা মনুসংহিতা হইতে নিম্নে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই সে সময়ে শাসনদণ্ড কিরূপে পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন।

শতং ব্রাহ্মণ মাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ড মর্হতি।
বৈশ্যোহপ্যর্দ্ধ শতং দ্বেবা শূদ্রস্তু বধ মর্হতি॥

ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণকে কর্কশ বাক্য বলে, তাহা হইলে তাহার এক শত পণ দণ্ড হইবে, বৈশ্যের দেড় শত কি দুই শত পণ এবং শূদ্রের তাড়নাদি রূপে বধদণ্ড পর্য্যন্ত হইবে।

প ৃশদ্‌ব্রাহ্মণোদণ্ডঃ ক্ষত্রিয়স্যাভি শংসনে।
বৈশ্যঃস্যাদর্দ্ধ পঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশ কোদমঃ।

ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়কে কর্কশ বাক্য বলে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ, বৈশ্যকে বলিলে পঁচিশ পণ এবং শূদ্রকে বলিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

এক জাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বা।য়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্য প্রভবোহি সঃ॥

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়কে কর্কশ বাক্য দ্বারা অপমানিত করে, তাহা হইলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদনরূপ দণ্ড হইবে, যে-হেতু সে হীন স্থানোৎপন্ন।

নাম জাতিগ্রহং ত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিঃক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥

ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার?—এবম্বিধ রূপে যদি কোনও শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে নাম জাতি গ্রহণ পূর্ব্বক গালি দেয়, তাহাহইলে উহার মুখে দশ অঙ্গুল পরিমিত প্রতপ্ত লৌহশঙ্কু নিক্ষেপ করিতে হইবে।

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসে চয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রেচ পার্থিবঃ।

যদি শূদ্র মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে, তাহা-হইলে উহার মুখে, কর্ণে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিতে হইবে।

এইরূপ বহু শাসন বাক্য মনু-সংহিতা ও অপরাপর সংহিতা হইতে সং [illegible] করা যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে বিরত রহিলাম। লেখা বাহুল্য যে, মনুর জীবিত কালের মধ্যেই এই চারি বর্ণ ছত্রিশ বর্ণে পরিণত হইয়াছিল।

ভেদ-নীতির ফলে এই সময়ে আর্য্যে ও অনার্য্যে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধাদি হইতে লাগিল। কেহ কেহ আর্য্যদিগের দাসত্ব অসহনীয় বোধ করিয়া, দূর দেশে এবং পর্ব্বতাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কেহ কেহ অবনত শিরে আর্য্যদিগের পদানত হইল। যাঁহারা স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আর্য্য গ্রন্থে দৈত্য, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইতে লাগিলেন। শাসন-বৈষম্যে এবং বর্ণ ত্রয়ের অধীনতায় পদানত অনার্য্য জাতির উন্মেষোন্মুখ প্রতিভা ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়-গণের মধ্যে কেহ কেহ (বিশ্বামিত্র, আর্ষ্টি-ষেণ, সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি প্রভৃতি) ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শূদ্র জাতির অধ্যয়ন, যজন, যাজন, তপস্যাদির কোন অধিকারই ছিল না। রাজা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক শূদ্র-তাপসের বধ-কাহিনী পাঠক মাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। ইহা হইতে আর শাসন-বিভ্রাট কি হইতে পারে!!

যে ভেদ-নীতি পূর্ব্বে অনার্য্যদিগের জন্য অবলম্বিত হইয়াছিলেন, কালে আর্য্যগণই সেই বিষময়ী নীতির কুফল উপভোগ করিতে লাগিলেন; বিধাতার ইহাই বিধান।

কুরু ও পাণ্ডবদিগের সময়ে আর আর্য্যে ও অনার্য্যে যুদ্ধ হইল না। এবার দেবা-সুরে যুদ্ধ নহে, নর ও রাক্ষসের যুদ্ধ নহে, এবার আর্য্যে আর্য্যে যুদ্ধ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ [illegible] এই [illegible] কণিকের নীতি,

বাসুদেবের কূট চক্র, কর্ণ শকুনির দুরভিসন্ধি প্রভৃতি নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কুরু ক্ষেত্র যুদ্ধে আর্য্যশক্তির যে অপচয় হইয়াছে, আর কি তাহার পূরণ হইবে!

এ সময়েও পূর্ব্ব-সঞ্চারিত গরলের উত্তেজন শক্তি ছিল, তাই দুর্য্যোধন "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান করিব না" বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পৃথ্বিরাজ ও জয়চন্দ্রের সময় হইতেই বিষের প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় নরপতিগণের গৃহ বিবাদ সূত্রে, দুর্দ্ধর্ষ ভারত-বৈরী সাহেব-উদ্দীন গোরী এই সময়েই তদীয় তাতার সৈন্যের সাহায্যে পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া ভারতের বক্ষে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি বিজয় কেতন প্রোথিত করেন।" যে আর্য্য জাতি, অনার্য্যদিগকে পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই আর্য্য বংশধরগণই যবন কর্ত্তৃক পরাজিত, সুতরাং লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ জাতিই আর্য্যপদাভিষিক্ত। আমরা আর্য্য-সন্তান হইয়াও অনার্য্য শূদ্রবৎ পাদদলিত হইতেছি। হা পূর্ব্ব পুরুষগণ! তোমরা সেই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তনের সময়ে যদি অনাগত কালের যবনিকা উত্তোলন করিতে পারিতে, তাহা হইলে আজ তোমাদের বংশধরগণকে হাকাকার রবে জগৎ পরিপূর্ণ করিতে হইত না। মহত্বে, পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যবত্তায়, সহিষ্ণুতায় সে সময়ে পৃথিবীর কোন্ জাতি তোমাদের সমকক্ষ ছিল? আর আজি তোমাদের বংশধরগণ হইতে ভূমণ্ডলের কে সভ্য জাতি এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশাগ্র[illegible] অহো! এক ভেদ-নীতির কি ভীষণ পরিণাম!

আইস ভাই সকল! পূর্ব্বপুরুষকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। আর্য্যে ও অনার্য্যে মিশিয়া যাই। আ-ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্য[illegible] একাসনে উপবেশন করিয়া আন[illegible] হার করি, পরস্পর ভাই ভাই বলিয়া [illegible]ঙ্গন করি, সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত হই। এ শ্ম[illegible] ক্ষেত্রে আর জাতি বিচার কেন? এ[illegible] পতিত, নিগৃহীত, পর-প্রত্যাশিত, বিধর্ম্মী বিদলিত জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনই বা কেন? অগ্রে সমাজ সংস্কার কর। ভাই সকল! আর বিলম্ব করিও না, সত্বর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একতার বলে বলীয়ান হও। সাম্যের মহামন্ত্রে দীক্ষিত পঞ্চবিংশতি কোটী নর নারী প্রাণোৎসর্গ করিয়া সাধনা করিলে অবশ্যই সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিব।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী।

রাজসূয় যজ্ঞ।

১। ভগবান এ সংসারে একটী শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিপূর্ণ এই জগৎ একত্র বদ্ধ ও সংমিলিত রহিয়াছে। এই বন্ধনী হস্ত হইতে কাহারও ছাড়াইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই। ই[illegible] স্থান বিশেষে মায়া, স্নেহ, ভক্তি, প্রণ[illegible] প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অভিধানে অভিহিত

* মনুর শ্লোকগুলি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ[illegible] সহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত মনুসংহি[illegible]

বিধাতা এই শক্তি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা পিতা মাতার স্নেহে, ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসায়, আত্মীয় বন্ধুবর্গের প্রীতিতে, রমণীর প্রণয়ে, আজ সম্মিলিত ও ...। এই শক্তির জন্য মনুষ্য মনুষ্যের ...তা — ইহার মধুর আকর্ষণে পরস্পরের ...ধ্য প্রতি ও উপকার-লিপ্সা। বিধাতা! ...ন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার কৌশল! এই অপূর্ব্ব কৌশলে পরমাণু পরমাণুর সহিত সংমিলিত হইয়া এই বিশাল বিশ্বসংসার বিরচিত করিয়াছে। ...ঐশ্বর্য্যশালিন্! তোমার অনন্ত লীলা ... ও ভাবিয়া অবাক্ হইয়া যাই।

...। এই অচিন্ত্য শক্তিতে মানবগণ ...জবদ্ধ হইয়া বাস করে—মনুষ্য ব্যক্তি-...ত স্বার্থ-দৃষ্টি-বিরহিত হইয়া সাধারণের হিতে জীবন উৎসর্গ করে। সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস না করিলে আমরা কত কষ্ট পাইতাম! যত সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ততই সমাজে নানাবিধ শুভকর নিয়ম সংস্থাপিত হইয়া ইহাকে প্রকৃত সুখের আলয় করিয়া তুলিতেছে। মঙ্গলময়ের সমস্ত নিয়মই মঙ্গলময়, তিনি পরীক্ষার্থ মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন। সে সেই ইচ্ছার ফলে ঐশ্বরিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে বিষয় বিশেষে সাময়িক বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হয়। তখন পরমেশ্বর প্রভুশক্তির পরিচালন দ্বারা শান্তি সংস্থাপন করেন।

৩। ঈশ্বরের এই প্রভু শক্তির নিকট ...কল পদার্থ বাধ্য। বাধ্যতা না থাকিলে ...ংসার চলিতে পারে না, এজন্য ভগবান পদার্থনিচয়কে যেন বাধ্যতা দিয়াই গঠন ... অচেতন পদার্থ সকল ... সর্ব্বজনীন বাধ্যতার উৎকৃষ্ট পরিচয় স্থল। পৃথিবী নক্ষত্রাদি কখনও চিরাভ্যস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারে না। নদীর জল কখনও উর্দ্ধদিকে গমন করিতে পারে না; ইত্যাদি। চেতন পদার্থ সকল কতকগুলি বিষয়ে অচেতন পদার্থের ন্যায়। মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন। বাস্তবিক এই স্বাধীনতা মনুষ্য ভিন্ন অপর কোন পদার্থে নাই। কিন্তু এই স্বাধীনতা স্বপ্রবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পাছে সাধারণের অহিতকারী হয়, এজন্য জগদীশ্বর মনুষ্যের বিবেক দিয়াছেন। সে বিবেক-পরিচালিত হইয়া, নিজের ও সাধারণের হিত কামনায় মঙ্গলকর নিয়মাদি সংস্থাপন করত; তাহাদের নিকট বাধ্য থাকিতে স্বীকার করে। পাছে মানুষ স্বীয় প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ কার্য্য করে, এজন্য বাধ্যতা ও শান্তি সংস্থাপন কর্ত্তা রাজার সৃষ্টি। রাজা পরমেশ্বরের প্রতিভূ স্বরূপ। এজন্য রাজবিদ্রোহিতা মহাপাপ। রাজা মনুষ্য মাত্র। মনুষ্যই তাঁহাকে প্রভুশক্তি প্রদান করিয়াছে। প্রজাগণ তাঁহার বাধ্য থাকিলেই রাজ্যে শান্তি থাকে, সুখ থাকে, সর্ব্ব বিষয়িণী উন্নতি হয়। যে রাজ্যের প্রজা যত উচ্ছৃঙ্খল, সে রাজ্য তত অশান্তিময়, তত অসুখের আলয়। এজন্য, বাধ্যতাই শাসনের মূল মন্ত্র।

৪। রাজ্যের অপর নাম সমাজ। কিন্তু যে সকল লোক এক সামাজিক নিয়মের বাধ্য, তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রাজা থাকিতে পারে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা থাকে। রাজা প্রজাদিগের সম ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন, এইটী সাধারণ নিয়ম। যেখানে রাজা ও প্রজার মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে ...বৈষম্য থাকে, সে রাজ্যের মধ্যে সামাজিক

শৃঙ্খলা অল্প। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের বঙ্গীয় সমাজ। কিছুকাল পূর্ব্বে মুসলমান রাজার সময়ে, রাজা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও, আমাদের সামাজিক এক একজন কর্ত্তা বা রাজা ছিলেন। তখন-কার বিশ্বাস অন্ধ হইলেও, শাসন বড় কঠোর ছিল। এখন যেমন প্রকাশ্যরূপে সমাজের শ্রেষ্ঠ নিয়ম সকল ভঙ্গ করিলেও, অর্থ থাকাই কৌলীন্যের লক্ষণ হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না। আমার বিশ্বাস, বরং অন্ধ সরল বিশ্বাস শ্রদ্ধার পদার্থ, তথাপি বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞান কিছুই নহে। বাস্তবিক আমি জ্ঞানকে বিশেষরূপ শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যতদিন ইহা দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতা দূর না হইবে, ততদিন ইহাকে বাস্তবিক জ্ঞান বলা যাইতে পারে না।

৫। বঙ্গের রাজকুলগৌরব বল্লাল সেনের সময়ে এদেশের কায়স্থ ব্রাহ্মণের কুল-বিভাগ স্থাপিত হয়। কুলীনের লক্ষণ হইতে বুঝা যায়, যে, ইহা কেবলমাত্র সমাজের গুণগৌরব। যে যেমন গুণী, সে সেইরূপ সম্মান পাইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রত্যেক সভাসমাজে এই নিয়ম প্রচলিত আছে, কিন্তু আমাদের দেশ হইতে ইহা বিতাড়িত হইয়াছে। যতদিন দেশে গুণের গৌরব ছিল, ততদিন লোকে গুণবান হইতে চেষ্টা করিত। এখন আর গুণের গৌরব নাই, এখন কেবল অর্থের আদর। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বিত্ত, তপ ও দানই বাস্তবিক গুণ—এইসকল গুণ যাহার থাকে, সেই ত প্রকৃত সম্মানের যোগ্য পাত্র—সেই ত কুলীন। বল্লালসেন প্রকৃত সমাজতত্ত্ব বুঝিতেন। তাঁহার কৃত নিয়ম বলবান থাকিলে সমাজ কত সুশৃঙ্খল হইত!!! এইনিয়ম বংশগত হইয়াই উৎসন্নের কারণ হইয়াছে। বংশগত সম্মানে ব্যক্তিগত সম্মানের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কৌলীন্য যে বংশগত ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বল্লালের অনেক পূর্ব্বেও গুণের আদর ছিল। মহাভারত পাঠক মাত্রেই ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ হও[য়ার] কথা জানেন। পিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছিলেন।

৬। হিন্দু রাজাদিগের সময়ে গুণী ব্যক্তির আদর, নির্গুণের উৎসাহ-বর্দ্ধন, গুণ-লিপ্সার সঞ্চার করণ, এবং সমাজের লোকদিগের সম্মিলন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীপতি রাজা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন। আমাদের বঙ্গীয় সমাজেও কিছু কাল পূর্ব্বে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে সমস্ত সমাজ নিমন্ত্রিত হইত। সমাজের মধ্যে যিনি গোষ্ঠীপতি থাকিতেন, তিনি মাল্য চন্দনাদি সম্মান চিহ্ন দ্বারা আদৃত হইত না। সেই কালে এরূপ সমাজ সম্মিলন, যাগ যজ্ঞাদি করণ পুণ্য কার্য্য বলিয়া পরিগৃহীত হইত। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই মাল্য চন্দনাদি ব্যাপারের সময়ে গুণের বাস্তবিক আদর ছিল না। এ সময়ে কেবল বংশের আদর—উচ্চ বংশে বিবাহাদির আদর ছিল। এখনও অনেক স্থলে এই বংশ-সম্মান আছে; কিন্তু সামাজিক সম্মিলন আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বল্লালসেনের শুভ প্রথায় এখন অবমাননা হইয়াছে। ইহা এখন দলাদলির [কারণ] হইয়াছে। ইহার জ্বালায় লোক জর্জ্জরিত হইতেছে। অধিক বলার আবশ্যকতা নাই, ইহা এখন আমাদের মহান অনর্থের

। উপরোক্ত যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যে ...নকার গোষ্ঠীপতি রাজারা অনেক স্থলে ...সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেন। সূর্য্য বংশীয় রাজার দান জগৎ-বিখ্যাত। আমরা ... আলোকপ্রদানাদিকে আনন্দের ...,অর্থীর লক্ষণ মনে করি, কিন্তু তাঁহারা ... ভোজনই কৃতার্থতা ভাবিতেন। মরুত ...জার যজ্ঞের কথা স্মরণে বিস্মিত হইতে ...। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যাহার আয়ো-...ন হইল, তাহার কার্য্য কত বৃহৎ, ইহা ...খানেই বুঝা যায়। যজ্ঞে দেশের সমস্ত ...ণ্ডিত, ধার্ম্মিক, ও বীর আগমন করিতেন, ও স্ব স্ব কৃতীত্ব অনুসারে সম্মান প্রাপ্ত হই-তেন। যজ্ঞ নানাবিধ ছিল। ইহাদের ...ধ্যে রাজসূয় যজ্ঞই প্রকৃষ্ট। লক্ষ রাজার শিরোমণি না হইলে, এ ব্যাপারেব অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। এটী মহা জাতীয় সম্মিলন (National Congress), এরূপ ব্যাপারে প্রায়ই অনুষ্ঠানকারীর বলের প্রয়োজন হইত। যিনি পরম ধার্ম্মিক, অতিশয় পরাপ্রাপ্ত, অত্যন্ত গুণশালী, তিনি ভিন্ন কেহই ইহা সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন না। চন্দ্রবংশীয় রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে, বলে, বিনয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ধর্ম্ম, ভীম বল, অর্জ্জুন বিনয়, এবং নকুল ও সহ-দেব জ্ঞান। যজ্ঞে তিন লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। সকলেই এই জাতীয় মহা ...মলনে সংমিলিত। রাজা একশত সোপানো-...রি সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর তিন লোক ...র নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান। ভগ-... শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হই-...ছেন। ভগবানের জ্যোতিতে ক্রমশ ...জ্জ্বলভাব ধারণ করিতেছেন। এই উজ্জ্বল আভায় বিহ্বল হইয়া, মোহিত হইয়া সর্ব্বলোক সিংহাসন সমীপে প্রণাম করি-তেছেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য!!! ভগবান স্বয়ং ধার্ম্মিক ভক্তের নিকট অবনত। মহা-ভারত অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ!!! পাঠক স্মরণ করিও না। মহীয়সী ভারত-কথা অত্য... মনোহারিণী।

৮। শ্রেষ্ঠানুক্রমে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের পূজা করা হইল। দেবলোক মুনি ঋষি সম্মানিত হইয়া বিদায় প্রাপ্ত হইলেন। জ্ঞানরূপী ভীষ্মের উপদেশে রাজগনও যথা-যোগ্যরূপে সম্মানিত হইলেন। রাজসূয় সম্পূর্ণ হইল। দুষ্টমতি শিশুপাল ক্ষণকালের জন্য উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিয়া, অমনি ভগবানের সুদর্শনের আঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া ভূপতিত হইলেন। ধার্ম্মিকের বিঘ্ন ক্ষণস্থায়ী। যুধিষ্ঠির অবশেষে জয়যুক্ত হই-লেন। ধর্ম্মের আধিপত্য স্থাপিত হইল। ধার্ম্মিককে ভগবান সর্ব্বদা শাণিত সুদর্শন দ্বারা রক্ষা করেন। তাঁহার হৃদয়ে সতত ত্রিকালজ্ঞ ভীষ্ম বিরাজিত। যুধিষ্ঠির সার্ব্ব-ভৌম নরপতি হইলেন। জ্ঞান পরিচালিত ধর্ম্ম বুদ্ধি, ত্রিলোক-বিজয়ী রাজাধিরাজ মহামান্য গোষ্ঠীপতি জাতির শ্রেষ্ঠ কুলীন।

৯। পাঠক! রাজসূয় অপেক্ষা আর একটী বৃহৎ যজ্ঞের কথা কি শুনিয়াছ? রাজসূয় কেবল রাজা লইয়া, এ যজ্ঞে রাজা প্রজার বিচার নাই। ইহাতে জীবভেদ নাই, সকলেই ইহার উপভোগে নিরত। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ স্বল্পকাল ব্যাপী, এ যজ্ঞের আর বিরাম নাই, কালাকাল নাই। সংসার এই যজ্ঞের কুণ্ড। স্বয়ং বিশ্বজননী অনন্ত হস্তে অজস্রধারে ইহাতে আহুতি দিতেছেন। বিশ্বজন ইহা... ভোক্তা। কেবল

পদ্য) (শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল) ... ...
(পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ... ...
র্শন। (শ্রীকিশোরীলাল রায়) ... ...
বিশ্বাস। (সম্পাদক) ... ...
পকারব্রত। (সম্পাদক) ... ...
প্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ৬৬, ১৪৮, ২২২, ৩৯০, ৫০২,
৪৬। প্রায়শ্চিত্ত। (শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী) ...
৪৭। ফুলরেণু। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ১৯৭, ৩৪২, ৪১১ ও
৪৮। বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা। (শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম,এ, বি,এল)
৪৯। বঙ্গে জৈন সম্প্রদায়। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন) ... ...
৫০। বিধবা বিবাহ। (শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়—পুনা) ২৭৭,৩০৪,৪৭৮
৫১। বর্ণভেদ। (শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ) ... ২৮৩,৩৫৭,৪২৩,৫২৮
৫২। বিরহ সঙ্গীত। (পদ্য) (শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল) ...
৫৩। বাসন্তী প্রভাতে। ঐ ঐ ...
৫৪। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণের প্রতি বিনীত নিবেদন। (শ্রীকানাই লাল পাইন)
৫৫। ভারতের পরিণাম। (শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়) ... ...
৫৬। ভারত সমাজ। (১ম ও ২য়) (শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ... ৫০৫,৬১
৫৭। মোমবাতি। (শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, M. R. C. P.) ... ৬২
৫৮। মহৎ লোকের জীবনের বিশেষত্ব। (শ্রীকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম এ,) ৬৫
৫৯। যাত্রা ও থিয়েটর। (শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ... ২০
৬০। রাজবল্লভের জীবনচরিত। (সমালোচনা) (শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ) ৭২,৫৭
৬১। রোগের বৈজিক তত্ত্ব। (১ম ও ২য়) (শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, M. R. C. P.) ৪৩২,৪
৬২। রাজা মুকুট রায়। (শ্রীমধুসূদন সরকার) ... ...
৬৩। রাজসূয় যজ্ঞ। (শ্রীরাজেন্দ্রলাল বসু) ... ...
। শ্যামের বাঁশী। (শ্রীপ্রেমদাস বৈরাগী) ... ...
। শক্তিসমুদ্র। (শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়) ... ...
। শিক্ষিত লোকেরা কোথায় যাইবে? (শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
। শ্মশানে সম্ভাষণ। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ... ৬৫
৬৮। সংক্রামক রোগ। (শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মিত্র, M. R. C. P.) ... ৮
৬৯। স্বপ্ন। (পদ্য) (শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত, L. M. S.) ... ১০
৭০। সঙ্গীত বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা। (শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়) ... ১০
১। সীতারাম রায়। (৩য়, ৪র্থ) (শ্রীমধুসূদন সরকার) ... ৩৮৪, ৪৭
২। সঙ্কীর্ণতা। (সম্পাদক) ... ...
। সরস্বতী পূজা। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস) ...
। হিন্দু সমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা। (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ৩২,
হরগৌরী। (শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়) ... ...
হিন্দু ও মুসলমান। (শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ...
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী, শ্রীপ্রেমদাস বৈরাগী
প্রিয়বালা, শ্রীকিশোরীলাল গুপ্ত, শ্রীমতী প্রমী
নাথ রায়, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ষষ্ঠ খণ্ড নব্যভারতের সূচিপত্র

(১২৯৫)

বিষয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্মবিষয়ক মত। (২য়) (শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যা...
অন্ধকার সাধন। (সম্পাদক) ...
অনুরোধ। (শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ...
অদ্ভুত মত। (শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি) ...
আত্ম ও অহংবৃত্তি। (শ্রীবিপিনবিহারী সেন) ... ৩৫
অভিনয় (শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার) ... ৪৯৫
আর কি কোন আশা নাই ? (শ্রীবিপিনবিহারী সেন) ... ১৭০
আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গ মহিলা। (শ্রীমতী নীহারিকা দেবী) ৫১, ১০৯,৬১৯
আরঙ্গজীবের রাজনীতি। (শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী) ২৩৩
আমাদের ছোটলাট বেলি সাহেব ও অভিনন্দন কলঙ্ক। (সম্পাদক) ... ২৮৮
আন্দোলন। (শ্রীবিজয়লাল দত্ত) ... ৩৭৭
ইংরাজ শাসনে বঙ্গ সাহিত্য। (শ্রীহেমনাথ মিত্র) ৯০,১৫৩,২৫৬,৪০৩,৪৮৫,৫১৭
ইংরাজশাসনাধীনে ভারতের আর্থিক অবস্থা। (শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়) ... ২৫০
১। ইন্দ্র-চন্দ্র সংবাদ। ৩৪৪
১৫। উত্তর। (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী) ... ২৮২
১৬। কি ছিল, কি আছে, কি চাই। (শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত) ১২, ২২৫, ৩২১
১৭। কুমরিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য। (শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী) ১৪০, ২১৮
১৮। কর্ত্তা ভিন্ন জগতের উৎপত্তি সম্ভব কি না ? (শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন) ৪৭৮, ৫২৩
। কপটতার ছবি। (সম্পাদক) ৪৯৬
। কে শত্রু, কে মিত্র। (সম্পাদক) ৫৮৫
। গুরুবাদ ও প্রচারবাদ। (সম্পাদক) ২০৯
ঘোড়ানাচের ভগ্নাবশেষ। (শ্রীমধুসূদন সরকার) ... ৬৪
চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত, বি, এল,) ৯৫
১৮২, ২৬৪, ৩৪৩, ৩৯৮, ৫৮ ৬৬
২৪। ছবি। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ৬০
২৫। জীবন নদী। (শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়) ১০
২৬। জীবনবৃত্ত লেখকদিগের দৌরাত্ম্য। (শ্রীরাজনারায়ণ বসু) ... ২৪৪
২৭। জাতীয় একতা। ১ম, ও ২য় (শ্রীমধুসূদন সরকার) ... ৩০৫, ৫৩৫
২৮। জাতিত্ব। (শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ৩৯
জাতীয় মহাসমিতি। (শ্রীবিজয়লাল দত্ত) ৪৮৯, ৫
জাতীয় জীবন। (শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত, এল, এম, এস) ...
ঝান্সীর রাণী। (সমালোচনা) (শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত) ...
তোমারে কেবল। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ...
। দারিদ্র্য। (গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ... ...
সীমার মধ্য। (প্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত,এল, এম, এস) ...
(শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ...
(শ্রীবিপিনবিহারী সেন)

নব্যভারত

ষষ্ঠ খণ্ড।

পুনরুত্থান।

'Every man is not so much a workman in the world, as he is a suggestion ... he should be.' Men walk as prophecies of the next age." ... E.

যাহা সীমাবদ্ধ, জগতে তাহার আদর অল্প। যাহা জানিয়া ফেলিয়াছে,—জানিতে আর কিছুই বাকী নাই; তাহা লইয়া মানুষ ঘরকন্না করিতে ভালবাসে না। এটী, ওটী, সেটী—এ সকল পুরাতন জিনিস, চির-পরিচিত,—এ সকল লইয়া মানুষ ...জিয়া থাকিতে চায় না। তার মন যেন ... কিছু নূতন, কিছু অনায়ত্ত, ...ছু ...ষ্ট বস্তু দেখিতে চায়। পুরাতনের ...তরে যত দিন নূতনত্ব থাকে, তত দিন ...রাতন আদরের। পুরাতনের নূতনত্ব ...খন বিলুপ্ত হয়, তখন পুরাতন তিরোহিত ...য়। আবার নূতনের অনন্তত্ব যখন হ্রাস হয়, ...ন আবার নূতন, আবার নূতন, আবার ...নের উত্থান বা আগমন সম্ভব হয়। ...াক যেখানে আসিয়াছে, সেখানে ... লোক আসিবেই আসিবে। ... যেখানে ঘটিয়াছে, সেখানে ...টনা ঘটিবেই ... একটী ...গঠিত হইয়াছে সেখানে আর ...গঠন অপরিহার্য্য। কার...

পর লোক, ঘটনার পর ঘটনা, ... ঋতু, বৎসরের পর বৎসর, প্রকৃতিতে ...তনের পর এ সকল নূতন যে চক্রা... ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, আসিতেছে, ই... ভিতরে সৃষ্টির অসীম অনন্ত ভাব বিকশিত... পুরাতন নূতনের জন্য চিরদিন পথ পরিষ্কার করিতেছে। অথব... এক দিন যাহা পুরাতন ছিল, তাহাই আবার সময়ে নূতন হইয়া আসিতেছে। আকাশের চাঁদ চিরদিন হাসে, কিন্তু নিত্য নূতন হাসে। এক দিনের হাসি আর এক দিন নাই। চাঁদের জ্যোতি প্রত্যহই কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। কোকিল প্রতি বসন্ত ঋতু-সমাগমে দিক পূর্ণ করিয়া মধুর ডাক ডাকে, কিন্তু সে ডাক, যতবার শুনি, ততবার যেন নূতন। পুরাতন যাহা— তাহা মৃত, তাহা অতীত, তাহা অনা... তাহা উপেক্ষিত। পুরাতনে যেখানে... বিদ্যমান, সে পুরাতনে... আছে. ...

নিত্যই নূতন গায়। তাই নূতন রূপ ধরে। ত্যই নূতন তান ধরে। নূতন কাছে সকলই নিত্য নূতন। কৃতির সহিত প্রতিনিমেষে নূতনত্ব রাতন মরিয়া গিয়াছে—সে য়া গিয়াছে—ঐ দেখ অনন্ত তে অনন্ত নূতনত্ব প্রভাত-অরুণের জ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত। পুরাতনের শেষ তনের আরম্ভ তাহাই। যাই আরম্ভ, ন পুরাতনে গড়াইয়া পড়িল। মানুষ অসীম অনন্ত নূতনত্বের উপাসক। ছোট শিশু কথা বলে না, কেবল মুখ হাসে,হামাগুড়ি দিয়া চলে। দেখিতে খিতে তার সে রূপ তিরোহিত হইল। সে এখন আধ ভাষায় কথা কয়, সে এখন পা ফলিয়া চলে। এ দিনও তার থাকেনা। দেখিতে দেখিতে সে যুবক,সে প্রৌঢ়,সে বৃদ্ধ, ক্রমাগত নূতন হইতে নূতন জগতে যাইতে যাইতে শেষে আরো নূতন হইয়া অনন্ত জগতে মিলাইয়া অদৃশ্য হইল। এত দ্রুত গতিতে শিশু নানা অবস্থা অতিক্রম করে যে, জনক জননীর তাহা দেখিয়া আর সাধ মিটে না। মিটুক বা না মিটুক, কালের কাছে সে হিসাব নাই। সে অবস্থার পর অবস্থা, ঘটনার পর ঘটনা তুলিয়া কি যেন করিবেই করিবে। কি ব্যাপার !! মানুষ অবস্থার পর অবস্থান্তর লোকে ক্রমোন্নতি নহে।

রহিয়াছে যেন পাপেরই মানুষ নয়। কেবল পাপ, কেবল যেন কি বিভীষিকা! মানু উঠিতে, কিন্তু তার পা ভাঙ্গা, সে দাস, উঠিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে পা তাহার অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে। পাপ লইয়া ঘরকন্না, পাপ লইয়া জীবন ধারণ। তার রূপ কত কদর্য্য,কত মলিন। মদ্যপায়ী ব্যভিচারী আর কত পাপ করে; অন্তরের ভিতরে মানুষ হিংসা বিদ্বেষ ও কূট বুদ্ধির তাড়নায় যে কত জঘন্য কাজ করে,তার আর পরিমাণ করা যায় না। যে লোক এই রূপ মহা পতনের ভিতরে পড়িয়াছে, সে কি আর উঠিবে না? উঠিবে বই কি। ভালর পরও মন্দ ঘটে, মন্দ অবস্থার পরও ভাল অবস্থা উপস্থিত হয়। অবস্থার প বর্ত্তন, প্রকৃতির নিয়ম। এক অবস্থা চির থাকিবার নয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলি ছেন, যার খুব পতন হইয়াছে, এক দি তার আবার খুব উত্থান হইবে। মেঘের প রৌদ্র খুব তীব্র। দুঃখের পর সুখ বড় মধুর পতনের পর উত্থান বড় আশাপ্রদ নিজের শক্তিতে আর কুলায় না, এ বো জন্মিলে আত্ম-নির্ভর স্বাভাবিক। এ জন্যই কি তবে মানুষের পতন হয় তাহা জানি না। কিন্তু ইহা সরস্বতী কাঁ চাপিয়া যদি রাম বিরক্তির পাদন না করিত, তবে বার না। কিম্বা কৈকে

খাও খাও, লও লও ধ্বনি। অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার বিশ্বরাজ নির্দ্দেশ করিতেছেন। যে যে রকম যোগ্য, সে সেই রকম লাভ করিতেছে। পাপমতির এখানে মাথা-তুলিবার সাধ্য নাই। ঘোর নরকাগ্নি সর্ব্বদা তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। বিশ্বপতির বিশ্বমায়ায় অনন্ত জগৎ মুগ্ধ,স্তম্ভিত,প্রণত। অহো! কোটী কোটী গ্রহ নক্ষত্রাদিপূর্ণ এই জগৎ যাঁহার মায়া-প্রসূত ও যাঁহার দ্বারা দৃঢ়ব্রত ও সুষ্টুভাবে পরিচালিত, তিনি কত মহান! চিন্তার-অগম্য! হে সার্ব্বভৌম নরপতে! তোমার মধুর শাসন-গুণে আমাদের সুখের ইয়ত্তা নাই। মঙ্গলবুদ্ধে! তোমার বিধানে অমঙ্গলের লেশমাত্র নাই। আমরা অবি... তাই দোষ দেখিতে যাই। জানিনি, যে... গ্রন্থে এত উপদেশ নিহিত! শুষ্ক, ... পাম বিরস পত্র যে ঝরিয়া যায়, ইহা ... কেহ দেখে না? শান্তিময়! তোমার ম... উপদেশে আমার প্রাণ শীতল হইয়া গে... বিষজ্বালা প্রশমিত হইল। সর্ব্বেশ্বর! আ... অন্ধ—তাই শিক্ষার জন্য পরমুখাপে... হইয়া থাকি।

এই বিশ্বযজ্ঞের বড় বাহার! বুদ্ধিমান পাঠ... দেখিয়া বুঝিয়া নয়ন মন সার্থক কর। তাঁহা... কর দিতে পরাঙ্মুখ হইও না পরম সুখে... কাল যাপন করিবে। শ্রীরাজেন্দ্রলাল বসু

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

আসামে।

"Can heart of man embrace
Illimitable Nature ?" *Faust.*

একাকী পড়েছি বলি
সখা! তুমি ভাব কত
আমি ভাই একা নই
পেয়েছি মা মনঃমত।

যখন কাঁদিয়া উঠি
অমনি মধুর স্বরে
কোলে তুলে লইয়া মা
ডাকেন আদর ভরে।

গিরি-শিরে নীল মেঘে
বেঁধে দেন খেলা ঘর,
নিজ মনে খেলা করি
বসে বসে নিরন্তর।

একি এক অভিনব
পেয়েছি মধুর প্রাণ,
নিরমল প্রেম-সুধা
অবিরল করি পান।

অদ্ভু... মা... বশ

ঊষার আলোকে যেন
ভরিয়া রয়েছে বুক।

মৃতচিত প্রাণময়,
জীবনে, পুলিত কায়!
প্রতি অঙ্গ শিখিয়াছে
ভাবিতে আপন মায়।

রহস্যের মাঝে বসি
আছি যোগে নিমগন,
পলে পলে কত খেলা
দেখিতেছি অগণন।

এই কনকের হাসি
হাসিল নীরদ রাশি,
মুহূর্ত্ত না যেতে যেতে
নীলিমায় গেল ভাসি।

এই পিক দিল সাড়া
অমনি কাকলি তার
ছড়াইল প্রতিধ্বনি—
অনন্তের চারিধার—

প্রকৃতি প্রকৃতি মাগো
কি রকম ...

তোমার পরশে স্বর্গ
আশ্রমের বনভূমি—
তরুলতা গিরি নদী
সন্তান সন্ততি তব
সকলের প্রাণ যেন
শান্তি ঢালা অভিনব।

শোভা হতে বার হয়ে
চিন্তার নিঝর গুলি
কণ্ঠে কণ্ঠে সুর বাঁধি
চলিয়াছে ছুলি ছুলি!

কোন স্বপনের পুরে
শোভার এ উর্ম্মিমালা,
যেতেছে মৃদুল হাসি
পরাণে করিয়া থালা?

নয়ন গিয়াছে ভরি
পুলকে পূরিছে প্রাণ
তোমার মাঝারে দেবি
করিলে কি নিরমাণ!

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

ঘুমন্ত ছবি।

বাসন্তী সপ্তমী নিশি; বহিছে মৃদুল বায়,
প্রেমেতে বিভোর চাঁদ হেসে যেন গলে যায়;
ঘেরি পাশে তারা রাজি, নয়নে ঘুমের ঘোর,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণগুলি প্রেমের স্বপনে ভোর;
উছলি উঠিছে সুখে বিমল তটিনী প্রাণ
কি জানি মৃদুল স্বরে গাহিছে কিসের গান,
উষা ভাবি ধরণীরে, আধ ঘুম ঘোরে পাখী,
নীরব নিশীথ কোলে, থেকে থেকে উঠে ডাকি;
ধারে তটিনী তীরে, দাঁড়ায়ে কানন কোলে
ক্ষুদ্র জুঁই বেলা সুশুভ্র আনন তুলে,
মেতে অলস আঁখি, মুখে আধ-ফোটা হাসি,
চাঁদিমার শুভ্রকর চুমিছে সৌরভ রাশি;
শীতল কিরণ মাখি মৃদুল সমীর যায়,
বকুলের ফুলগুলি ঝর ঝর ঝ'রে যায়,
পাপিয়ার "পিউ" তান দি গন্তে মিলায়ে যায়,
ঘুমন্ত জগত কাণে বহিয়া আনিছে বায়!
বিমল কৌমুদী স্রোতে ছাদখানি ভেসে যায়,
উপাধানে রাখি শির, শিশুটী শুইয়া তায়!
আকাশে মধুর চাঁদ মধুর মূরতী পানে,
... র চেয়ে মোহিতা

ধরার চাঁদের করে আমাদের চাঁদ শুয়ে,
তুলনা নাইয়ে তার, চাহিয়া দেখিনু ছুয়ে:
আকাশের চাঁদিমার হাসিতে কলঙ্ক লেখা,
এ যে হাসি সুপবিত্র সরল অমিয়া মাখা!
শৈশব স্বপনে ভোর শান্তির বিমল বুকে,
এমনি সরল প্রাণে, থাক বোন্ চির সুখে,
সুখের কৌমুদীতলে ঘুমাক্ হৃদয় তোর,
চাঁদিমা কিরণে মাখা, শান্তির স্বপনে ভোর॥

শ্রীপ্রমীলা বসু।

"সে গেছে।"

আশায় তার ফুটে ছিল
ডালে ডালে কুসুম গুলি,
লতাটি পথ চেয়ে ছিল
আধেক খানি ঘোমটা খুলি,
কোথা হতে গানের ধারা
ধীরে এসে ফুলের বনে,
ফুলে ফুলে খুঁজে তারে
ঘুমিয়ে যেত অবশ মনে।
নদীর কুলু কুলু সনে
পাখী যেত অধীর হয়ে;
শত তারা প্রতি নিশি
রইত তাহার পথ চেয়ে।
এক দিন কার সাঁঝের বায়ু
কেমন যেন ভগন স্বরে;
গেয়ে গেল কেঁদে কেঁদে
"বৃথা আশা তাহার তরে।"
শুনে শুনে কুসুম গুলি
ঝরে প'ল অশ্রুমুখে!
অভিমানে লতিকাটি
ঘুমিয়ে প'ল তরুর বুকে!
নদীর গান থেমে গেছে,
পাখী উড়ে গেছে চলে;
মলিন মুখে তারা গুলি
ছায়া পথের অন্তরালে!
তারি তরে গাইত পাখী,
হাস্ত তারা, ফুলের দল,
সে গেছে—তাই সবাই গেছে
আছে কেবল অ...!

...